কোনো কোনো ধোঁয়ার রঙ নীল

সোমক দাস

ডি. এন. পাবলিকেশনস্
১০/২বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৯

KONO KONO DHOYAR RONG NIL

a collection of short stories by

SOMOK DAS

প্রথম প্রকাশ : রথযাত্রা, ১৩৭০

প্রচ্ছদ : সমরেশ সাহা

প্রকাশক : শিবশঙ্কর দে
ডি. এন. পাবলিকেশনস্
১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

মুদ্রক : রতিকান্ত নস্কর
দীপঙ্কর প্রেস, ২/১এ আশুতোষ শীল লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

পরিবেশক : দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলকাতা-৭০০০৭৩

কোনো কোনো ধোঁয়ার রঙ নীল

সূচিপত্র

বা-বা

উৎসর্গ

শ্রী অনন্তচন্দ্র চক্রবর্তী (বাপুনবাবা)

—করকমলেষু ।

গৃহপ্রবেশ

—কে বলো তো মা ? চিনতে পারছো ?

প্রায় কিশোরী বালিকার মতো লাজুক দেখালো মাকে। —বুঝতে পারছি, বেয়াইমশাই !

কথা হচ্ছিল ছাদে দাঁড়িয়ে। কয়েকটা নতুন অ্যাণ্টেনা ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে পাঁচিলে টাঙানো। দুশো চল্লিশটা ফ্ল্যাটের সব লোক না এলে মাস্টার অ্যাণ্টেনা চালু হবে না। পুরনো অ্যাণ্টেনাগুলো তাই যে যাব ইচ্ছেমতন টাঙিয়ে নিয়েছে পাঁচিলে, তার নামিয়ে নিয়ে ঢুকিয়ে নিয়েছে নিজের নিজের ফ্ল্যাটেব জানালা দিয়ে। শুধু অ্যাণ্টেনা লাগাতেই পুরো পঞ্চাশ টাকা। আমারটা অবশ্য রতন মিস্তিরি লাগিয়ে দিয়েছে। রবিবার ছিল। ন-দশ বছরের ছেলেটাকে সঙ্গে এনেছিল। এক গাল হেসে বলল—কিছুতেই ছাড়লোনি ; বলে—আজ আমি তোমার সঙ্গে যাবোই যাবো ! অ্যাণ্টেনাটা লাগাতে লাগাতে রঙমিস্ত্রি রতন তাকে—‘হেডমিস্তিরি, ইসকু ডাইভার দাও’, বলছিল, আর ছেলেটা ফুলপ্যাণ্টেব কোমর থেকে, গেঁজের কাছে গুঁজে রাখা যন্ত্রপাতি একটার পর একটা এগিয়ে দিচ্ছিল বাবাকে।

আমার ছেলেমেয়ে থাকলে সে-ও কি আমাকে এগিয়ে দিত পেনটা ছাতাটা টিফিনকৌটোটা, অফিস যাবার সময় ? দিত কি ! আমাকেই বোধহয় দিতে হত তার যা কিছু দরকার সবই, যখন তখন।

—কই, দক্ষিণেশ্বর দেখা যায় বললি যে ছাত থেকে, দেখা যাচ্ছে না তো ?

মা জিগ্যেস করছে। আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে দশ বছর, কিন্তু মায়ের সঙ্গে শ্বশুরমশায়ের এই প্রথম আলাপ হল, আমার গৃহপ্রবেশের দিন ! গৃহ মানে গৃহ নয় অবশ্য, ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাটকে গৃহ বলা যায় কিনা, তাই নিয়ে… ।

গৃহপ্রবেশের দিন পুজো করা হবে কিনা, তাই নিয়েও অনেক কথা বলেছে তমালী।—শুধুমুদু একটা হতচ্ছাড়া অশিক্ষিত বাউন এসে একগাদা খরচা করিয়ে দিয়ে চলে যাবে, না না, কোনও মানে হয় না। শেষমেশ আমি নিজেই রবিবার ভোরবেলা দক্ষিণেশ্বরে লম্বা লাইন দিয়ে পুজো দিয়ে এসেছি। প্রণামার্থীদের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে 'গৃহপ্রবেশের পুজো' বলে ফেলেছি বেশ চেঁচিয়ে! ফিরে এসে প্রসাদী সিঁদুরচিহ্ন দিয়ে দরজার মাথায় নিজেই এঁকে দিয়েছি স্বস্তিকচিহ্ন!

—ওই তো, ওইদিকে। ওখান থেকে নারকেলগাছটা আড়াল করছে। এইখান থেকে দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। শ্বশুরমশাই বললেন।

বেয়াইয়ের মন্তব্য শুনে লাজুক বালিকার পায়ে একটুখানি সরে দাঁড়াল মা। বালি-ব্রিজ, গঙ্গার অনেকখানিই এখান থেকে দেখা যায়।—ও মা, তাই তো! বলে বাঁদিকে খানিকক্ষণ কি যেন খুঁজে দেখল মা।—আবে, ওটা আদ্যাপীঠ না?

ভায়রাভাই, তমালীর ছোটকাকা, শ্বশুরমশাই—সবাই আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে সমস্বরে বলে উঠলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ।…ওঁরা এসব আগেই দেখেছেন। মা এসেছে পরে।

মায়ের পানখাওয়া লাল ঠোঁটে কেমন একটা হাসি।—ছেলের আমার ঘরে অন্ধকার, ছাতে…।

ভায়রাভাই কথাটা লুফে নিয়ে বলল—হ্যাঁ, মিলন, তুমি পুব দিকের একটা ম্যানেজ করতে পারলে না। ডাইনিঙে তো আলো না জ্বাললে একদম অন্ধকার! লোডশেডিঙে মাছ খেতে গেলে গলায় যে কাঁটা ফুটে যাবে!

গোরাদার কথা শুনে সবাই হেসে উঠল হাহা করে। মা-ও হাসল। পান খাওয়া দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল ঠিকই। তবে রুপোলি ফ্রেমের চশমার আড়ালে চোখদুটো কেমন একটু মনমরাও হয়ে গেল একই সঙ্গে। শ্বশুরমশাই শব্দ করে হাসেন না সাধারণত, হাসলেও, নিজের বাড়িতে, দৈবাৎ হঠাৎ কোনো আত্মীয়-স্বজন এসে পড়লে খুব যদি মিলনমেলার মতন আবহ তৈরি হয়, তখন হয়ত। তিনি কোথাও যেতেও চান না এমনিতে, নিতান্ত ঠেকায় না পড়লে বাড়ি থেকে বেরোতেও চান না। ছয় কন্যা ও এক পুত্রের জন্মের পরই স্ত্রীকে হারিয়েছেন, ক্যান্সার হয়েছিল, কিছু করার ছিল না ধরা পড়ার পর; তমালীর এইট কি নাইন চলছে তখন, স্কুলের গণ্ডি তখনও পেরোতে দেরি ছিল বেশ, তখন থেকেই মাতৃহীনা তারা। ছোট ভাইটাও, ছ বোনের পর এক ভাই, তা সেও,বাবার সঙ্গে

দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে আর ফেরেনি, বাবা স্নান সেরে উঠে দেখেন ছেলে জলে ভেসে যাচ্ছে। তখন কিছু করার ছিল না।

বড় জামাইয়ের রসিকতায়, তিনিও হাসলেন, তবে অল্প, শুধু ঠোঁটদুটো ফাঁক হল সামান্য, ঝকঝকে দাঁতগুলো দৃশ্যমান হল একঝলক। কোনো শব্দ হল না। এই বয়সেও সাতসকালে ঘুম থেকে উঠে সারা বাড়ি ঝাঁট না দিলে তাঁর দিন শুরু হয় না! এক ইলেকট্রিক মিস্ত্রির সঙ্গে, একটা ডিসি টেবিলফ্যানের দাম নিয়ে দরদস্তুর করতে করতে, 'ঘুরবে ভালো ?'—'ব্লেড ক ইঞ্চি ?'—এসব বলতে বলতে ডাইনে বাঁয়ে রীতিমতন দুলছিলেন, গামছা পরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে!

সে দৃশ্য দেখে মনে হয়েছিল, এই যে আমি পাখা কিনি, শুধু পাখা কেন, যে কোনো জিনিসই কিনি দোকানে ঢুকে প্রায় চোখ বুজে—দামটাম মিটিয়ে প্রায়শই ভুলে যাই ক্যাশমেমো নিতে—বাড়ি ফিরে বকুনি খাই তমালীর কাছে, তা কি ভুল করি!

—নিচে সবাই রান্নার জোগাড় করছে, আমি একটু দেখে আসি। তোমাদের চা কি ওপরে পাঠিয়ে দেব ?

আমার প্রশ্ন শুনে শ্বশুরমশাই সঙ্গে সঙ্গে বললেন—না না, ওপরে না, আমরাই নিচে যাচ্ছি। তুমি শুধু হল কি না দেখো। আর কেউ এল কিনা—

এই সকালেও বেশ রোদ। ডানদিকের নিচের পাকা রাস্তাটাও এখান থেকে দেখা যাচ্ছে ছোট বড় উঁচু নিচু বাড়ির ফাঁকে ফাঁকে। বাসন্তী রঙের শাড়ি পরা কয়েকটি মেয়েকে সে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখে মা বলল—আজ তো সরস্বতী পুজো। গৃহপ্রবেশের দিন আজকে ছিল কি ? পাঁজি টাজি দেখেছিস তো ?

—তোমার পাঁজি তুমি দেখো। আমি চা হল কিনা খুঁজি গিয়ে।

আমার এ কথা শুনে গোরাদা বলল—বুঝেছি, তুমি অতি পাজি ছেলে। আমার চা-টা তুমি ওপরেই নিয়ে এসো!

প্রথম বাক্যের প্রতিক্রিয়ায় সমবেত হাসির শব্দে দ্বিতীয়বাক্যটা প্রায় কেউই শুনতে পেল না।

মামপি বলল—মোশাই, মাকে তুমি বারণ করো। মা আমাকে বকচে!

পিয়ালিদির হাইপাওয়ার চশমা-পরা স্কুলমিস্ট্রেস মুখে হাসি নেই, ছদ্ম গাম্ভীর্য। সে গাম্ভীর্যকে কোনো গুরুত্বই দেয় না টাংকা মামপি। মেসোমোশাই কে কেটেছেঁটে মোশাই করে নিয়েছে তারা অত্যন্ত অনায়াসে।

সরাসরি আদেশ শুনে কিছু বলার আগেই টাংকা বলল—না না বারণ কোর না। তুমি বরংচ মামপির হাতে একটা সবুজ কালির ডটপেন দিয়ে ঘড়ি এঁকে দাও। ও খালি খালি মায়ের খোঁপা খুলে দিচ্ছে হাত দিয়ে।

মামপি সঙ্গে সঙ্গে হাতটা জামার ভেতর লুকিয়ে ফেলে বলল কাঁদো কাঁদো গলায় —না—না—আ না—আ না—আ—আ।

হাতে নানারঙের কাঁচের চুড়ি ছাড়া আর কোনো অলংকার ঘোরতর অপছন্দ করে মামপি। মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে পেছনে থেকে খুব আদর করতে লাগল মামপি আর বলতে লাগল—দাদামণি বেলাতে যাবে দাদামণি বেলাতে যাবে।

টাংকা বেড়াতে গেলে তার পেছনে লাগার আপাতত আর কেউ নেই এ বাড়িতে; সে কথা শুনে পিয়ালিদি বলল—কুটনো কুটতে কুটতে একটা পটল দেখিয়ে পটল ভাজা খাবি তো? আমাকে ছাড় হাত কেটে যাবে এমন করলে।

তমালী একটা বিশাল ফর্দ হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল—চট করে এনে দাও তো। সাইকেলের চাবি কোথায়! চিনিটা দিয়ে যেও আগে। চা নামাতে পারছি না। জল ফুটে গেল। এতক্ষণ কী করছিলে ছাতে?

কথা বাড়ালেই বিপদ। মানিব্যাগে আর মুদিখানার এবং বাজারের মাল আনার ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে সাইকেলের চাবিটা টাংকার নাকের সামনে দোলাতে দোলাতে বলি—যাবি নাকি?

সাইকেলে? বলে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল টাংকা।

টিভির সামনে বসে পা নাচাচ্ছিল সোনালি। ঘরের ভেতর থেকে বলল, মাছটা যেন অন্তত বাইশ পিস হয়! এ বাড়ি ও বাড়ি মিলিয়ে আমি আর মেজদি গুনে দেখেছি।

মেজদি মানে তমালী।

পারিবারিক ব্যাপারে আমার সঙ্গে তমালীর সাংঘাতিক মিল। আমরা দুজনেই মেজ। আমাদের দুজনেরই ছোটকাকা একই অফিসে চাকরি করে, দুজনেই প্রবাসী বাঙালি। আমার বাবারাও পাঁচ ভাই, ওর বাবারাও ঠিক তাই। আমার নকাকা আমাদের যাবতীয় প্রপার্টি কিনে নিয়েছে, ওর নকাকাও…। ওর বাবাও হৃতসর্বস্ব, অসহায়, নিঃসম্বল ভালোমানুষ, আমার বাবাও ঠিক তাই। তবে ওর বাবা এখনও বেশ পরিশ্রমী, যেমন ওরা সবাই, আর আমার বাবা অত্যন্ত অলস, যেমন আমরা!

হাটবাজারের ব্যাগগুলো সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে ঝুলিয়ে টাংকাকে রডে বসিয়ে এগোচ্ছি, এ সেভেনের সৌমিত্র মুখার্জি একগাল হাসল—ছেলে নাকি!

প্রশ্নটা শুনেই বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে। হাসিমুখে বলি- আমার না, বড় শালীর ছেলে।

হাতে একটা ঠোঙা। কাছেই অফিস সৌমিত্রর। ব্যাংক অফিসার—বাজারে? বলে দাড়িভরতি মুখে অল্প হেসে এক নম্বর গেট দিয়ে ঢুকে গেল।

দুশো চল্লিশটা ফ্ল্যাটের সব এখনও রেডি হয়নি। সম্ভবত শ-খানেক রেডি হয়েছে, লোক এসেছে আশি-একাশিটায়। আমরা যেদিন এলাম, কাঠের মিস্তিরিরা মাঝখানের প্যাসেজ জুড়ে কাজ করছিল, বারান্দার গ্রিলগুলো প্যাসেজের একপাশে সার দিয়ে রাখা, লরি ঢুকতেই দেয় না। ড্রাইভারের পাশে বসে বিরক্তিতে রাগ কী করবো ঠিক করতে পারছি না, আমার পাশ থেকে মুখ বাড়াল তমালী—ও দাদারা, শুনছেন, আমরা কি নতুন বাড়িতে ঢুকবো না? লরির ওপর থেকে নারীকণ্ঠ শুনে মিস্তিরিদের যেন হুঁশ ফিরে এল—এই, সরা, রাস্তা জুড়ে সব ছড়িয়ে কাজ করছিস কেন? যাতায়াতের পথটা তো দিবি।

লরি এগোলো।

তমালী এভাবেই আমাকে বাঁচিয়ে এসেছে বরাবর। যখন···। না, সে কথা এখন থাক।

ক্রাউন গেটের রাধারমণ পালের বিশাল মুদিখানার দোকানটা বেশ বড়সড় একটা হলঘরের মতন। ফর্দ করে নিয়ে—'ও মিঠুদা'—বলে লুঙ্গি গেঞ্জি পরা এক কর্মচারীর হাতে সেটা ধরিয়ে দিয়ে সরু চশমা পরা স্বাস্থ্যবান যুবক ছেলেটি সস্নেহ স্বরে বলল—ঘড়িবাড়ি ফ্ল্যাটে এসেছেন?

টাংকা হাঁ করে দোকানের সাজানো জিনিসপত্র দেখছে।—আপনি কী করে বুঝলেন? বলতে, সে কথার উত্তর না দিয়ে ছেলেটি বংশপরিচয় দিতে লাগল সবিস্তারে, তিনপুরুষ উত্তরপাড়ায় এসেছেন ওঁরা, নিজে কেমিস্ট্রি অনার্স গ্র্যাজুয়েট! শেষ করলেন এই বলে—উত্তরপাড়ায় নতুন মানুষ এলে আমরা জানবো না?

—চিনি। বলে টাংকা জামা ধরে টানলো—বড়মাসি বকবে।

ওহ্, তাই তো! গল্পে ছেদ পড়লো।—দাদা, চিনিটা একটু দিয়ে দিন না আগে, চট্ করে বাড়িতে দিয়ে আসি। লোক সব বসে আছে, চা করা যাচ্ছে না! আজ আবার গৃহপ্রবেশ কিনা—।

এতকিছু বলার কোনো দরকার ছিল না।···কোনোদিন বলিও না কাউকে। অন্তত কেনাকাটা করতে গিয়ে, দোকানে! ভাবাই যায় না। এখানে এসে, গঙ্গার হাওয়ায় সব যেন উলটো পালটা হয়ে যাচ্ছে।

নদীর এত কাছে যে কোনদিন নিজের বাড়ি হবে, তা জীবনে স্বপ্নেও ভাবিনি কখনো, অথচ কী করে যেন সব হয়ে গেল।

চিনিটা এগিয়ে দিয়ে চশমা-পরা মুদিওলা সুদৃশ্য ও স্বাস্থ্যবান ছেলেটি বলল—যান, দিয়ে আসুন। ছেলেটা থাক।—তুমি এখানে বসবে বাবুসোনা? হাত বাড়িয়ে দিল টাংকার দিকে। নিতান্ত বাধ্য বালকের মতো তার পাশে গিয়ে বসলো টাংকা। অথচ নিজেদের বাড়িতে কারও কোনো কথা কিছুতেই শোনে না সে। খাবার নিয়ে পেছনে পেছনে দু ঘণ্টা ধরে না ঘুরলে খাওয়াই হয় না।

আজ কি টাংকা আর মামপি খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে নেবে। চিনিটা নিয়ে তীরবেগে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরে আসি।

বাড়ি!

বাড়ি বলতে চিরকাল বুঝতাম মা-বাবা-ভাই-বোন-কাকা-কাকিমা ভর্তি একটা গমগমে জমজমাট কাণ্ডকারাখনা, গোয়ালে গরু পাট করছে পারুলপিসি, দুধ দোয়া দেখছি আমরা ভাইবোনেরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে! ঢেঁকিতে পা দিচ্ছে বউঝিরা, চাল ছেঁচা হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে গর্ত থেকে তুলে আনছে মা, আর আমরা অবাক বিস্ময়ে ভাবছি—একবারও মায়ের হাতে ঢেঁকির শুঁড়টা লেগে যাচ্ছে না কেন! মা দিব্যি ওরই মধ্যে কথা চালিয়ে যাচ্ছে সবার সঙ্গে। অবশ্য দুধপুলি, সরু-চাকলি, ইত্যাদি পিঠে খাবার সময় মনেই থাকত না মায়েদের সেসব কষ্ট, আমাদের সেসব ভয়ের কথা! তখন কেবল কাড়াকাড়ি, মারামারি; ওকে বেশি দিলে, আমাকে কম দিলে কেন?

সেসব বাড়ি এখন গোডাউন। যে আটচালায় সুতোর বাণ্ডিল কিংবা খড়ের গাদা পড়ে থাকতো, এখন সেখানে পার্টির ছেলেরা মিটিং করে, আলুর সিজিনে সাধুখাঁরা আলু ঢেলে রাখে; আশেপাশের লোকেরা ঢালাও চুরি চামারি করে আর দোষ নিতে হয় বাবা-কাকাদের! শুধু দুর্গাপুজোর সময় একটু যা জাগে বাড়িটা। দেশবিদেশ থেকে আত্মীয়রা সব—। তাও ফ্যামিলি পলিটিক্সের জ্বালায় আজকাল সেই পরিবেশটাও—।

—ওহ্, এত দেরি করো কেন? সবসময় সব জায়গায় খালি আড্ডা,

রাস্তার ভিখারি আর মুদিওলা যেই হোক! তুমি একটা যা তা। বলতে বলতে চিনিটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে গেল তমালী।

—টাংকাকে কোথায় রেখে এলে? পিয়ালিদি কুটনো কুটছে এখনও। হাইপাওয়ার চশমার ফাঁক দিয়ে গোল গোল চোখ তুলে জিগোস করল। এই প্রশ্নের গাম্ভীর্য ছদ্ম বা অকারণ নয়। মাতৃত্বময়, সরল, সংক্ষিপ্ত।

—মুদিখানার দোকানে। যাই, মালগুলো নিয়ে আসি। বলে বেরোতে যেতেই ছোটঘরের ভেতর থেকে, সোনালি তখনও টিভির সামনে, বড়দিরা কুটনো কুটতে বসেছে ডাইনিংে, বড় ঘরে মামপিকে সামলাচ্ছে ও বাড়ির কাজের মেয়ে লিসা; পিয়ালিদি—মানে তমালীর বড়দি, সুতরাং আমারও, বলল—চা কি খেয়ে যাবে না এসে খাবে? তমালী কিছু বলার জন্যে হাঁ করেছে, ছোট ঘর থেকে সোনালি বলল—এসেই খাবেন, তাড়াতাড়ি যান। টাংকা একা আছে। মাছ কিন্তু বাইশ পিস···।

টাংকা বেশির ভাগ সময়েই সোনালির কাছেই থাকে। স্কুলের কাজ, ঘর-সংসার—সবদিক সামলে বড়দি অতটা পারে না। একবার পুরীতে বেড়াতে গিয়ে, টাংকাকে জোর করে স্নান করাতে গেল বড়দি।—আমার ছেলে, আমার কাছে কেন চান করবে না? ওর বাবা করবে! পুরো আড়াই ঘণ্টা চেষ্টার পর টাংকা স্নান করতে বাধ্য হল ঠিকই; তবে সন্ধের মধ্যেই চার জ্বর। পুরীর সমুদ্র একা হাহাকারে মগ্ন রইল। ক্যাপসুল ট্যাপসুল দিয়ে ভোররাতে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল ঠিকই; তবে ততক্ষণে সোনালি, সারারাত জেগে—। বড়দি হাল ছেড়ে দিয়ে মড়ার মতন ঘুমিয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে বলল, জ্বর কমে গেছে, যাক বাবা। সোনালি বলেছিল—তোমরা সমুদ্রের ধার থেকে ঘুরে এসো। আমি একটু ওর পাশে থাকি। গোরাদা সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল—হ্যাঁ। সেটাই ঠিক হবে। চলো মিলন, সমুদ্রে যাওয়া যাক। তুমি নুলিয়া নেবে নাকি? আমার ওসব লাগে না। মুখে এসব বললেও, সমুদ্রে অবশ্য গোড়ালি ডোবালো না কেউ! আমি একাই নুলিয়া নিয়ে···। আর সেও এক নুলিয়া··· সমুদ্রের অনেক ভেতরে টেনে নিয়ে গিয়ে ঢেউয়ের মাথায় তুলে দিয়ে বলে—আর পাঁচটা টাকা বেশি দিবেন বাবু! দিবেন কিনি! পাড়ের লোকেদের তখন পিঁপড়ের মতন দেখাচ্ছে। ওই পিঁপড়ের সারির মধ্যে কেই বা তমালী, কেই বা গোরাদা। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় আমাকে গোল টিউবে বসিয়ে খুশমেজাজে সাঁতার কাটাচ্ছিল নুলিয়াটা—ওরা সবাই আমনাকে দেখতিসে।

বলেন বাবু, আর পাঁসটংকা বেশি দিবেন কিনি! কিছু বলার আগেই একটা বিশাট আকাশ ছোঁয়া ঢেউ আসতে দেখে 'জয় জগন্নাথ' বলে আমাকে ঠেলে দিল ঢেউটার মাথায়। কোমরের তলা দিয়ে ঢেউটা পিছলে গিয়ে আছড়ে পড়ল সামনের অপেক্ষাকৃত নিচের জলের তাৎক্ষণিক উপত্যকায়।

পুরীতেও, বাজারে যাবার প্রাক্কালে, সোনালি এভাবেই বলতো—মাছ আনলে বারো পিস কিন্তু, তুবেলা হয়ে যাবে, আমরা ছজন তো, মাম্পি মাছ খায় না।

খাওয়া দাওয়ার কথা ছাড়া সোনালি কি আর কিছুই ভাবে না। কথাটা একদিন বলে ফেলতেই, একটুও রাগ না করে মিষ্টি হেসে বলেছিল—না ভাবলে, আপনারা খাবেন কী।

মুদিখানার দোকানে টাংকার সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে ফেলেছে চশমা-পরা দোকানদার ছেলেটা। টাংকা সমানে বকে যাচ্ছে, ছেলেটা ফর্দ করতে করতে হুঁ হাঁ করে যাচ্ছে শুধু। বাড়িতে কোনো অচেনা লোক এলে তার সামনে যায় না টাংকা। মা-ই তো কোলে নেবার কত চেষ্টা করল সকালে। কিল চড় মেরে নেবে গেল টাংকা। —ছি ছি, অমন করে না বাবুসোনা- বলতে বলতে পিয়ালিদি মায়ের কোল থেকে টাংকাকে নামিয়ে নিল।

ছেলের বউয়ের দিদির ছেলে- তাকে কোলে নিতে গিয়ে কি অবস্থা! ছেলের সারাজীবনের স্বপ্ন—তার নতুন বাড়িতে পা দিয়েই মুখটা বেশ কালো হয়ে গিয়েছিল মায়ের।

—এই যে দাদা, আপনার মাল রেডি। বলে একটা ঠাসা থলে এগিয়ে দিয়ে ছেলেটি বলল—আটানব্বুই টাকা সত্তর পয়সা।

মাছটা বাইশের জায়গায় পঁচিশ পিস হয়ে গেল। প্লাস্টিকের প্যাকেটে সব গুছিয়ে দিল পিসগুলো, এরকম দিল্লিতে দেয়। তমালী চাকরিসূত্রে বছর তুয়েক দিল্লিতে ছিল, প্রায়ই যেতে হত তখন, রাত্রের খাবার কিনে আনতে গিয়ে দেখেছি, মুদিখানার চাটনিটাও ছোট্ট রঙিন সুন্দর একটা প্লাস্টিকের প্যাকেটে ভরে দিত। উত্তরপাড়া বাজারে যদি দিল্লির সিস্টেম চালু হয়ে গিয়ে থাকে, খারাপ কী! মাছভরা প্লাস্টিকের প্যাকেটটা নিজের মাছের ময়লা থলেতে ঢুকিয়ে বেশ ভালোই লাগল। কলকাতার বাড়ি বিক্রি হয়ে যাবার পর, পাঁচ-ছবার বাড়ি পাল্টে, বিয়ের পর গ্রামের বাড়িতে ফিরে গিয়ে নিজস্ব ঘরের অভাবে সেখানেও বিবিধ পারিবারিক ক্যাচাল সামলে, শুধু স্বামী স্ত্রীতে আরও তিন

চারবার বাড়ি পালটে—অবশেষে এই উত্তরপাড়ায় গঙ্গার ধারে একটা ছোট্ট, নিজস্ব ফ্ল্যাট—রোজ টাটকা গঙ্গার ইলিশ, গলদা চিংড়ি—ছাতে উঠলেই নদী র বিশুদ্ধ নিজস্ব ধা ার হাওয়া—

—কিরে, ফ্ল্যাটের মালিক, এত মাছ কে খাবে।

গলা শুনেই বুঝেছি, সুপ্রকাশ শীল। সুশীল বলে সই করে অফিস কো অপারেটিভের মিটিঙে, বাংলায়। প্রবীর আইচ রিটায়ার করতে আর এই দেড় দুবছর, তারপরই সুপ্রকাশ ডিরেকটর হয়ে যাবে; আপাতত সোসাল সার্ভিসে ওর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই অফিসে অন্তত। আমি ছাড়াও, প্রিয়ব্রত, দীপক, অনাবিল— অনেককেই উত্তরপাড়ার এই ক্যাম্পাসে অ্যাপার্ট-মেন্ট পাইয়ে দিয়েছে সুশীল! ওরা নিজেরা চার ভাই চারটে নিয়েছে অথচ নিজেদের বাড়ি এই উত্তরপাড়াতেই—স্টেশনরোডে, বলখেলার মাঠের ধারে। গৃহসমস্যা কি কোনদিন ফুরোবে না মানুষের। সুশীলরা ন ভাই। ওর ন-দা বউ নিয়ে রোজ রাত সোয়া দশটায় হাতে অ্যাটাচি ঝুলিয়ে ঘুমোতে আসে ফ্ল্যাটে —ভদেরটা অবশ্য সিঙ্গল ব্লকে। বাইচান্স দেখা হয়ে গেলে লাজুক হেসে নড করে চলে যায়! বিয়ের পর সুপ্রকাশও তাই করবে কি। না বোধহয়। ওর ফ্ল্যাটটা যে আমা ঠিক পাশেই।

—গৃহপ্রবেশ আর কী, মানে খাওয়া দাওয়া। ঠিকানাটা জানাতে হবে তো। এবাড়ি ওবাড়ির সবাইকে আসতে বলেছি।

— আমাকে বললি না।

—তো গৃহপ্রবেশে' দিন আমাকে বলিস!

—একই তো ব্যাপার, কি বল। বলে চলে যাচ্ছিল সুপ্রকাশ। —তোর ব্যাপারটা এক নয়, অনেক আলাদা। তোর কাছে ফ্ল্যাটে আসা মানে অনেকটা বার বাড়িতে আসা টাইপের ব্যাপার—আর আমারটা হল, যাকে বলে—অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখার সংগ্রাম!

—পা সি মাইরি। চালিয়ে যা। বলে দুষ্টু দুষ্টু হাসতে হাসতে এবার সত্যিই চলে গেল সুশীল।

প্রথম যেদিন প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে তুলে ক্যাশ দশহাজার ব্যাগে নিয়ে উত্ত পাড়ায় নামলাম সন্ধেবেলা সুশীলের সঙ্গে, তখনও বিশ্বাস করতে পারিনি —কলকাতার এত কাছে, নদীর প্রাঞ্জল হাওয়ায়, আমার নিজের একটা ঘর-বাড়ি সত্যিই হতে চলেছে।

বরানগরের পাঁচমিশেলি ভাড়াবাড়িতে একবার একতলার উঠোনে পাশের ঘরের ভাড়াটে বউদির শুকোতে দেওয়া শাড়ি কে বা কারা কাঁচি দিয়ে কেটে দিয়েছিল বেশ খানিকটা—ঘুম থেকে উঠে সে দৃশ্য দেখে সেই বউদি আর কাউকে না পেয়ে আমার মাকে সামনে পেয়ে তাকেই যাচ্ছেতাই ভাষায়…। না। আর সেসব কথা না ভাবলেও চলবে।… মা বাবা এখন গ্রামের বাড়িতে ছোট বোনটাকে নিয়ে বেশ ভালোই তো আছে। হিমাচল প্রদেশ থেকে বড়দা টাকা পাঠায়, কলকাতার বেহালা থেকে ভাইও পাঠায় দরকার মত। শুধু আমি· ।

মা এসেছিল ছোট ভাইকে নিয়ে। বোনকে আনলে না কেন মা ? বার বার জিগেস করলে মা শুধু বলল—কোচিংয়ে পরীক্ষা আছে ওর। বলার সুর শুনে মনে হল, কথাটা হয়ত ঠিক নয়। কঠিন স্বভাবের বউদির কাছে ও কিছুতেই সহজ হতে পারে না। বাবার স্বভাব অনুযায়ী আমরা সবাই কেমন যেন এলোমেলো এবং আলগা ধরনের। তমালীরা ঠিক উলটো। গ্যারান্টি পিরিয়ডে একই দোকানে তিনচারবার না ছুটলে ওদের ভাত হজম হয় না। আর আমার বাবা সারাজীবন বিষয়সম্পত্তি বেচে বেচে শুয়ে শুয়ে ঠ্যাঙ নেড়ে কাটিয়ে গেল, 'হলে-হয়', 'না-হলেই বা ক্ষতি কী' ভাব করে! যার ফলে, স্কুলের গণ্ডি পেরোবার আগেই আঁকড়ে ধরতে হল টাইপমেশিন, যে আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজাও পার হতে দিয়েছে মাথা উঁচু করে। এখন অবশ্য অডিটে ঘুরে বাস্তব পৃথিবীর অনেকরকম বর্ণালীই দেখতে হয় দু বেলা। বাবার ওপর আর অতটা রাগ নেই। বরং যখন নিজের অডিট রিপোর্ট নিজেই ক্যাম্পে থাকাকালীনই নিজের পোর্টেবল টাইপরাইটারে নামিয়ে ফেলি, অন্যসব আতাকেলানে সরকারি সহকর্মীদের মুগ্ধ বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে থাকাটা উপভোগ করতে করতে মনে হয়—ভাগ্যিস বাবা…। ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য।

বাবা এল, মা আর ভাই যখন খেয়েদেয়ে চলে যাচ্ছে ঠিক তখন। মাকে এগিয়ে দিতে নিচে নেমেছি, বাবা যথারীতি সেখানেই—ঠিকানাটা তুমি ভুল দিয়েছো কেন ? আমি ঘুরে মরছি তখন থেকে! মাকে দেখলেই বাবার একটা অভিযোগপ্রবণতা শুরু হয়ে যায়, যেন তাঁর যাবতীয় অকর্মণ্যতার জন্য মা-ই দায়ী! মা কিছু বলার আগেই বাবার হাত থেকে নোটবইটা ছিনিয়ে নিয়ে দেখলাম, বাবারই হাতের লেখা, যথারীতি ফ্ল্যাট নাম্বারটা বাবা-ই ভুল লিখেছে

নিজের হাতে। দেখা হলেই ঝগড়া হয়ে যায় বলেই কি মা আগে এসেছিল, একা ? এ ব্যাপারে তমালীর বক্তব্য দীর্ঘ। মা-বাবার সম্পর্কের গোলমাল থেকেই জন্ম নেয় সন্তানের চরিত্রের বিবিধ অসঙ্গতি। সম্ভবত সেকারণেই সে সহ্য করতে পারে না আমার পরিবারের কোনো লোককেই।

সম্ভবত সেকারণেই শ্বশুরমশাইকে আমার গৃহপ্রবেশের দিনে জীবনে প্রথম দেখে বাবা যখন বিকল হেসে—বুঝতে পারছি, আপনি,···আপনি বেয়াইমশাই ···বলছিল, তমালী তখন খাবার টেবিলে অত্যন্ত ব্যস্ত ও মনোযোগী হয়ে উঠেছিল হঠাৎ। আমার সঙ্গে যেমন প্রথম প্রথম, মায়ের সঙ্গেও আজ সেরকম কোনো কথাই বলেনি তমালী···'কথায় নয়, ভালোবাসা বোঝা যায় কাজে'— নিজের এই বহুবার উচ্চারিত বাক্যটিকে যেন প্রমাণিত করছিল তমালী। আর মা, ঠিক আমারই মত, বকবক করে যাচ্ছিল অনবরত···এটা খুব ভালো হয়েছে বউমা··· ওটা···।

সন্ধেবেলা, সবাই চলে যাবার পর, বিধ্বস্ত তমালী যখন শুয়ে পড়েছে, আমি একা উঠে আসি ছাদে। সারাদিনের মিস্ত্রিদের হাতুড়ি ঠোকার ঠকঠকাং শব্দ এখন শান্ত। দশবছরের বিবাহিত জীবনে—অবাঞ্ছিত প্রেমের বিয়ে বলে এর আগে কখনো দু বাড়ির এত লোককে এক জায়গায় জড়ো হতে দেখিনি। অফিস ছুটি নিয়ে একা একা সারাদিন মিস্ত্রি খাটিয়েছে তমালী। বেডরুমের দরজা পালটেছে দুবার। তখন রাগ করেছি কত।

নতুন রঙের গন্ধ, দরজার পালিশের গন্ধ। চারতলার ল্যান্ডিংয়ে চক দিয়ে লেখা—এখানে রঙ মিস্তিরি পাওয়া যায়। পাঁচতলার ল্যান্ডিংয়ে আঁকা-বাঁকা অক্ষরে লেখা—আমার বাবা ভালো নয়। কে লিখেছে ? কে ?

টাংকা বিকেলে এসব লেখা বানান করে করে পড়ছিল। তখন সোনালি ওকে খুব ধমকেছে। যা কখনো করে না সোনালি। টাংকার সে কী কান্না !

ছাতে উঠে অন্ধকারের গঙ্গা, বালিব্রিজের সার দেওয়া আলো, আর তারা-ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানতে টানতে মনে হল—মানুষের গৃহপ্রবেশের চেষ্টার সঙ্গে মানুষের নিঃশব্দ অশ্রুপাতের সম্পর্ক কী খুব নিবিড় !

কোনো কোনো ধোঁয়ার রঙ নীল

অ্যাই বুদ্ধু, ডিমটা ভেজে দে না!

চায়ের দোকানে ডিম কী করে ভাজবো? আমার কাছে তেল আছে? পেঁয়াজ আছে?

ঠিক রাগত নয়, কেমন আর্তনাদের মতন শোনায় বুদ্ধুর গলা। চায়ের দোকানের ছেলে, কুড়ি পেরিয়েছে কী পেরোয়নি, সে আবার রাগ কী দেখাবে। জলাজঙ্গল, ঝোপঝাড়, ইলেকট্রিকের খুঁটি—এসব পেরিয়ে, ওইদিকে ইস্টিশান, এখান থেকে দেখা যায়। স্টেশন রোডের রানিং খদ্দের বুদ্ধু পায় না। এদিককার কোয়ার্টারের লোকেরা, পিচরাস্তা ফেলে, জলাজমি ধরে লাইনে উঠে, রেললাইন বরাবর দৌড়ে ট্রেন ধরবার সময় বুদ্ধুর দিকে চোখ রাঙিয়ে যায় ঠিকই। কা রে কী হল। ট্রেনটা ফেল করাবি নাকি। কার খয়ের ছাড়া চমনবাহার, কার ভাজা মউরি, কার লালবাবার বদলে সুরভি হলে হবে না—কার পাঁচটা ফিল্টার উইলস ধারে, সব রেডি চাই, সঙ্গে সঙ্গে। শালা তুই ট্রেন ফেল করবি তো আমার বাপের কী। এসব অবশ্য মনে মনে বলে বুদ্ধু। মুখে বলে--এই তো হয়ে গেছে, নিন না। আমি তো করেই রেখেছি। একটু নরম মতন লোক হলে বলে--এই তো গেট পড়ল সবে। গাড়ির এখন ঢের দেরি। তা বললে আর কী হবে। বুদ্ধুর দিকটা কেউ ভাবতে চায় না। সবাইয়েরই, যখন যা চাই তক্ষুণি তা চাই। অন্য সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকবে, কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকর বকর করবে--কিন্তু ওই; বুদ্ধুর দোকানে এসে কিছু একটা বললেই হল; চা কি বিড়ি কি পান কি সিগারেট; বাপুজি কেক কি বাংলা প্যাটিস; লাভ ইন টোকিও বিস্কুট কি দিল দিয়া দর্দ লিয়া; এগুলো অবশ্য বুদ্ধুরই দেওয়া নাম--লোকাল বিস্কুট তো--সে যাই হোক, যে

যা চায় সব তার সঙ্গে সঙ্গে চাই। বুদ্ধু প্রায় সবাইকেই খেঁকিয়ে উঠতে চায় —দেখছেন তো হাত জোড়া, দাঁড়াতে পারছেন না একটু। সে আর বলা যায় না কাউকেই। মুখে বলে —হ্যাঁ, কী, এই তো, নিন না—। চা করা থেকে, পান সাজা থেকে বিড়ি সিগারেট বেচা—সবই একা হাতে করে যাচ্ছে বুদ্ধু সেই কবে থেকে…। কবে থেকে? বুদ্ধুর ভালো মনে পড়ে না। কোয়া-র্টারের গেটের এই চায়ের দোকান ছাড়া আর কোথাও সে তার সারাটা দিন কাটিয়েছে বলেও মনে পড়ে না।

ডিমটা ভেজে দে না বুদ্ধু।

বললুম তো পারবো না, তেল নেই।

তেল আমি এনে দিচ্ছি।

লোকে বলে বুদ্ধুর প্রেমিকা। ঠাট্টা করেই বলে। ফ্রকটা হাঁটু ছাড়িয়ে নেমে গেছে। বোঝাই যায় অন্য কারুর। হাতগুলো কাঠির চেয়ে সরু সরু। মুখটা করোটির ওপর চামড়া বসানো। চোখগুলো অসম্ভব ঢোকা ঢোকা। তার ওপর টেরা, কোন দিকে দেখছে বোঝা যায় না। কাঁধ পর্যন্ত ঝুলে থাকা কয়েকগাছা চুল টান করে একটা গার্টার দিয়ে বাঁধা। ফ্রক তুলে প্যান্টের পকেট থেকে ছোট্ট একটা শিশি বের করে মাইতির মুদিখানার দিকে গেল। তেল চাইতে। বুদ্ধু জানে। যতক্ষণ না দেবে ততক্ষণ ঘ্যান ঘ্যান করবে। একটু তেল দাও না। লঙ্কা পিঁয়াজও ওভাবে কোত্থেকে কোত্থেকে জোগাড় করে আনবে ঠিক। হাতে যতই কাজ থাক, বুদ্ধুকে ভেজে দিতেই হবে ডিমটা। মণিদের বাড়ির ওদিকে থাকে। ডিমটা কোথায় পেয়েছে কে জানে। ভেজে দিলে ঠোঙায় মুড়ে নিয়ে টুকটুক করে চলে যাবে। রাস্তায় খাবে না।

আর ও কত কম খদ্দেরই যে আসে।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই এসে বসে আচায্যিবাবু; আচায্যি ওই নামেই। বাড়িতে মন টেঁকে না একমুহূর্ত। ছেলেগুলোও তেমন। একটা ছেলে তো মদ খেয়ে ট্যাবলেট বমি করে ! গেটটা টেনে গাড়িবারান্দায় নিচে খাটিয়া পেতে ঘুমোয় বুদ্ধু, বাড়িতে গরম, তাছাড়া পাহারাটাও দেওয়া হয়ে যায়। চুরি করার মতন কিছু না থাকলেও, একটা কাঁচের বয়ামও কেউ যদি নিয়ে যায় লোকসান খুব একটা কম হবে না। নতুন করে কিনতে গেলে…। তা ভোর থেকে আচায্যিবাবু ডাকাডাকি শুরু করে, বুদ্ধু উঠলি—। আঁচ দিবি তো। ফার্স্ট বাস বেরিয়ে গেল কখন—! লুঙ্গি সামলাতে সামলাতে

উঠে বসে বুদ্ধু ঘুম-চোখে। ছোট্টটি রেখে মরে যাবার সময় এই ডিউটিটা আচাষ্যিকে দিয়ে গেছে তার বাবা, বুদ্ধুর মাকে ঠিকমতন মনে পড়ে না। সবসময় খ্যাকখ্যাক করত বুড়োটা—ওই আচাষ্যি মশাইয়ের মতই রোগাসোগা—এর বেশি…। সেই যে ঘুমচোখে সত্যনারান মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সামনের টিউবওয়েলে মুখচোখ ধুয়ে দোকান খুলে আঁচ দেবার জোগাড় করে বুদ্ধু—তারপর থেকে সমানে একনাগাড়ে…।

সকালের খদ্দের বেশিরভাগ হেল্‌থ সেণ্টারের দারোয়ান, গ্রেড কোর স্টাফ, মাসিটাসিরা। আচাষ্যি তখনও বসে থাকে। বুড়ো হয়ে মরতে চলল, কেত্তনের আসর করার বয়স, তবু আচাষ্যি বসে বসে হাসপাতালে। মাসিদের সঙ্গে খ্যাক-খ্যাক করে হাসে। এদিকে আবার উঁচু পোস্টের চাকরি, সামনাসামনি কেউ কিছু বলতেও পারে না। বিকেল-দিকে টুকটাক জিনিস কিনতে আচাষ্যির বউ নিজেই যায়। দোকানে দাঁড়িয়ে বুদ্ধু যে কত জিনিস দেখে। কেন কে জানে, ঘরসংসারের দিকে আচাষ্যির মন নেই। স্বভাব খারাপ। মেয়েদের দিকে কুনজরে চায়। বউটা তো খাটতে খাটতে রোগা ক্যাকাশে হয়ে গেছে। সবই দেখে বুদ্ধু। কাউকেই কিছু বলে না। বলাবলি বিশেষ ভালো কাজ নয়। হুট বলতে বিপদ হয় জানে বুদ্ধু।

দশটার পর অফিস বসে সেণ্টারের বাইরের দিকে ঘরগুলোতে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা চাই বাবুদের। তিনটের পর মিটিং হয় প্রায়ই। তখন তো চাই-ই। কেটলি নিয়ে বুদ্ধু না এলে মিটিং জমে না।

সারাদিনে কত যে ধারের খদ্দের। বাঁধা মাইনের বাবুদের ধারে মাল দিতে তেমন ভয় নেই। মাসকাবারে দিয়ে দেয় যতই হোক। ঝামেলা লেগে যায় পার্টির ছেলেদের নিয়ে। যখন তখন চা পান বিড়ি সিগারেট খেয়ে চলে যাবে—চোদ্দ পুরুষের জমিদারি। পয়সা চাইলেই দোষ। দোব না বলিচি। কথা বললেই কথা বাড়ে। সব সময় মেজাজ ঠিক রাখা যে কি কাজ…।

সন্ধের দিকে ভটভট করে মোটর সাইকেল এসে থামবে একটার পর একটা। বুদ্ধু, লেবু চা। ফিল্টার উইলস তিনটে। পাধাদের কোলেস্টরের ম্যানেজার অনাথ সিংহরায়। স্টিলকো কাজুদা। তিল ব্যবসায় পয়সা করেছে টাবুল সেন। কদিন আগেও মালমুল খেয়ে এসে 'মাজা ভেঙ্গে দোব' বলে চেঁচাত। আজকাল রুদ্রাক্ষ পরে গলায়। একদিন রাত্তিরে একটা মোটা মানিব্যাগ কুড়িয়ে পেয়ে ফটো দেখে চিনতে পেরে টাবুলদাকে পরের দিন ফেরত দিয়েছিল

বুদ্ধু। একশো টাকার নোটগুলো চটপট গুনে নিয়ে বলে কী—কটা সরিয়েছিস বুদ্ধু। ঠিক করে বল। ব্যাগে আরও বেশি ছিল।

রতিরাম ফুটে গেল ভোররাতে। ঘাটখরচার চাঁদা কেউ দিতে চায় না। গ্রেড ফোর স্টাফদের বেশির ভাগই মাতাল, খাবার দাবার তো বিশেষ খায় না; যখন তখন ফুট করে ফুটে যায়। তা যাবি যা, ঘাটখরচাটা তো রেখে যেতে পারিস। বুদ্ধু দশ টাকা দিয়েছিল। অবশ্যই নিজের নয়। টাবুল সেনের কুড়িয়ে পাওয়া ব্যাগ থেকেই দিয়েছিল। সেটা তো আর স্বীকার করা যায় না। ব্যাগ ফেরত দেওয়ার জন্যে দশটাকা তো এমনিতেই তার পাওনা। সেটা তো দিলই না, উল্টে বলে—আরও বেশি ছিল!

মানুষজন যে কবে এরকম হয়ে গেল, বুদ্ধু সেসব কথা ভাবে। তেমন বুঝতো পারে না। এই যে তারক ঘোষ আসে, বিলাতিয়া মাসি সুইপার, তার ছেলে—সাইকেল নিয়ে সারাদিন পার্টির কাজ করে—ইস্টিশানে দাঁড়িয়ে কৌটো নাড়ায়—একটার প. একটা চাকরি তার খালি কস্কে যাচ্ছে একটুর জন্যে—সেও যদি মেজাজ দেখায় বুদ্ধুকে। কেন সহ্য করবে বুদ্ধু। সেণ্টারে তো নানারকম লোক আসে। রুরাল হেল্থ না কিসের কোর্স করতে নাগাল্যাণ্ড থেকে এসেছে সাতটা মেয়ে, তিনটে ছেলে—এখানকার কোন লোকের সঙ্গে মেশে না তারা, রোজ গাড়ি নিয়ে সক্কালবেলায় গ্রামের দিকে চলে যায়—বেড়াবেড়ি, অতীতপুর, সিংহলপাটন—ফিরতে ফিরতে বিকেল। দোকানের সামনে গাড়ি থামিয়ে পান চাইবে, ফিণ্টার উইলস—সন্ধের পর অবশ্য রোজ বাংলা চাই, সেসব কথা সবাই জানে না; কিন্তু কী রকম যেন লুঙ্গি পরা সব মেয়েগুলো—বুড্ডু পান বলে নিজেই সেজে নেয় যখন; আশপাশের রোজকার খদ্দেরদের দিকে তখন বুদ্ধু সামান্য অমনোযোগী যেন হবে না? তারক গেঁ খচে। কখন থেকে চার আনার বিড়ি চাইছি দিচ্ছিস না কেন বুদ্ধু? চায়ের দোকান থেকে দোতলায় হস্টেলে বাংলা সাপ্লাই করা বার করে দোব বলে দিচ্ছি! আমার নাম তারক ঘোষ! নাগাল্যাণ্ড পার্টিরা চলে যেতেই ঘুরে দাঁড়ায় বুদ্ধু—হ্যাঁ, কী যেন বলছিলে! এই উদাসীনতা তারকের মিটার বাড়িয়ে দেয় আবও। কি যেন বলছিলুম? বলছিলুম তোর দোকান আমি মায়ের ভোগে পাঠিয়ে দোব···। বুদ্ধু একটা মলাট ছেঁড়া ভাঁজ করা খাতা বার করে বলে—তেরো টাকা ষাট পয়সা···তারকের গলা মিইয়ে যায় যৎ-সামান্য। চার আনার বিড়ি দে, কখন থেকে বলছি! খাতায় যে কি লিখতে

কী লিখছিস কে জানে। পাঁচ-ছদিনের মধ্যে তেরো টাকা? বুদ্ধু বলল— পঁচাশি পয়সা। তারক বলল—ঠিক আছে। ও মাগিরা কুকুর খায়। জানিস কি সেটা! এত কিসের খাতির! বুদ্ধু বলল একজন আছে। এম-এল-এ'র বউ। সাইকেলে উঠে তারক গোমড়ামুখে বলল—তাই নাকি?

বেঁটে রাজাকে সবাই বলে জোকার। অবশ্য আড়ালে। তারক ঘোষ হল্লা করে গেল শুনে সে খুব নিরীহ মুখ করে বলল—কী হয়েছে রে বুদ্ধু? বেঁটে রাজাও পার্টির লোক। বুদ্ধু সাতকাহন শুনিয়ে দিল। বলে কিনা দোকান তুলে দেবে! সব শুনে বেঁটে রাজা বলে—তারক যদি মেরেই দিত দু-ঘা, কী করতিস তুই? পান্তাভাত পেঁদিয়ে তারক গতরখানা খারাপ করেনি কিন্তু। ষাঁড়ের মতন খাটে সারাদিন। বুদ্ধু বলল তাতে কী? বিরজুকে এক পাঁট মাল খাইয়ে দোব। ব্যাস। ওই দেবে কেলিয়ে বেষ্টি করে—। তারকের ওপর ওর তো....। বেঁটে রাজা খুশি হয় খুব। বাহ্। সিকে গেচিস্ দেকচি।

সন্ধেবেলা লঝঝড়ে একটা স্কুটার চালিয়ে ফটফট করে আসে ঝুমুরদা। স্যানিটারি ইন্সপেক্টর। এসেই বলবে বুদ্ধু রে। বুদ্ধু সেজে রাখে সব। আগে একটা লেবু চা। তারপর বিনা খয়ের চমন এলাচের পান। তারপর একটা সিগারেট। পানটা চিবোতে চিবোতে ঝুমুরদা বলে—চন্দ্র? বুদ্ধু জানিয়ে দেয়—এসেছিল কি আসেনি। কখন আসবে বলে গেছে। বলতে না বলতেই অবশ্য এসে পড়ে চন্দ্রকান্ত। অনেক দিন থেকেই দেখছে বুদ্ধু। ঝুমুর এলে চন্দ্র আসবেই। একটা টাকা বাড়িয়ে হাত পেতে থাকে। দুটো রিজেন্ট, বাকি পয়সা বিড়ি। দুজনে অনেকদিনের পার্টনার। দুজনে ভেতরের ফুটবল মাঠে গিয়ে বসে গুটিগুটি। টুকটুক করে ওদের সঙ্গে গিয়ে বসবে কোয়ার্টারের অন্য ছেলেরা। সে আড্ডাতেও বুদ্ধু কেটলি নিয়ে না গেলে—।

একদিন ঝুমুরদা একটা নতুন ভেসপা নিয়ে চলে এল। নীল রঙের চোখা মডেল। সবাই ঘিরে ধরল সঙ্গে সঙ্গে। নানারকম রিসার্চ। বুদ্ধু চেয়ে চেয়ে দেখে। ওসব তো আর চাপা হবে না এ জীবনে! দেখেই সুখ।

আশা থাকলে হয়; আজ নয়ত কাল! পুরনো গাড়িটা কিছুতেই বিক্কির হচ্ছে না ঝুমুরদার। একদিন বুক ঠুকে বলেই ফেলে বুদ্ধু—আমাকে দাও না! কিছু কিছু করে দোব। তা ঝুমুর ছেলে তো আর খারাপ নয়। পাঁচ জনকে নিয়ে থাকে। বউ নার্স। আনন্দনগরে কোয়ার্টার আছে। নিজের

চাকরি কোন্নগরে। সেখানেও একটা বাসা। এখানে তো বাবা-মা, পৈতৃক ভিটে ; ছেলে ছোকরারা ঝুমুরদা ঝুমুরদা ঝুমুরদা—মুখে লেগেই আছে সবসময় ; নিজের তো ছেলেপুলে হল না ; প্রথম পক্ষের বউটাও ভাগলবা এক বছরের মধ্যেই—ঝুমুরও সে, এক ধরনের আচাযি্যবাবু, মেয়ে দেখলেই···তা ঘোড়া দেখলেই যারা একটু খোঁড়া হবেই, তাদের তো আর সিধে রাস্তায় হাঁটলে চলে না ; হেলথ সেণ্টারের স্পোর্টসের দিনে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউসনের সময় মাইকের সামনে কেমন একটু ঝুঁকে দাঁড়ায় ঝুমুরদা—কেমন অন্যরকম গলায় বলে—মাননীয় সভাপতি···মাননীয়···। বুদ্ধুকে শুধু বলে ঝুমুর—চালাতে পারিস তো ? বুদ্ধু মোটেই ঘাবড়ায় না। সে ও শিখে নেব'খন। ঝুমুর ছাড়ে না—সে কীরে ? এদিকে আয়দিনি। বোস। এটা হল ব্রেক—গিয়ার বুঝিস্ ?···

দোকানের সামনে একদিন একটা গাড়ি দাঁড়াল ; সাদা রঙের অ্যামবুলেন্স ভ্যান ; রাস্তার ধারে সাইড ক'রে আবগারির সামনে ; গাড়িটার পেছন দিকের দরজার মাথায় একটা ভিডিও সেট বসিয়ে লাগিয়ে দিল ঝিন্‌চাক ঝিন্‌চাক। আই অ্যাম এ ডিস্কো ড্যান্সার। গিলে লে, গিলে লে ; এক দো তিন···। ব্যাপার কী ? দেখতে গিয়ে একে একে দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। সাইকেল নিয়ে দুধওলা যাচ্ছিল দুধ দিতে। সে দাঁড়াল। মিঠুন যদি আবগারি অফিসের সামনে নাচতে আরম্ভ করে দেয়, কে না দাঁড়াবে ? ডক্টর গিরি যাচ্ছিলেন কল-এ। তিনিও দাঁড়ালেন। হঠাৎ একটা গাড়ির মাথায় ভিডিও, মিঠুন, মীনাক্ষির নাচ, ব্যাপার কী ? ওহ নেসকাফে। ডাক্তারদের বোধহয় চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। ডাক্তার গিরির দিকেই প্রথম কাগজের কাপটা এগিয়ে দিল কফির লোকেরা। বিনা পয়সায় পাওয়া যাচ্ছে দেখে হাত বাড়িয়ে দিল সবাই। নাচগান চলছে তো চলছে। কে কে ইতিমধ্যে দুবার খেয়েছে তাই নিয়ে গুলতানি। বেঁটে রাজা বলল—ধুস। তেতো। ডক্টর গিরি হাসলেন মনে মনে। কফির ইজ্জত এরা কি দেবে ! এদের ওই বুদ্ধুই ভালো। অঙ্কের কড়া মাস্টার দিলীপবাবু যাচ্ছিলেন বাজারে। মিউজিক শুনে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনিও। ব্যাপার কী ? মফস্বলের সকালে নির্মল রৌদ্রকে কলুষিত করছে কে ? কারা ? কেন ? মাদার ডেয়ারির ক্রেট বাঁধা সাইকেল নিয়ে দাঁড়াল অবকাশ কৈরা। দিলীপ মাস্টার তাকে ক্লাসের বাইরে নালডাউন করিয়ে দিত প্রায়ই। ইস্কুলে যাওয়াই ছেড়ে দিল অবকাশ। এখন চান্স পেয়ে বলল—ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হচ্ছে স্যার ; গিলে লে···গিলে লে···। দিলীপবাবু

কিছু বলার আগেই লোকেরা এগিয়ে দিল কাগজের কাপ—আসুন স্যার; খেয়ে দেখুন, পয়সা লাগবে না। অন্যমনস্কের মত দিলীপবাবু বললেন—ও, লাগবে না? তারপর একটা সিপ দিয়ে বললেন—আমাদের ছোটবেলায় এসব ছিল না।

কথাটা তখন থেকেই মাথায় ঘোরে বুব্ধুর। ভিডিও ব্যবসায় অনেক পয়সা। ডেলি দুটো একটা খেপ থাকেই। রিকশায় সেট বসিয়ে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলো শো করে আসে। একশো টাকা। আশি টাকা। কাছে দূরে নানারকম। এলাকায় প্রায় তেরো-চোদ্দটা সেট চলছে। দত্তদের কয়লাগোলায় পরশু রাত্তিরে হয়ে গেল। আশা ভালোবাসা, মর্যাদা আর তেজাব। ডোমা, বিল্লা, পরমোদ, সব দেখে এসেছে। তেজাব হিট বই।

মেশিন নিয়ে, বক্স নিয়ে, বিশ বাইশ হাজারের ধাক্কা। অনেক টাকা।

চায়ের দোকান তো রইলই। কনট্যাকের জায়গা। দু-তিনটে বাচ্চাকে রাখলেই হবে। এখন এই ভিডিও ফিডিও আজকাল সবাই চালাতে জানে। ক্যাসেট তো ডেলি পাঁচ টাকা। শেওড়াফুলি থেকে আনলেই হবে। টাকাটা—।

টাবুলদার কাছেই কথা পাড়ে বুব্ধু। স্টিলকোর কাজুদাকেও বলে একদিন।

একটা ভিডিও সেট কেনো না টাবুলদা। ভালো ব্যবসা। একশো দেড়শো ডেলি থাকবে। আমি খদ্দের করে দোব। চালাবার লোক দিয়ে দোব।

আমি তো চালাতে পারি না। টাবুলদা গম্ভীর মুখে বলে।

লোক তো থাকবে।

নিজে কাজ না জানলে সে কারবার করা ঠিক না।

এমন কিছু দাম নয়। সস্তায় একটা মেশিন আছে হাতে। নতুন মাল। এক মাস দু মাস চলেছে।

নিজেরা দেখার জন্যে নিতে পারি। ভাড়া খাটানোর কারবারে রিস্ক।

কিসের রিস্ক? লোক থাকবে তো। বুব্ধু চেষ্টা চালিয়ে যায়।

লাইসেন্স নেই। ব্লু ফিল্ম দেখাচ্ছেন বলে পুলিশ তুলে নিয়ে যাবে।

ধুর। তেরো চোদ্দটা সেট চলছে এলাকায়।

তারা নিশ্চয়ই সবসময় সঙ্গে থাকে। আমার অত টাইম নেই। কখন কোথায় যেতে হয় তার নেই ঠিক। ডেলি তিন চারটে ডিস্ট্রিক ঘুরতে হয়!

তা অবশ্য জানে বুব্ধু। মোটর সাইকেল নিয়ে যখন তখন বেরিয়ে যায় টাবুলদা। মোকাম। লরিতে মাল নিয়েও যায়। খালাস থাকে হাওড়ায়।

হয়তো ভোরবেলা ফার্স্ট ট্রেনে ফিরল। টাবুলদাকে দিয়ে হবে না।

স্টিলকোর কাজুদা বলল—যে কারবারগুলো আছে, সেগুলোই সামলাতে পারি না। আবার ভিডিও! তুই কেন না!

কাজুকে কোনো উত্তর দেয়নি বুদ্ধু; তবে তলে তলে কাজ করে গেছে। টাকাটা একবার—। ঝুমুরদার দেওয়া স্কুটারটা নিয়ে নসিবপুরে একজনের কাছে যেতে হবে। কখন যে যাওয়া যায়!

রুরাল হেল্‌থ সেণ্টার লেখা সিমেণ্টের বোর্ডটার নিচে গাড়িবারান্দায় যে আড্ডাটা বসে রোজ সন্ধেবেলা, তাকে সবাই বলে অকাল তখ্‌ত্‌। দুধাপ সিঁড়ির ওপর চওড়া মতন একটা রক। বেঁটে রাজা গুমটি বন্ধ করে এসে ঝাঁট দিয়ে রাখে রোজ। দিনের বেলা সেণ্টারের অফিস। সন্ধের পরে অন্য চেহারা। এক ধারে গ্রিলের মত ফাঁক ফাঁক সিমেণ্টের দেওয়াল। ফাঁক দিয়ে বিরাট বাঁধানো আমতলা। তার পাশে বন্ধ চেস্ট ক্লিনিক। তেরো বছর ধরে বন্ধ।

একতলা সরু লম্বা ধরনের অফিসবাড়িটার শুরু এই তখ্‌তের দিক থেকে। অফিসঘরগুলো যেদিকে, সেদিকটায় কোলাপসিবল গেট। তালাবন্ধ। বেঁটে রাজা আজও ঝাঁট দিয়েছিল। গেট-গোড়া থেকে একটা পেনও কুড়িয়ে পেয়েছে।

প্রথমে এল প্রদীপ অয়েল মিলের প্রদীপ সাধুখাঁ। হিরো হণ্ডা থামিয়ে গাড়ির ওপর বসেই দেখল, অকাল তখ্‌তের সামনে একটা উবু হয়ে বসে থাকা ভিড়। পেছনের রো-টা দাঁড়িয়ে। ভেতর থেকে হিন্দি ডায়লগ আসছে। ভিডিও?

গাড়ি স্ট্যাণ্ডে রেখে কাছে গিয়ে একটা হাফপ্যাণ্ট পরা বাচ্চাকে জিগ্যেস করল সে। কী বই রে?

লাল দোপাট্টা মলমল কা!

প্রদীপ সরে দাঁড়াল এক পাশে। রোজ সারাদিনের পর যেখানে বসে বন্ধুদের সঙ্গে পাঁচরকম কথা, আড্ডা হয়; যে জায়গাটা এতদিন বেঁটে রাজা প্রদীপ অনাথ সিংহরায় কাজুদের একচেটিয়া দখলে ছিল অন্তত সন্ধের পর থেকে মধ্যরাত অব্দি—কতদিন এখানে তারা রাত নটার পর চারিদিক সুনসান হয়ে গেলে নিজেদের মধ্যে খুলেছে কত রকম বোতল—জলের কেটলি হাতে তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত বুদ্ধু; সেখানে আজ…।

ভটভট করে একটা রাজদূত এসে দাঁড়াল। অনাথ সিংহরায়। মোটাসোটা অনাথকে কেউ কখনো হাঁটতে দেখেনি। সারাদিন সব সময় এই বিশাল কালো বাঘের মত রাজদূতের পিঠে।

ভিড়ের মধ্যে প্রদীপকে খুঁজে নিয়ে অনাথ বলল—কী ব্যাপার? তথ্যতে ভিডিও!

মরা মরা গলায় প্রদীপ বলল—তাই তো দেখছি।

দেখলেই তো হল না। মালটা কার?

কে জানে কার! আজকাল তো সবাই চালাচ্ছে।

সে চালাক্ গে। এখানে···।

অনাথের প্রশ্ন সেইটাই। এতদিনের আড্ডার জায়গাটা···।

স্টিলকোর কাজু এসে বুঝিয়ে দিল সব। আমাদের বুদ্ধু তো সেট কিনেছে। জানিস না? হপ্তাখানেক হয়ে গেল এদিক ওদিক ভাড়া খাটাচ্ছে। আজ ভাড়া নেই বলে এখানেই লাগিয়ে দিয়েছে···।

বুদ্ধু? প্রদীপ আর অনাথের প্রশ্ন। সমস্বরে।

গরীবের ছেলে। অনেকদিনের শখ। এই একটু সাহায্য করলুম আর কি!

তুই? এ প্রশ্ন অনাথের। কাজুর ওপর তার নানারকম টুকটাক রাগ। এখন আরও বাড়ল।

উত্তর না দিয়ে একগাল দাড়ি নিয়ে কাজু হাসে। সর্বংসহা হাসি।

সাতসকালে আচাযিবাবু বুদ্ধুকে ডাকে। ঘুম হল? আঁচ দিতে হবে না?

আগের মত আর সুড়সুড় করে উঠে পড়ে না বুদ্ধু, এই দিই। বলে পাশ ফিরে শোয়।

কাঁচা পয়সার গরম হয়েছে। বলতে ইচ্ছে করলেও বলে না আচায্যি। হাজার হোক বয়স কম। নতুন সেট থেকে ডলি এক দেড়শো তো হচ্ছেই। সেট কেনার টাকা কোত্থেকে পেল গেঁড়েব্যাটা কে জানে।

ওঠ রে বুদ্ধু। রোদ উঠে গেল যে। দোকান খুলতে হবে না?

রোদের এখন কোথায় কী? সবে ভোর। বড়কা আর বুল্লি কাল সেট নিয়ে ফিরেছে রাত দুটোয়। বাঁধা রিকশওলা গোলক দশটাকা বেশি চাইছিল। বলে কামারকুণ্ডুর রাস্তা খারাপ, কষ্ট হয়েছে। রফা করতে আড়াইটে বাজল। এত ভোরে ওঠা যায়? ঘুম ভাঙলে চা চাই তো বাড়ির বউকে ধুনো দে।

সেখানে তো জুজু। যত রোয়াব এই বুদ্ধুর কাছে সব।

চোখে পিঁচুটি নিয়ে রামিয়া আসে। সেই গার্টার বাঁধা লালচে চুল। সেই হাঁটু ছাপানো ঝোলা ফ্রক। ডিমটা ভেজে দে না বুদ্ধু।

বলেছি তো পারব না। চিৎকার করে ওঠে বুদ্ধু। এতদিন যা মনে মনে করত।

এমনিতে আড়ষ্ট থাকে রামিয়া। বুদ্ধুর মেজাজ দেখে আড়ষ্ট হয়ে যায় আরও। ঠোঁট-কোট ফুলিয়ে কী যেন বিড়বিড় করতে কবতে চলে যায়।

গম্ভীর মুখে চা করতে করতে রামির চলে যাওয়া দেখে বুদ্ধু। দোকানে খদ্দেব বসে আছে। ঘুমটা আজকাল ভালো হয় না। কেউ একটু কিছু বললেই মেজাজটা চড়াক করে চড়ে যায়।

দুপুরের দিকে দোকান বন্ধ করে চান করতে যাবে ভাবছে বুদ্ধু, একটা বিরাট থলে দুজনে দুদিক থেকে ধরে ধরে নিয়ে এল। নাগাল্যাণ্ডের মেয়ে-গুলো। কেমন ঘাগরা পরা। এরা কুকুর খায় কিনা বুদ্ধু জানে না। তবে বাংলা মদ যে প্রচুব খায় রোজ সন্ধেবেলা, সেটা বেশ হাড়ে হাড়ে জানে। দোকানের কাজের ফাঁকে দু-চারটে বোতল এনে রাখতে হত প্রায়ই।

বুড্ডু। দিস এমটি বটলস্। ইউ সেড্।

ওহ্। খালি বোতল ফেরত এনেছে। এই দুপুরবেলা, সবাইয়ের সামনে দিয়ে? মাগিদের হিম্মত আছে। কুকুর খাওয়া জাত বলে কথা।

ভিডিও শো? ইণ্টারেস্টেড? বুদ্ধু শুনে শুনে শিখে গেছে অনেক ইংরেজি। ফ্রি পিকচার। হোল নাইট। টু হানড্রেড ওনলি;

অনা ইংলিশ? ব্রুস লী?

হো জায়েগা। জেমস্ বণ্ড?

নো জেমস। ব্রুস লী।

ব্রুস লী দো ফিল্ম হ্যায়। এক হিন্দি লে লিজিয়ে। দয়াবান। বিনোদ খান্নাকা।

নেহি। মিঠুনওয়ালা দে দো।

বটল কিতনি হ্যায়?

গিনতি নেহি কিয়া।

উধার রাখ দিজিয়ে। সামকো সাত বাজে লে জায়েগা।

কেয়া চিজ ?

ভিডিও। দো ক্রস লী। এক মিঠুন।

হাঁ হাঁ। ঠিক হ্যায়। পচাশ রুপেয়া রাখ দো ৰ আ্যাডভান্স।

পুকুরঘাটে বিশ্বাসবাবুর মেজ মেয়ে চেপে ধরল। উত্তমকুমারের চাওয়া পাওয়া দেখাবি ? তোর তো এখন ছেবি ব্যাপার !

গলা জলে দাঁড়িয়ে বুদ্ধ বলে—বাড়িতে দেখবে ?

তা নয় তো কি রাস্তায় দেখব ? কত লাগবে ঠিক করে বল। ব্লাউজের ভেতর হাত ঢুকিয়ে সাবান মাখতে মাখতে বলে সে।

চাওয়া পাওয়া ? পঞ্চাশটা টাকা দিও।

সাবান মাখা হাত থমকে যায়। প-ন-চা-শ ?

আচ্ছা আচ্ছা। বুদ্ধু বুক জলে আসে। তার কাঁধ দেখা যায়। হাত দেখা যায় না। চল্লিশ দিও। টিভি তো আছে ? তা'লে বক্স নিয়ে যাবো না। শুধু সেটটা পাঠিয়ে দোব।

পাঠিয়ে দিবি মানে ? লোক রেখেছিস নাকি ?

আমি তো, দোকানে, এঃ, ই, থাকি। বড়কা আর বুল্লি যায়।

সাবান ঘষতে ঘষতে বিশ্বাসের মেজ মেয়ে বলে—বাব্বা। লোক রেখেছিস ?

বুদ্ধু আবার গলা জলে ফিরে যায়। লোক তো রাখতেই হবে। একা কতদিক সামলাবো ? বলেই ভুস করে একটা ডুব দেয় বুদ্ধু।

ট্যাক্সিটা কোথায় দাঁড়িয়েছিল ?

বাসদেবপুর থেকে একটু এগিয়ে।

ওদিকে কোনো বাড়ি নেই বুঝতে পারিসনি তোরা ?

অন্ধকার তো। কাঁদতে কাঁদতে উত্তর দেয় বড়কা।

গট আপ আছে টাবুলদা। গট আপ। এক্ষুনি বলছিল চড় মেরেছে ওকে, আবার এখন বলছে মারেনি।

নার্ভাস হয়েও বলতে পারে। তারপর কী হল ?

আর, কী হল। টিপটিপ বৃষ্টির দিনে……। আর বুদ্ধুও তেমনি, কোথায় ভাড়া দিচ্ছিস—নাম ঠিকানা না জেনে, চেনা নেই জানা নেই—ভাড়া দিয়ে দিলি ?

কত লোক কত রকম যে বলছে। গত দুমাসে নাকি মোট সাতটা সেট এই একই ভাবে গেছে। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকে। অ্যাডভান্স দিয়ে নিযায়। রিকশ থামিয়ে ট্যাক্সিতে তুলে··· ।

সবাই থানায় ছুটল। বড়বাবু বলে—কারবারটাই তো বেআইনি। অ্যাক-শন নিতে গেলে তো বুদ্ধুকেই অ্যারেস্ট করতে হয় সবার আগে। ক্যাশমেমো নেই। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড পারচেজ। এখন চোট গেছে বলে—। কাকে ধরতে কাকে ধরব ?

আজকাল সারাদিন কালোমুখ আরো কালো করে থাকে বুদ্ধু। অনেকগুলো টাকা। সবসুদ্ধ বাইশ দিন ভাড়া খাটিয়েছে। সবাই এসে সান্ত্বনা দিয়ে যায়। কপালের নাম গোপাল।

অকাল তখ্‌তে আবার আগের মত আড্ডা বসে। রাত এগারোটা নাগাদ হাঁক শুনে জলের কেটলি হাতে আবার আগের মত তটস্থ হয়ে ছুটে যায় বুদ্ধু। কখন কী হয়ে যায়! সামলে চলাই ভালো।

ডিমটা ভেজে দে না বুদ্ধু! সেই রামি।

জলের কেটলিটা এগিয়ে দেয় বুদ্ধু। মুখটা ধুতে পারিস না ভালো করে। চোখে পিঁচুটি থাকে কেন।

ডিমটা দিয়ে কেটলি নেয় রামি, রোগা রোগা হাত কেমন কাঁপে। চোখে জলের ঝাপটা দেয় খুব সাবধানে।

ওমা, পাখি যে!

কেটলি ফেরত দিয়ে রামি দেখে, বুদ্ধুর দোকানে টিয়াপাখি। নতুন খাঁচা। গলায় লাল কণ্ঠি। কিনলি নাকি ?

একটা ছেলে কাল খুব চেপে ধরল। সন্ধে হয়ে গেল, বিক্রি হচ্ছে না। তুই নে।

নিয়ে নিলি ?

সহজে কী নিই। যত বলি—পাখি আমি কী করব ? সে তত বলে, বিক্রি হল না। নিয়েই নিলুম। বাইশ টাকা বলছিল। দশ টাকা দিইচি। ওরও তো পয়সার দরকার। গরীব লোক।

হ্যাঁ; তা দরকার। রামিয়ার কোটরাগত চোখ কেমন উজ্জ্বল দেখায়।

এত কথা তো কেউ বলে না তার সঙ্গে কোনদিন!

তেল এনে দোব?

না না, বুদ্ধু জানায়। আমি সব করে দিচ্ছি। এখন তো মামলেট করি দোকানে। তুই একটু দাঁড়া। কয়লা দিয়েছি তো। আঁচটা একটু—।

সদ্য ধোয়া পিঁচুটি বিহীন চোখে রামিয়া দেখে, কালো কালো কয়লার ফাঁক দিয়ে নীল নীল ধোঁয়া উঠছে।

সকালের আঁচে কেমন গলগল করে ধোঁয়া হয়। শেওলার মতন রঙ। এই ধোঁয়াটা নীল হচ্ছে। রামিয়া জানায় বুদ্ধুকে। আর কাউকে তো এসব কথা জানানো যায় না।

বুদ্ধ বলল—হ্যাঁ। অনেক রকম হয়।

হারিয়ে যাওয়ার ইতিহাস

☐ বাবুয়াব ভুলভাল হাসি

'মাছ' 'মাছ' বলে পারুলপিসি ছুটে গেল খিড়কি পুকুরের পাড় দিয়ে। বয়েস হয়েছে। মুখশ্রী একদা সরু ধরনের ইন্দিরা গান্ধীর মত ছিল, এখন তা ক্যাকাশে, বিবর্ণ, গালে-গর্ত, ফোকলা দাঁত, চরকা-বুড়ির প্রেতছায়া। কথা ছিল না? এমন হবার, তেমন কোনো কথা ছিল না? কথা আর কিসেরইবা ছিল! খিড়কির ঘাট থেকে না ছুঁচিয়ে উঠে এসে বাবুয়ার ওই যে হেগো পোঁদে হাসি খেপী বাঁশপাতা দেখে মাছ মাছ বলে চিল্লাচ্ছে! কারবার!

তা, পারুল তো আর পিসি নয় আসলে নকাকার রাঁধুনি ছাড়া আর কি, অন্ততঃ বাইরে থেকে? সাইকেলখুড়োর বাড়িতে দুবেলা খেয়ে আসতো নকাকা, সেসব অনেকদিন আগের কথা: সাইকেলখুড়োর নাতনি নকাকার মোটা গোঁফ দেখলেই দুধ খেয়ে নিত, অন্যথায়, সাইকেলকাকিমাকে দুধের গ্লাস নিয়ে নাতনির পেছনে সারা বাড়ি—ধেয়ে নাও সোনামণি, এমন করে না, দু-ই দেখো বাঁশবন থেকে সড় সড় সড় সড় করে ভুতুম আসছে। ভুতুম বলে কিছু হয় না। সে-ও আসতো না। নাতনি দুধও খেতো না। শুধু নকাকার গোঁফ দেখলেই···। তাই দেখে সাইকেলখুড়ো এক কথায় রাজী হয়ে গেল-- আমার বাড়িতে দুবেলা দু-মুঠো খাবেন এ আর এমন কি···।

মঠের কড়ি বরগাগুলো সব নকাকার দান। মিশনের খাতায় লেখা আছে -- দাতা শ্রী বিজয়বসন্ত শীল। তা বিজয়বসন্ত আবার দাতা। মায়ের ভাগ, পালিয়ে যাওয়া সেজদার ভাগ, ছোট ভাইয়ের ভাগ, অন্য শরিকের জমি জমা, পুকুর সব একা কিনেছে। পিঠে কুঁজ, গলাটা খোনা। এত খাবে কে?

ব'শে বাতি দেবার তো কেউ নেই। তেমাথার মোড়ে উদো কামার একদিন দুপুর রোদে বিজয়কে ধরেছিল চেপে—হ্যাঁরে, তামলিদের মেজো মেয়েটা বাঁশবাগানে হাগ্‌তে ঢুকলেই তোর আধুলি হারিয়ে যাচ্ছে শুনছি! মনে ধরেছে নাকি? বলিস তো বল। লজ্জার কিচু নেই। ব্যাটাছেলে। আমি কতা পাড়বো? তা নকাকা খোনা গলায়—কি কতা? ন্যাকার মত বলেছিল। উদো কামার বেশ খচে গিয়ে—তোর বিয়ের কতা—বুস্‌তে পাচ্চো? তা নকাকা আরও খেপে খ্যান খ্যান করে উঠেছিল ঋষি ময়রার মিষ্টির দোকানের সামনে, দুপুরবেলার কুকুরকাঁদা গরমে, উত্তেজিত সেই খোনা গলায়—বিয়ে? বিয়ে ক'রে খাওয়াবো কি? আমার ইয়েটা খাওয়াবো?

তা বিয়ে না ক'রেই পারুলকে যে কি খাওয়ায় দাতা শ্রীবিজয়বসন্ত সে প্রশ্নে আর গেল না উদো কামার, বেলা বেড়ে গেল্‌লো অনেক, ঘরে ফেরার তাড়া ছিল। তবু কথা তো হাওয়ায় রটে। বিজয় শীলকে বিয়েব কথা বললেই সে নাকি বলছে আজকাল—খাওয়াবে কি? আমার···। এইসব শুনে ফেললো সবাই। বাবুয়াও কি শোনেনি? নিজের কাকা তো কি হয়েছে তাতে! অত বড় বাড়িটা গিলে খেতে পারে, আর বিয়ে করে বৌকে খাওয়াতে গেলে···। সেই রাগেই তো—তামলি বাড়ির মেজো মেয়েটা যেদিন পেছন থেকে ডাকল—এই, ভাইপো—বকফুলের বড়া হয়েছে দেখলুম বাড়িতে, খাবে নাকি? সেদিন বাবুয়া, এই অহেতুক 'ভাইপো' ডাকের চমৎকার অমর্যাদা করে উঠতে পেরেছিল। অবশ্য ওই তামলিবাড়িরই ছাদে। সম্ভাবনাহীন ব্যর্থ সেই হয়তো নকাকা, শেষ ওব্দি বলে কি, বাঁশবাগানে সত্যি সত্যি আধুলি ফেলে যায়, জানিস? আমি তিন দিন কুইড়ে পেইচি!

বাবুয়ার এই হাসিটা ভুল নয়। বাঁশবাগানে আধুলি। তা-ও নকাকার। ফুলুরি পর্যন্ত পারলে যে বাকিতে কেনে! রোগা ও সিড়িঙ্গে লম্বা, দাঁত-উঁচু। সি পি এম বিরোধী, নিরুপায় কংগ্রেস আই বাবুয়া, হি-হি হা-হা হাসতে থাকে আর বলে—ও আধুলি তোর হজম হবেনে পাগলি, ও তুই আমাকে দিয়ে দে। তামলিবাড়ির চিলেকোঠা শির শির করে বাবুয়ার হাসিতে। খেপী বলে—ইস্‌, দিয়ে দেবে! মুশকিলের মধ্যে, হাসির দমকে, উত্তেজনা উবে যায় বাবুয়ার—খেপীর 'ইস্‌' শুনেও তার কিছুই হয় না।

দাদার ছেলে তো তাতে কি; বাবুয়া আজকাল লীডার। নকাকা লীডার হবার কথা ভুলেও ভাবে না, কোয়ালিটি ছিল কি না ছিল তাতে কারই বা

কি। সে আর কার আছে! অমন যে লেবু মিত্তির—এম এল এ অনন্ত জানার ডান হাত, আজন্ম সি পি এম—সেও তো 'অম্বুজাক্ষ' মানে জানে না, হাই ইস্কুলের বাংলা মাষ্টার। নকাকাকে একদিন হাটতলায় সকালবেলা ধরে লেবু মিত্তির—বিকেলে মিছিল আছে, বিজয়—তোর বাড়িতে অন্তত পঞ্চাশ জনের রুটি তরকারি···। বাবয়া এসে না পড়লে হয়তো হার্টফেল করতো নকাকা। পারুলের শরীল ভালো নয়—চিঁ চিঁ করে খোনা গলায় এই জাতীয় কিছু বলতে বলতে পালাবার পথ দেখছিল দাতা শ্রীবিজয়বসন্ত —তা বাবুয়া, ম্যাটারটা এক লহমায় বুঝে নিয়ে—না না, লেবকাকা, ওসব সি পি এমের রুটি তরকারি আমাদের বাড়িতে হবে না, একদম হবে না, আমাদের সাত পুরুষেব কংগ্রেসেব বাড়ি—। মিত্তিব গোল গোল চোখে ছাই করে ফেলতে চাইছিল বাবুয়াকে; তা হাটতলার মধ্যে সকালবেলা দুপক্ষের লোকেরই ভিড় ছিল; সুবিধে হয়নি। তারপর থেকে হাত-পা গুটিয়ে নিয়েছে নকাকা। লেবু মিত্তির বড় লীডার ঠিকই; তবে, বাবুয়াটবা কম কি। এই গ্রামে-গঞ্জে অপোজিশন দেওয়া, কম কথা! বুকের পাটা চাই। যক্ষের মতন বিষয় আগলাতে গিয়ে যেটা খোয়া গেছে বিজয়েব। বেশী রাতের দিকে ওইটাই যা পারুলের দুঃখ। সে কথা থাক।

জেলে-বৌ বাসন্তীর কটা চারা পোনা কিছুতেই বিক্কিরি হল না। অবেলায় পারুলকে এসে ধরতেই রেগে আগুন হয়ে সে বলে—এই ভর দুপ্‌পুর বেলা বেধবার কাছে মাচ আনলি বৌ? তোর ভাগাড়েও জাগা হবেনে রে! জেলে-বৌ নাছোড়। এই কটা চারা, বেলা বাড়ছে। না নিলে। কোত্থেকে এসে পড়ল বিজয়বসন্ত। কি হল? চেনা চেনা খোনা খোনা গলাটা শুনতে পেয়ে পারুলের চিলচেঁচানি বাড়ল। বেঁটে আর কুঁজো হলে কি হয়, লোকটা হাঁটতে পারে হন হন করে। কোত্থেকে ঠিক দেখতে পেয়েছে জেলে-বৌ মাছ নিয়ে ঢুকেছে। দেকো না, দুপহর বেলা হল, বৌ বলে মাচ নাও! আমি বেধবা নোক মাচ নিয়ে করবোটা কি! হঠাৎ বাবুয়াও এসে গেল। কত করে বলচে? তাই শুনে নকাকা—তোমার তো পাল্লা নেই! জেলে বৌ মিন মিন করে বলে—এই তো কটা চারা, তার আবার পাল্লা! নেবে না তাই বলো। নকাকা উবু হয়ে বসে—এ তো ওবেলা পচে যাবে গো। সঙ্গে সঙ্গে মুখঝামটা দিয়ে উঠলো পারুলপিসি—ভেজে রাখলেই তো হবে। খুব বেশী তেল তোমার লাগবে না, নকাকা মাছগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে—বাড়ি ব'য়ে নেয়েচো, ফেরাবো

নি। তারপর ফিস্ ফিস্ করে—তোমার ভোট আছে তো বৌ? জেলে বৌ বেশ মুষড়ে পড়ে। মাছ বিক্রির সঙ্গে ভোটের কি? মিন মিন করে বলে—থাকবে নে কেন? ভ্যানগাড়ি করে নিয়ে তো যায়। নকাকা মাছগুলো গুছিয়ে নিতে নিতে বলে—কানে কানে, খোনা গলায়—ছাপটা তা'লে হাত চিহ্নতেই—বুসলে? এ কথা শুনে বাবুয়ার অত হাসির কি ছিল? হিহি, হাহা? শালা দাঁতছরকটা। হাতের একটা ভোট বাড়লে তোরই তো লাভ!

বড় কত্তার মেজোছেলে একদিন দশ নম্বর বাস থেকে ঝুপ করে নামল। বাস থামে বাড়ির সিং দরজায়। এ বাড়ির ছেলেদের চেহারাই আলাদা, দেখেই বাবুয়া চিনেছে—এ সেই ছোটবেলার হাবলা-দা। সেভেনে পড়তে মাথা খারাপ হয়েছিল প্রথম। ন্যা টা হয়ে ঘুরে বেড়াতো। সেরে গেসলো মোটামুটি। ইলেভেনে উঠে আর একবার। যাকে তাকে কাটারি নিয়ে তাড়া করতো। সেই যে কলকাতায় চালান হয়ে গেল, আর ফেরেনি। এতদিন পরে আবার—। বেশ চকচকে জামাকাপড়। পেছন পেছন নাবলো কালোমতন একটা ভালো চেহারার মেয়েছলে। সঙ্গে বেশ বোঁচকাবুঁচকি। তার মানে থাকবে নিশ্চই। হাবলাদা বিয়ে করেছে? বৌদির হাবভাব দেখে সি পি এম মনে হচ্ছে! বাসটা ধুলো উড়িয়ে চলে যেতেই ভজা নাপতের ছেলে সাগর সাইকেল থামিয়ে দাঁড়ালো। হাবলাদা না? হাবলা একগাল হাসল। সাগর না বলে পারে না—শেষ কালে এই গোডাউনে? হাবলাদা বলে—মাল যে কলকাতার বাজারে কাটলো না! বোদের পুকুরে মাছ ছেড়েছে অনেক সাগর। পাটের ব্যবসা। বোধায় তাগাদা থেকে ফিরছে। সাইকেলে স্টার্ট দিয়ে বলল—তা ভালো। সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে সবাই কেটে পড়লে কি ক'রে হবে? দু একজন থাকো! হাবলাদা বলে—দেখি। সাগর আবার বলল—তবে, সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে—বলে একটা কথা আছে না? তোমরা এখানে বাস করতে লাগলে প্রবাদটা পাল্টে যাবে! হাবলাদা আবার হাসলো—তাই নাকি! সাগর ততক্ষণে চালিয়ে দিয়েছে সাইকেল। বাড়ির দিকে এগোতে গিয়েই বাবুয়াকে দেখতে পেল হাবলাদা। এতক্ষণ খেয়াল করেনি। তুই বাবুয়া না? উঁচু দাঁতগুলো বার করে বাবুয়া হাসে। ভালো আছ? হঠাৎ খেপে গেল হাবলাদা। হ্যাঁরে বাবুয়া, শীলবাড়ি শীলবাড়ি বলছি—বাসে কেউ বুঝতেই পারলো না। কণ্ডাকটর বলে—তেমাথার মোড়ের আগে তো? সাইকেলের দোকান বলে একটা

স্টপেজ আছে, শীলবাড়ি বলে তো কোনো ইস্টপ নেই। এসব কবে হল বাবুয়া ?

তা বাবুয়া না হেসে থাকতে পারেনি। হিহি হিহি করে হাসছিল। তোমার কি অবস্থা হাবলাদা! শীলবাড়ি ছিল দাদুর আমলে। প্রসাদ রায়কে জমি দিয়ে বসিয়ে সাইকেলের দোকান করে দিয়েছিল দাদুই। পুরো গ্রামটাই তো তখন দাদুর হাতে ছিল। তারপর বাস স্টপের নামটা কখন 'শীলবাড়ি' থেকে 'সাইকেলের দোকান' হয়ে গেছে—বাবুয়া তার কি জানে ? হাবলাদার হাবলাপনা দেখে না হেসে পারা যায় !

□ নকাকার সংসারে মেজবৌ

আমার ভাই বলো, দাদা বলো, স্বামী বলো—সে তুমি যাই বলো, সবই তোমার ওই খুড়শ্বশুর। পারুলপিপি মেজবৌকে বোঝাচ্ছিল।

তোমার কাকা তো চা খেত না ! হাঁটু মুড়ে ব'সে দুইহাঁটু দুহাতে জড়িয়ে যেন জমিয়ে বসে পারুলপিসি। বউকে আসন পেতে দিয়েছে। ভালো ছেলের মতন হাবলাও বসে আছে বাবু হয়ে। বাটিতে মুড়ি। ফুলুরি এনে দিয়েছে নকাকা। অবশ্যই ছোট সাইজেরটা। পারুলপিসি চা বসিয়েছে।

তা আমি একদিন বন্নু, শংকরের বৌ একটা ছাঁকনি ফেলে দিচ্ছিল। আমি বন্নু অ বৌ, ফেলে দিচ্ছো ? হাতে নিয়ে দেকি, ভালোই তো আচে। কাকাকে বন্নু, চা একটু এনে দিলে ছেঁকে দেকা যায়, কাজ চলবে, না ফেলেই দেওয়া ভালো। দু-তিনদিন তো আনতেই চায় না। একদিন এনে দিলে। তা দুটো একটা পাতা গলে যায়।

ওই ছাঁকনিটাই চলছে নাকি? হাবলা প্রায় বলেই ফেলেছিল। তার আগেই পারুলপিসি বলল—কাকা তা'পর জালটা পাল্টে আনলে। নতুন একটা ছাঁকনি—না না, আমিই বন্নু এতেই হয়ে যাবে। জালটা শুধু পাল্টে দিলে…।

মেজবৌ বুঝল, পিসি বোঝাতে চাইছে শ্বশুর মশাই পিসির খুব বাধ্য। তা বাধ্য তো ভালো।

দশ নম্বর বাস কি এখনো সেই ঘণ্টায় একটা ? হালচাল জানতে চায় হাবলা। চাকরি করা বৌ ! একটু সি পি এম টাইপের। যখন যা বলে

করে দিতে হয়। ঘরে তুলতে না তুলতেই শাশুড়ির যা রিসেপশান। হবে না, কংগ্রেসের বাড়ি যে! বরানগরের বাস তুলে সোজা সাতপুরুষের ভিটে। এখান থেকে বৌয়ের অপিসটাও কাছে। দশ নম্বরে হরিপাল। তার পর তিনটে স্টেশন। কত সকালে বাস ধরতে হবে কে জানে!

বাস ফাসের খবর আমি কিছু জানিনি বাপু। ঘরে বসে রান্না করতে করতে শুনতে পাই যাচ্ছে আসচে এই পর্যন্ত। বাপের বাড়ির বাস হলে আওয়াজটা শুনি। হরিপালের বাসগুলো ক্যাঁক ক্যাঁক করে যায়। প্যাসেঞ্জার বেশি তো!

মেজ বৌ কথা বলে—আমার তো হরিপালের বাস।

হ্যাঁ হ্যাঁ। আশ্বস্ত করে পারুলপিসি—বাপের বাড়ির বাসে তুমি কেন যাবে! তোমার বাড়ি তো কলকাতা? নাকি!

তারপর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে পিসি—আমার ভাইপোর এক মামা থাকে বাগবাজারে। মাঝে মাঝে আসে। অনেকদিন এ্যাসেনে। কলকাতার লোকের সব মাথাগরম।

এই সকয় গোপনে বৌকে একবারটি আড় চোখে মেপে নেয় হাবলা। মুড়ি খাচ্ছে। খুব আস্তে ধীরে মুড়িটা খাচ্ছে। অভ্যেস নেই তো। গ্রামে কোনোদিন থাকেনি যে! মুড়ি খাওয়া কি সোজা কাজ।

চায়ের গরমটা আমার লাগে! বয়েসের গরম তো নেই আর। হাঁটু থেকে হাত ছাড়িয়ে পারুলপিসি স্টোভে চাপানো চায়ের জলের দিকে চায়। ফুটে এসেছে। এক কোনে রাখা কৌটো থেকে গুঁড়ো চা সরু লম্বা আঙুলে তুলে জলে ছিটিয়ে দেয় পিসি, বাউনঠাকুরেরা এই ভঙ্গিতে ফুল ছোঁড়ে ঠাকুরের পায়ে। বৌ হলে পাতাটা দিয়েই জলটা নামিয়ে রাখতো, ঢাকা দিয়ে রাখতো। পিসি নিশ্চই ফুটিয়ে তেঁতো করে দেবে চা টা। কলকাতার মেয়ের মুখে রুচবে তো! কাল থেকে ভালো ফুলুরি এনে দোব তোমায় —বড় বড়। হাবলা ফিস ফিস করে বলল। মেজ বৌ বলল—এ গুলোও তো ভালো। বেসনটা ফেটিয়েচে অনেকক্ষণ; কালোজিরে দিয়েছে। হাবলা বলল —সাইজ ছোট।

চা নামিয়ে ফেলেছে পিসি। দুধ কি তাহলে পরে মেশাবে? জাল পাল্টানো ছাঁকনিটা আঁচলে বেশ করে মুছে নিয়ে পিসি চা ছাঁকতে ছাঁকতে বলে—তোমার কাকার ওই এক ধাত। চরকাটা ঘ্যাট্ ঘ্যাট্ করছে, সুতো

ছিঁড়ে যায়, তু মাস ধরে সারিয়ে দেবার আর টাইম হয় না। সাইকেল দোকানে গিয়ে মাথা হেঁট করে দাবা খেলবে। মরণ! মুখ পোড়া খেলা একবার আরম্ভ হল তো হল। শেষ হবার নাম নেই। যতবার ডাকতে যাই খালি বলে যাচ্ছি, যাচ্ছি। নলি বাটার পয়সা নে এলে কি টের পায়, বলে আমার মুখ দেখে বোঝে। বলে আমার কাছে জমা রাকো, তোমার কাছে দিদি হাইরে ফাইরে যাবে! তা আমার তো নিজের বলতে তিনকুলে কেউ নেই, সবই তোমার ওই নকাকা। এত বড় বাড়ি—মানুষটাকেও তো কেউ দেখল না। তা আমার বাপের বাড়ি থেকে ভাইপো ভাইঝিরা মাঝে মধ্যে আসে—তখন এটা সেটা আনতে বললে এনে দেয়; পয়সার খোঁটা দেয় না! লোক খারাপ তা বলবো না। বাজারের লোকে অবিশ্যি বলে। তা বলে বলুক গে। এই বয়সে পেট ভাতে থাকি, বাল্যবিধবা—ভাত-কাপড়ের একটা সম্মান আছে তো? কে কাকে দেয় বলো। ছ্যাখ হাবলা, এই চা তোর আবার চলবে তো? ছোট্ট বেলায় তো আমার কোলে না উঠলে কাঁদুনি থামতোনি, এখন তোর রোজগেরে বৌ হয়েছে, কাকার মতন গোঁফ হয়েছে, এখন কি আর মুখে রুচবে, আমার চা?

রঙটা তো ভালোই হয়েছে। ম্যানেজ দিচ্ছে মেজ বৌ।

তুমি তো চলে গেস্লে জানতুম। আবার এলে কবে? বুঝতে চাইছে হাবলা।

আমি গিয়ে নে এলুম। কখন ঘরে ঢুকছে নকাকা। ভুষো পরা হ্যারিকেনের আলোয় ভালো করে আলো হয় না। কদ্দিন আর পরের বাড়িতে—। তোরা তো যে যার চলে গেলি!

দিব্যচক্ষে দেখলে নাকি, চা হয়ে গেছে? কোতায় কোতায় থাকে, খুঁজে পাবেনে তুমি কিছুতেই। দরকার পড়লে তবে দেকা দ্যায়। এই নাও, চা।

চা খেলে জিবে কেমন জল কাটে। তোদের হয়? নকাকার প্রশ্ন।

হবে নে কেন? পারুলপিসিই বলে দিল। সবায়েরই হয়। তোমার যেমন কথা।

চাবি নিবি তো? দেয়ালের পেরেকে ঝোলানো ক্যালেণ্ডারেরর মাথা থেকে ওপরের ছোটকাকার ঘরের চাবিটা পেড়ে দেয় নকাকা। হাবলা লক্ষ্য করে, তাকে নয়, চাবিটা এগিয়ে দেওয়া হল বৌমার দিকে। কদ্দূর গেস্লি? চায়ে সুড়ুৎ শব্দ ক'রে চুমুক দিয়ে জানতে চায় নকাকা।

এই মঠের দিকে। নতুন মহারাজ কি মোটা! হাবলা বলল। মিনে দেখলুম জ্যোতিষী হয়েছে?

কে? ন কাকা দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে। অ, পরেশ মালীর ব্যাটা। তোর সঙ্গেই তো পড়তো?

হ্যাঁ। লাস্ট বেঞ্চিতে চুপ করে বসে থাকতো। ঘরের বাইরে বোর্ড দেখলুম—জ্যোতিষ ভারতী। ক টাকা নেয় হাত দেখালে?

কি জানি! উদাস চোখে চা খায় নকাকা। পুজোর টাইমে বিজয়ার পরদিন শোলার মালা মুকুটের পয়সা চাইতে আসতো পরেশ মালী। তার ছেলে এখন জ্যোতিষী। দূর দূর থেকে লোক আসে। তবে সি পি এম নয় এই যা। ···হাত কাত দেখাস্‌নি যেন। হাঁসফাঁস করে নকাকা।

না না। হাবলা বলে ওঠে। তবে, বন্ধু বান্ধব তো। এমনি একদিন যাবো।

তা যাস্‌ না। সামাল দেয় পারুলপিসি। বৌমাকে নিয়েই যাস। ছেলের ব্যাভার তো খারাপ না। তোর যখন বন্ধু।

পাথর দেয়? মেজবৌ জানতে চাইছে। বিড় বিড় করে নকাকা—ওই করেই তো পাকা ঘর তুলে ফেললে! খালি বলবে এই খারাপ, তাই খারাপ—এটা পরো, ওটা পরো—খপরদার হাত দেখাবেনে!

ওপরে তো আলো নেই। কথা পাল্টায় হাবলা।

আমার তো এই একটাই আলো। ন কাকা নড়ে বসে না।

কিনেই আনি একটা। হাবলা উঠলো। চা খেলে সিগারেটও তো খেতে হবে।

সত্য বারুইয়ের দোকান থেকে নিবিনি। দাম বেশি। বলে দেয় নকাকা।

হাবলা উঠতেই পারুলপিসি ছোঁক ছোঁক করে—শাশুড়ির সঙ্গে কী হয়েছেল? হাবলা তো আমাদের ছেলে খারাপ নয়! কলকাতা ছেড়ে এ্যাদ্দুরে টিকতে পারবে তো? খিড়কির ঘাটে খুব শ্যাওলা—

পাতকো আচে তো। তোমার যেমন কতা! মুখ ঝামটা দেয় নকাকা।

চাবিটা কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় মেজবৌ। আমি ওপরে আছি।

দাঁড়াও। আলো দেখাই। তড়াক ক'রে উঠে এক হাত লম্বা টর্চটা নিয়ে আসে নকাকা।

আগেকার দিনের সরু সিঁড়ি। টর্চের জোরালো আলোয় ঝলমল করে

ওঠে ধুলো, মাকড়শার জাল। বাঁকের মুখে সরু জানালার ধারে কি একটা বসে আছে। 'বাবাগো'—বলে আঁতকে ওঠে মেজবৌ। ধুর—অত ভয়ের কি আছে! ও তো লক্ষ্মী প্যাঁচা! নকাকার খোনা গলাটা এখন কেমন পুরুষালি হয়ে ওঠে।

কতরকম গলা আছে নকাকার?

বিরাট দালান দোতলায়। সারি সারি তালা দেওয়া ঘর। বাঁদিকের কোনের ঘরে আলো জ্বলছে। ওটা বাবুয়াদের—শালারা চোর! ফ্যাঁস ফ্যাঁস ক'রে বলে নকাকা। চাবি দিয়ে বেরোবে সবসময়। তোমাদের ঘরের সামনেই বাথরুম আছে। বালতি করে জল তুলে দিতে বলবো'খন।

মোটা ভারী তালার মধ্যে চাবিটা ঢোকাতেই গাটা শিরশির করে উঠল মেজবৌয়ের। কি চাপ। আদ্যিকালের তালা।

তুমি পারবেনে। আমাকে দাও।

তীব্র আলোর টর্চটা নিবিয়ে দেয় নকাকা!

সারাজীবন কলকাতায় থেকে এ কোথায় এলাম! অন্ধকার ভুতুড়ে একটা বিশাল বাড়ির দোতলায় দাঁড়িয়ে একটা বন্ধ সাতপুরনো তালা খোলার ঘটাং শব্দ শুনলো মেজবৌ। ঘ্যার ঘ্যার করে দরজা খোলার আওয়াজ হল। কাঁটা দিয়ে উঠল সারা গায়ে।

তীব্র টর্চের আলো জ্বলে উঠল আবার।

এসো। নকাকা হিস হিস করে ডাকছে।

☐ অফিস বাসের প্যাসেঞ্জার

বাসে যারা এ্যান্দুর থেকে কলকাতা যায় তাদের বেশীর ভাগই কিন্তু সি পি এম নয়। অবশ্য তাদের অত টাইম নেই। দশ নম্বরের গোলমাল থাকে আন্দেক দিন। পেথম গেল মুখুজ্জেদের অশোক। কলকাতায় ইলেকটিকের দোকানে মিস্তিরির কাজ করে। শীলবাড়ির সামনে যেখানটা পিটুলি গাছ ছিল, সেখানে গাছটাকে উড়িয়ে দিয়ে চায়ের দোকান বসিয়েছে স্বকো। স্বকোর দোকানের সামনে তেমাথার মোড় থেকে ভুস করে ভেসে ওঠে মুখুজ্জেদের অশোক। কি হল? বলে হাঁকাড় পাড়ে। চা ছেঁকতে ছেঁকতে স্বকোদা সাড়া দেয়—এগিয়ে যাও। এগিয়ে যাও।

হাবলাকে দেখে একটু থমকায় অশোক। ফুটবল মাঠে বল নিয়ে তীরবেগে এগোলে এই হাবলাই তাকে আটকাতো। কিরে গেঁড়েব্যাটা? কবে এলি? একবার সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকা বৌকে মেপে নেয় হাবলা। গেরামের লোকের ভালোবাসা রাগ সবেতেই মুখখিস্তি একটু থাকেই। কিছু মনে করলে কোনো উপায় নেই। তুই এগোচ্চিস্ কোতায়? দশ নম্বর তো এখানেই থামবে। অশোককে বলে হাবলা। ধুত্তোর দশ নম্বর! অশোক এগিয়ে যায়। তড়ার মোড় থেকে নয় পাবো, নয়ের এ পাবো। চলি রে।

যথারীতি, বৌ মুষড়ে পড়েছে। নকাকাই বলল—না না, তড়ার মোড়ে গিয়ে কাজ নেই। দ্যাখো না, দশ নম্বর দেবে ঠিক।

নকাকার কথায় কাজ হল। হাবলা বললে হত কি?

তারপর এল নন্দরাম দত্ত। বাঁ বগলে ছাতা, কত বছরের পুরনো নন্দরাম নিজেও জানে না। ডানহাতে একটা কালো, সেও রঙচটা কালো, চামড়ার মাঝারি ফুল মাপের ব্যাগ; বোঝাই যায় ভেতরে টিফিন-বাক্স, খবরের কাগজ, এইসব আছে; গালবসা, বুকপকেটে চশমার খাপ—যাকে বলে ভেটেরান ডেলি প্যাসেঞ্জার বা নন্দর নিজের ভাষায় পাষণ্ড—প্যাসেঞ্জার নয়। এক লক্ষ উকিল মরলে একটি শকুন হয়। আর একলক্ষ শকুন মরলে একজন ডেলি পাষণ্ড হয়। প্যাসেঞ্জাররা কেউ ডেলি হয় না। প্যাসেঞ্জার আলাদা।

এঃ হে, বিজয়বসন্তবাবু যে! নকাকাকে দেখেই কেমন আঁৎকে উঠল নন্দরাম। সক্কালবেলা আপনার মুখ দেখতে হল! আজ যে বাসের টায়ার পাংচার হয়ে যাবে গো! আজ কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিলুম গো!

নকাকা অপ্রস্তুত মুখ করে হাসে। আমার মেজ বৌমা, হাবলার বৌ, সিঙ্গুর হাসপাতালের, ইয়ে, সিসটার!

নন্দরাম একটু ভির্মি খায়। আচ্ছা আচ্ছা। নমস্কার; নমস্কার।

আপনার সঙ্গে এই বাসে এখন থেকে যাবে।

লেডিজ সিট তো খালি পাবেন নে এখেন থেকে। রামহাটিতলায় অবিশ্যি বেশ কিছু নামে। সাজগোজ করা যুবতী দেখে বেশ ভদ্র হয়ে ওঠে নন্দরাম দত্ত।

আর যায় কেবুর ছোট মাসী।

কেবুও স্টপারে খেলতো। ছোট মাসীকে তখন চিনতো না হাবলা। চিনেছে এই নতুন করে থাকতে আসার পর।

ওমা, তুমি আমাদের হাবলার বৌ! হাবলা তো কেবুর খেলার সাথী ছিল। সেই কবে কলকাতা চলে গেল। আবার ফিরে এসেছো তোমরা!

কেবুর মাসীর চোখদুটো কেমন মড়ার মতন ঠাণ্ডা। কেবুর মাসী কলকাতায় কোথায় কাজ করে কেউ ঠিকঠাক জানে না।

ডালহৌসি পাড়ায় তাকে পরে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে হাবলা।

এক একদিন এক একজন লোকের সঙ্গে দেখেছে।

তা আর কি করা যাবে। ছ-টা দশের অফিস বাস তো আর কারুর বাপের কেনা বাস নয়। যাবে যখন, সাপও যাবে, ব্যাঙও যাবে।

বাস ছাড়ার পর জানলা দিয়ে হাত নাড়ল মেজবৌ, লুঙ্গি প'রে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ল হাবলাও।

বাসের সামনে কঁকর কোঁ কঁকর কোঁ করছিল কটা মুরগি। সুকোর পোষা। শনিবার শনিবার সন্ধেবেলা আট টাকা কোয়ার্টার প্লেট মানে এই তিন পিস দেয়।

'অলক্ষণ,' 'অলক্ষণ'—বলতে বলতে মুর্গিগুলোর দিকে ছুটে যায় নকাকা।

রান্নাঘর থেকে বাসের শব্দ পেয়ে কপালে হাত ঠেকায় পারুলপিসি। দুগ্‌গা দুগ্‌গা।

কলকাতার মানুষের মাথা গরম। আমাদের মেজবৌয়ের মাথা ঠিক রেখ মা শীতলা!

☐ দরজা দেওয়া পালঙ্ক

ঘরে ঢুকেই নাকে রুমাল চাপা দিয়েছিল মেজ-বৌ। ইঃ, আরশোলার গুয়ের গন্ধ—। হাজার হোক, কলকাতার মেয়ে তো।

নকাকা তো লোক দিয়ে ঘর পরিষ্কার করে দিয়েছে বলল। সান্ত্বনা দেয় হাবলা।

ছাই করেছে। কোমর বাঁধে মিনতি। ঠোঁট বেঁকিয়ে, ঠোঁট কামড়েও বলা যায়, ইতস্তত তাকায়, যেন মাপে, এই ঘর বাসযোগ্য করে তুলতে হলে ঠিক কোন দিক থেকে, কোনখান থেকে, কেমন করে শুরু করতে হবে। ঝাঁটপাট, সাজানো, পোষ্কার কোষ্কার। তা, পারে; মেয়েরা পারে। না-কে হ্যাঁ করতে যেমন পারে, দুর্গন্ধকে, সুগন্ধি দিয়ে ঢেকে দিতে; পা দেওয়া যায় না

যেখানে, ফুলশয্যা পাতার ব্যবস্থা নিখুঁত—এতো ভাই মেয়েরাই পারে। পেরে এসেছে চিরকাল।

রাণীবাজারের শীলবাড়ির হাবলা, ওরকে মধুসূদন শীল, ছোটবেলায় শুধু মধু, বড় হয়ে মধু শীল, নিজের ছোটকাকার সন্থ-খোলা অনেকদিনের বন্ধ ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে, নিজের বৌকে দেখে ; এই বৌ-কে সে কলকাতার ময়দানে দেখেছে বিয়ের আগে, ইডেন গার্ডেনে, আউটরাম ঘাটেও দেখেছে ; সে দেখা আলাদা। তখন সে ছিল মিনতি, মেজ-বৌ হয়নি তখনো। পি. জি. হাসপাতালের নার্সিং স্টুডেণ্ট। সন্ধেবেলায় ময়দানে বসে মধুকে বলতো, কি হল, কথা বলছো না ? মধু বলতো—কি কথা ? মিনতি বলতো—যাই হোক। কথা বলো। আমি তো শুনবো বলেছি !

ছোটকাকা চাকরি নিয়ে পুণা পালিয়েছে সেই কবে, পোড়ো এই শীল-বাড়ির মায়া কাটিয়ে, মধু তখন ছোট। ছুটির দুপুরে ছোটকাকার ফাঁকা ঘরে অসভ্য অসভ্য খেলা হত। মেজোকাকার মেয়েরা, হামলি আর কামলি —বেশি না, একটু একটু অসভ্য করবি, হ্যাঁ—বলে শুয়ে পড়তো চিৎপাৎ হয়ে! আর হাবলা—মানে এই মধু শীল—ঝাঁটার কাঠি ভেঙে, হামলির শরীরে ঢুকিয়ে দেখতো—হুঁ, জ্বর আছে! কাঠি গরম।

দেয়াল আলমারিটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল মিনতি। ঠিক ধরেছি ; গন্ধটা এখান থেকেই আসচে। কাঁচের পাল্লাটা টান মেরে খুলতেই ঝন ঝন কন কন শব্দ হল। হাবলা বলল—আস্তে। কি কচ্চো।

মাগো—বলে ততক্ষণে বসে পড়েছে মিনতি। এখন মেজ-বৌ।

তাক ভর্ত্তি আরশোলার নাদি। ম্যাগো। এই ঘরে—

সরো। আমি দেখচি। বৌকে অভয় দেয় হাবলা।

এই আলমারিতে অনেক চকচকে বই ছিল ছোটবেলায়। মৎ লিখিত সুসমাচার। যোহন লিখিত সুসমাচার। সেসব গেল কোথায় !

সুসমাচারের জায়গায় এখন এত আরশোলার নাদি। পরিষ্কার করতে গিয়ে ভয় পেয়ে যাচ্ছে হাবলা।

ছাড়ো। খুব হয়েছে। তুমি পারবে না। উঠে দাঁড়িয়েছে মেজ-বৌ।

অল্প মেজাজী ঠিকই, তবে বৌ ভারি কাজের মেয়ে। তাকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ায় হাবলা। হাল্কাভাবে মনে হয়, সি. পি. এম-কে এ ভাবেই জায়গা ছেড়ে দিয়েছে কংগ্রেস। কাজের কাজ করতে দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে।

দখলে রাখার ঝক্কি কম?

জানলার পাল্লাটা অর্ধেক ভাঙা, খবরের কাগজের গ্যাটিস দিয়ে বন্ধ করে রাখা আছে বহুকাল। এদিকে কাঁচের পাল্লা, ওপারে খড়খড়ি; সাবেক কালের খাট, তাই এখনও মোটামুটি আছে। জানলার পাল্লা খুলতেই ঠাণ্ডা একটা হাওয়া এল। মধুর মনে হল, ছেলেবেলার হাওয়া।

খবরের কাগজের মোড়কের মধ্যে ক'রে আরশোলার নাদির তোড়া মধুর সামনে এনে ধরল মিনতি। দেখেছ, কি ছিল?

অনেকদিন কেউ ছিল না তো। কী আর করা যাবে। সুসমাচারের কথা বৌকে বলে লাভ নেই। সবাই সবকিছু বোঝে না।

পালঙ্কের সোজাসুজি দেয়ালে ঝোলানো বিশাল আয়নাটার দিকে এতক্ষণে চোখ যায় মিনতির। ওমা, এযে সাংঘাতিক জিনিস। এ্যাতো ভালো মিরর! এই বাড়িতে।

মধু লক্ষ্য করে, আয়না নয়, মিরর বলছে মিনতি। এটা বোধহয় ঠিক সি. পি. এমের মত হল না।

খাটে শুয়ে দেখো। আয়নায় নিজেকে পুরোটা দেখা যাবে শুয়ে শুয়ে। ঘুম ভাঙলেই দেখতে পাবে তুমি দেয়ালের ভেতর থেকে উঠে বসছো। হাই তুলছো। আমরা ছোটবেলায় দেখতাম।

হাইতোলা? ধুর। বড়বেলায় অন্য জিনিস দেখতে হয়। বলতে বলতে মিনতি পালঙ্কের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়।

ওমা! এ কি গো। প্রথমে ভেবেছিলুম শুধু রেলিং দেওয়া। এখন দেখছি দরজাও আছে! এ যে দরজা দেওয়া পালঙ্ক!

এই বিস্ময়টারই অপেক্ষায় ছিল মধু। কলকাতার নার্সিং পাশ নিজের পায়ে নিজে দাড়ানো মেয়ে এ জিনিস যে কোথাও দেখেনি, মধু জানতো।

দরজাটা দু-হাত চওড়া; এক হাত উঁচু রেলিং থেকে কেটে বার করা। এ বাড়িতে শুধু এই একটাই দরজা যাতে কোনো ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ নেই। হাত দিলেই নি:শব্দে খুলে আসে।

রেলিঙের মাঝখানে মাঝখানে যে কাঠের কারুকাজ করা রুটি বেলার বেলুনের মতন হাতাগুলো আছে, সেগুলোকে হাত দিয়ে খরর খরর করে ঘোরানো যায়। মধু ঘুরিয়ে দেখালো।

কি সুন্দর! বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মিনতি।

তারপর একসময়, অস্ফুটে মিনতি বলল—ভাগ্যিস্।

ভাগ্যিস কি, সেটা আর বলল না।

মধু খু-উ-ব মন দিয়ে দেখল বৌকে। এই মুহূর্তে তাকে কি সি-পি-এম সি-পি-এম দেখাচ্ছে ?

না বোধহয়।

ক্যান্সারে মা মারা গেছে সেই কবে। আগেকার দিনের অনেক লোকের মতই রাজা থেকে ভিখিরি হয়ে যাওয়া লোক, ওর বাবা। একটাই শাড়ি রাত্তিরে কেচে, শুকিয়ে, সেটাই সকালে প'রে কলেজে যেতো মিনতি! নিজের পায়ে দাঁড়ানো কি এত সোজা ? শখ করে কেউ তো আর সি-পি-এম হয় না!

বৌকে দেখতে দেখতে মধুর মনে হল—এই মুহূর্তে সেসব কথা বোধহয় মনে নেই আর মিনতির।

পালঙ্কের দরজাটা সে খুলছে আর বন্ধ করছে। যেন বালিকা।

☐ চিলেকোঠায় লক্ষ্মীর পা

এখনকার ছ-তলা বাড়িও এত উঁচু হয় না। ছাতে উঠে হাল্কা চালে জানায় মিনতি।

ছাতের দরজার হুড়কো খুলতেই অনেকক্ষণ লাগলো। জিনিসটা প্রথমে বুঝতেই পারেনি মিনতি। দেয়ালের ভেতরে বেশ বড় সড় গর্ত দুপাশে, তার ভেতরে ঢোকানো মোটাসোটা হুড়কোটা যে খুলে বের করা যায়, ভাবতেই পারেনি। মধুকে টানাটানি করতে দেখে বেশ ঘাবড়ে গিয়েই বলে ফেলেছিল—কি করছো ? ওরাম করে ওটা খুলবে না। মধু কোন উত্তর দেয়নি। অনেকদিন কেউ না খোলাতে বেশ জাম লেগেছিল হুড়কোতে। ছাতে ওঠার আর দরকার কার ? বাবুয়ার কারবার তো আটচালায়। নকাকার সংসার তো নিচে। জাতশত্রু বাবুয়ারা দোতলায় থাকে বলে নকাকার ওপরে ওঠার প্রশ্নই আসে না। মধুরা আসার পর দোতলায় ছোটকাকার ঘরের তালা খুলতে একবার যা উঠেছিল ; তাছাড়া এমনি তো দরকারই পড়ে না। টানাটানি করে হুড়কো খুলতে তাই সময় লাগলো।

দরজা খুলে নিচের ছাতে পা দিয়েই মিনতি বলল—এ কেমন ধারা খিল ? এত মোটা।

মধু বলে—খিল নয়, একে বলে হুড়কো।

ছাতে সবসময় হাওয়া। খোলা হাওয়ায় ঘুরতে ঘুরতে মিনতি বলল—কি বিচ্ছিরি সব কথা। হুড়কো।

মধু বলে—কেন? পোঁদে হুড়কো দিয়ে দোব, বলে, শোনোনি?

এক ধারের পাঁচিলে বড় সড় ফণিমনসা গাছ দেখে মিনতি দাঁড়ায়। এটা এখানে কেন?

বাজ পড়লে আটকাবে। বিজ্ঞের মত বলে মধু।

তোমাদের বাড়িটাই কি এ গ্রামের সবচে উঁচু বাড়ি?

মিনতির প্রশ্ন শুনে ওপরের ছাতের মাঝখানের পৈঠায় বসে পড়ে মধু। কেন? সবচে উঁচু না হলে তোমার কোন অসুবিধে আছে?

খিড়কি পুকুরের দিকে তাল পড়ল। আমড়া গাছটায় ঠক্‌ঠক্ করছে একটা চোরা কাঠ-ঠোকরা। ছোটবেলায় ঠাকুমা বলতো, কোনকিছু পেতে গেলে তার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়, ধ্যান করতে হয়, কষ্ট করতে হয়, চেষ্টার পর চেষ্টা করতে হয়। দেখিস্ না। কাঠঠোকরা ঠক্ ঠক্ করে আর বলে—অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর—

এইরাম সিঁড়ি দিয়ে এক ছাত থেকে অন্য ছাতে যাওয়া যায়, এরাম কোথাও দেখিনি বাবা।

ওপরের ছাতে উঠতে উঠতে বক বক করে মিনতি।

অনেক কিছুই দেখোনি। কলকাতার গলির ভেতর জীবন কাটালে কত আর দেখা যায়। পরের কথাটা অবশ্য বলে না মধু।

ও মা, ছাতের মাঝখান দিয়ে আবার পাঁচিল কেন। ছাতও কি ভাগ হয়েছে নাকি?

ভাগাভাগির ব্যাপার তো বেশ বোঝ।

ওমা, মেয়েমানুষ—ভাগ বুঝবো না। পাঁচিলে বুক দিয়ে ঝুঁকে পড়ে মিনতি। ওদিকের ওই আটচালাটা কি?

হাটতলা। শনি মঙ্গলবারে হাট বসে।

তাই নাকি? এমনি দিনে বাজার থাকে না?

থাকে, কম।

ওই যে একটা বড় মতন মাঠ দেখা যাচ্ছে ওদিকে—

ওটা এগারো বিঘের জলা। এক কালে এ সব আমাদের ছিল—

এখন ?

পাবলিকের। সি পি এমের জমানা !

সি-পি-এম কি পি-এম শুনতে চাইছে না এখন মিনতি।

তুমি এখান থেকে চলে গেলে কবে ?

স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে। এদিকে তো কলেজ ভালো নেই। এসব কথা তো অনেকবার শুনেছো ! চলো, চিলেকোঠার ভেতর দিকে যাই।

চিলেকোঠা ? দিগন্তের দিক থেকে চোখ ফেরায় মিনতি।

ছাতের দরজাটা খোলবার সময় বাঁদিকের ঘরটা লক্ষ্য করোনি ?

না তো।

চলো দেখবে। মধু ওপরের ছাত থেকে নেমে আসে।

ছাতে বেশ হাওয়া। রাত্তিরে মাতুর বালিশ এনে শোব। মিনতি বলে।

মধু জানায়—বেশি রাতের দিকে ঠাণ্ডা লাগবে।

তখন চিলেকোঠার ঘরে ঢুকে যাবো।

চিলেকোঠার ঘরে দুদিকে দুটো জানলা। একটা ছাতের দিকে। একটা রাস্তার দিকে। দুটো জানলাই মুখোমুখি। তাতে হাওয়া খেলে ভালো।

বাঃ, চমৎকার। এ ঘরটা তোমাদের বাড়ির মধ্যে সবচে ভালো। ছোট খাটো চাপা ঘরটা দেখে বেশ খুলে যায় মিনতি।

মেঝের তলাটা ফাঁকা, জানো তো ? মধু বলে। অনেক জিনিস রাখা যায়। ছাতের লেয়ার থেকে ঘরের মেঝেটা অনেক উঁচু, খেয়াল করেছ ?

না বললে বুঝতে পারতাম না। মিনতি স্বীকার করে। সাধারণতঃ যা করে না সে। তারপর আবার ভেঙে পড়ে উচ্ছলতায়—ও মা, এখানেও যে সিঁড়ি ; ঘরের মধ্যে ঘর ! ওপরের এই ছোট্ট ঘরটা—ও, ঠাকুরঘর। দেয়ালে এত লক্ষ্মীর পা আঁকা—

আঁকা নয়। বলতে গিয়েও বলে না মধু। বলতে পারে না। কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মী আসে এই ঘরে। ঠাকুমা নাকি দেখেছিল একবার। নতুন বৌ হয়ে যখন প্রথম আসে। মিনতি সেসব দেখার দাম দেবে না। বলে লাভ নেই।

সি পি এম হলে সব জিনিস দেখা যায় না। তার জন্যে আলাদা চোখ চাই ! মন চাই।

লক্ষ্মীর পাগুলো যে এঁকেছে তার বেশ আঁকার হাত ভালো। রাস্তার

দিকের জানালার ধারে বসে মিনতির স্বগতোক্তি।

তার বেশী আর কী বুঝবে?

কথা হজম করতে করতে জিভ তেতো হয়ে গেল মধুর।

☐ ঠাকুমার না-খোলা সিন্দুক

রবিবার ছিল। দুজনেরই ছুটি। পারুলপিসিকে রান্নায় হেল্প করতে তো পারো—বৌকে বোঝাচ্ছিল মধু।

খুব ক'রে না সাধলে, অন্যের অধিকারের জায়গায় হাত বাড়াতে নেই। দেয়াল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, কাপড় চোপড় ঠিক ঠাক করতে করতে উত্তর দিল মিনতি।

এসব সি পি এম মার্কা কথাবার্তা কোনদিন পছন্দ হয় না মধুর। তা কি আর করা যাবে। বিয়ে ক'রে ফেললে অনেক কিছু স'য়ে নিতে হয় জীবনে।

নকাকা দুধ আনতে গেছে কোথায়। ভাইপো আর ভাইপোবৌ নিয়ে অবিবাহিত, দাতা, কঞ্জুষ বিজয়বসন্তর নতুন সংসার। সব হিসেব অবশ্য পেন্সিল দিয়ে ক্যালেণ্ডারে লিখে রাখে। মাস পয়লায় টোটাল করে মিটিয়ে দেয় মিনতি। কারও করুণা কিংবা অনুদান নেবার মেয়ে তো নয়।

হাবলা—চা হয়ে গেছে। তলা থেকে হাঁকাড় পাড়ছে নকাকা।

চলো চলো। ওরা কখন উঠে গেছে। তুমি এখনও গড়াচ্ছো। তাড়া দেয় মিনতি।

গ্রামদেশে এই এক ঝামেলা। বেলা ওব্দি ঘুমোবার কোনো জো নেই। আলো ফুটতে না ফুটতেই এত পাখি ডাকে। বরানগর হলে নটার আগে বিছানা ছাড়ার কোনো কোশ্চেন ছিল না।

ওটা এত বড় কেন?

চলনের এক ধারে রাখা, উঁচু, একটু বেদীমতন সিমেণ্টের জমানো থাকের ওপরে—একটা ভারী মোটা সিন্দুক। কত বড় তালা—বাব্বা।

মেজবৌয়ের এ কথার জবাব পারুলপিসি ছাড়া আর কে দেবে। ওসব হাবলার ঠাকুমার জিনিস। কত্তারা কলকাতায় কাজে যেতো। রাতদুপুরে ঘরময় গয়না ছড়িয়ে খেলা করতো বুড়ি। ভয় কাটাতো।

যেন শুনেও শুনতে পায় না মিনতি। এতবড় সিন্দুক আমি জীবনে দেখিনি। কত বড় তালা!

ও তালা আজ বিশ পঁচিশ বছর ধরে কেউ খুলতেও পারে না। যেন রূপকথা বলছে পারুলপিসি। বুড়িও মরলো, তালাও হারালো। গোলা থেকে ধান চুরি করে বেচে দিয়ে তীর্থ করতো। দু-হপ্তা কত্তা না ফিরলে একা একা লোককে জিগ্যেস ক'রে ক'রে কলকাতা চলে যেতো বুড়ি। তা জানো?

কিছুই জানে না মিনতি। জানতে চায়ও না।

সিন্দুকটার গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখে আর বলে—ভেতরে কী আছে?

কি আবার থাকবে!

খোনা গলায় কথা বলে ওঠে নকাকা।

এই হল কংগ্রেসের দোষ। মনে মনে নিজেকে বোঝায় হাবলা। নিজেদের কি আছে নিজেই জানে না।

চাবিটা কি সত্যি সত্যি হারিয়ে গেছে? নকাকার দিকে তাকিয়ে জানতে চায় মিনতি।

থাকলেও কি খুলতো!

এ উত্তর পারুলপিসির। চাবি থাকতেও কত কি যে খোলে না, তাতো সে-ই জানে।

☐ মেঘের রাজ্যে হনিমুন

এ গ্রামে সেলুন দুটো। নাপিতও সাকুল্যে ওই দুজনই। একজনের নাম গুয়ে, আর একজনের নাম মুচি। নাপিতের নাম মুচি হয় কেন? সে আসলে গুয়ের ভাইপো। কাকার কাছে কাজ শিখে এখন দোকান করেছে আলাদা। গুয়ের দোকানে যায় বুড়োরা। ছেলে ছোকারারা ভিড় লাগায় মুচির কাছে। গুয়েদার সব ছাঁট একরকম। মুচির কাছে কত ভ্যারাইটি। যেমন চুল তেমন ছাঁট।

এ গ্রামে দর্জির দোকান একটাই। পরশ্রী টেলার্স। অঙ্কের ক্লাসে গুঁফো অবনী মাস্টারের ল্যাজওলা ছবি এঁকে এমন পেটাই খেয়েছিল সনাতন ভড়ের ছেলে অনন্ত ভড়—ইস্কুল যাওয়া ছেড়ে, হরিপাল থেকে কাজ শিখে এসে, বাজারে

বাপের কাপড়ের দোকানের পাশে টেলারিং খুলেছে—পরশ্রী টেলার্স। কলকাতার ডিজাইনে জামাপ্যাণ্ট করে দোব মধুদা—পয়সা কিন্তু এখানকার রেটেই নোব। একদিন বলছিল।

গুয়ের দোকানে বুড়োদের ভিড় দেখে মুচির কাছে চুল কাটতে গেল মধু। ছেলেছোকরাদের অনেকেই আজকাল বাইক চাপে। রাণীবাজার আর আগের মতন নেই। আমতলায় দিলীপের সাবের দোকানের ম্যানেজার ছিল উদয়। আজকাল নিজেই ভিডিও পার্লার খুলেছে। দোকানে ঢুকেই বলল—বসতে পারবো না মুচে; দাড়িটা একটু সাইজ করে দে চটপট। বিকেলে বিডিও অফিস থেকে লোক আসবে।

যারা বসেছিল তারা কেউ আপত্তি করল না। অথচ আগেরটা হয়ে যেতে একজন 'একটু তাড়া আছে' বলে উঠে, এগিয়ে যাচ্ছিল আয়নার সামনের চেয়ারের দিকে। তাতেই সবাই মিলে কি প্যাক। এ গ্রামে আগের মতন কিল্ড করতে গেলে এখন আবার নতুন ক'রে খাটতে হবে। জমিদার বাড়ির ছেলে তো কি। ছেড়ে চলে গেলে কোনো জায়গাই নিজের থাকে না। ছিটেবেড়ার সেলুনঘরে বসে মধু ভাবছিল। এই মুচির দাদু বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ করে আসতো। তা ও পয়সা চাইতে আসতো হপ্তায় হপ্তায়। তখন তো সাতবার না ঘুরিয়ে পয়সা দিয়ে দিলে ইজ্জৎ থাকতো না। কংগ্রেস জমানা কি শেষ হয়ে গেছে এমনি!

উদয়ের চাপদাড়ি ড্রেস করতে টাইম লাগল। ইতিমধ্যে একজন বলেছে-প্রেম প্রতিজ্ঞা কবে আনছো উদোদা? আর একজন বলেছে—বিনোদ খান্নার দয়াবান! বাংলার মাস্টার অজা মিস্তিরের ছেলে বলল—মা বলছিল উত্তম কুমারের বই অনেকদিন আনো না!

উদয় উঠতে না উঠতেই ভট্‌ভট্ করে মোটর বাইক থেকে নামল শান্তনু। পঞ্চায়েত প্রধানের ছোট ভাই। প্রধান হওয়ার পরই নিজের বৌকে তাড়িয়েছে। বিধবা বড় বৌদিকে নিয়ে থাকে দাদা। শান্তনুর পোয়াবারো। যাকে যা খুশি বলে।

হেলমেটটা খুলে রাখতে রাখতে বলে—চট্ করে একটু চুলটা ছেঁটে দে তো মুচে। উড়ে বাজারে ডিস্টিক কমিটির মিটিং আছে। দেরী হয়ে যাবে।

মধু দেখে, এবারেও কেউ আপত্তি করে না। সি পি এম লীডারের ভাই। কথা বলবে কে। হঠাৎ যদি একঘরে হয়ে যায়।

একটা বিড়ি ধরিয়ে উঠে দাঁড়াল মধু। দোকান বন্ধ করে একবার বাড়িতে আসিস মুচে। চুলটা কাটার ইচ্ছে ছিল।

প্রায় রাজা মহারাজের মত ঘাড়টা ঘোরালো শান্তনু। ভুরু টুরু কুঁচকে সরু চোখে তাকালো। তারপর—অ, শীলবাড়ির মধুদা। তুমি ফিরে এসেচো আমি শুনেচি। কাজে কম্মে থাকি—দেখা করা হয়নি। যাক, দেখা হয়ে ভালোই হল। মাগভাতারে রোজগার করছো—এ্যাদ্দিন পরে ঘরের ছেলে ঘরে এলে, এবার একদিন আমাদের ডেকে পার্টি দাও—।

পরে আসিস একদিন। এখন অন্য কাজ আছে। বলে বেরিয়ে আসছিল মধু। এই প্রথম কথা বলল মুচি—একটুক বসলে পারতে মধুদা।

বসতেই হল।

তোমাদের বাড়ি পুজোর সময় জলসা হয়েছিল একবার, মনে আছে? অনেক রাত ওব্দি গান হয়েছিল। আমাদের এখানে তো এণ্টারটেনমেণ্ট কিছু তেমন নেই। তুমি যখন এসে গেছো, সামনের বছর পুজোর টাইমে কিছু একটা লাগাও না?

দেখি। নিজের ওজন ফিরে পেয়ে মধু সংক্ষিপ্ত।

সুযোগ বুঝে গোলোক বলে—তুই আবার গানের সমঝদার হলি কবে শান্তনু?

পার্টি করি বলে গানও বুঝি না ভাবিস নাকি!

কে কত গানের সমঝদার তাই নিয়ে ঝগড়াই বেঁধে গেল। মাঝখান থেকে মুচি বলল—এত ঘাড় ঘোরালে ছাট খারাপ হয়ে যাবে বললুম কিন্তু।

শান্তনু 'একদিন যাবো, হ্যাঁ? বলে বেরিয়ে বাইকে স্টার্ট দিল। আওয়াজটা একটু দূরে যেতেই গোলোক বলল—শান্তনু যাবে মানে চাঁদা চাইবে মধুদা। কেয়ারফুল থেকো।

এসব কথা রাত্রে মাদুর বালিশ নিয়ে ছাতে শুয়ে বেমালুম ভুলে যায় মধু। সারাদিনের হিসাব, অসহ্য কষ্ট, কিছুই মনে থাকে না। ঝক্কর দশ নম্বর বাসে হরিপাল। সেখান থেকে সোয়া এক ঘণ্টা ট্রেনে হাওড়া। তারপর লঞ্চে গঙ্গা পেরিয়ে ডালহৌসি। অফিস। তারপর ফেরা। রাত নটায় ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ি ফেরার সময় কোথা থেকে এত এনার্জি আসে মধু জানে না। পারুলপিসির রান্নার হাত তেমন সুবিধের নয়। তরকারিগুলো কেমন কালো হয়ে যায়। মুখ বুজে তাই খেয়ে নিয়ে সোজা ছাতে। একটা সিগারেট শেষ

হতে না হতেই বগলে মাদুর নিয়ে চলে আসে মিনতি। তারপর তো মেঘের রাজ্য— ।

ছেলেদের মত বুকের ওপর উঠে বৌ বলে—তোমার বন্ধু জ্যোতিষ-ভারতীর কাছে হাত দেখিয়েছি। পারুলপিসিকে নিয়ে গেস্‌লাম। বলে কি—আপনি আমাদের মধু শীলের ওয়াইফ তো ? চিনি। আপনার কথা এ গ্রামের সবাই বলাবলি করে !

মধু কিছু শুনতে পায় না। ছেলেবেলার এই ছাতে এখন বুকের ওপরে মিনতি—তার চুলের পাশ দিয়ে মেঘ চলে যাচ্ছে কোথায়। চাঁদের আলোয় কোনো সি পি এম অরাজকতা নেই। কোথায় কার বর্গা হল, কে কার মা বাবা। ইতিহাস হয়ে যাওয়া এই পোড়োবাড়িতে একদিন ঘুরে বেড়াবে কয়েকটা কঙ্কাল। তাতে কি।

খোলা হাওয়ার উড়ে যাওয়া মেঘেদের নিচে মিনতির চুল চোখ প্রাণের রাজ্যে আমার অবাধ রাজত্ব তো ঠিক আছে।

পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদের মত ফুটে আছে নক্ষত্র। যেন হাত বাড়িয়ে ধরা যাবে।

□ সব কথার শেষ কথা

তুমি আর আগের মতন আবৃত্তি করো না মধুদা ?

সেই ভজা নাপতের ছেলে সাগর। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় দু-পয়সা করেছে। লাস্ট বাসে প্যাসেঞ্জার কম। পাশের সিটটা খালি দেখে এসে বসলো।

কোথায় গেসলি ?

তাগাদায়। তোমার সেই আবৃত্তি এখনও আমার কানে বাজে। ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে, তারা বলে গেল—ক্ষমা করো সবে—ও তোমার মতন আমি কিছুতেই পারবো না। তুমি নাম দিলে আর কেউ তো ফার্স্ট হবার কথা ভাবতেও পারতো না।

সাগরও মোটর বাইক কিনেছে। শুধু আমার দ্বারাই কিছু হল না। ভাবতে ভাবতে বাস থেকে নামতেই নকাকা।

তোর এত দেরী হল ? খ্যানখেনে গলায় জানতে চায় নকাকা। আগের বাসেই তো আসিস।

কোনদিন তো জানতে চায় না। আজ হল কি?

ট্রেনের খুব গোলমাল। হাওড়া ষ্টেশনে একঘণ্টা দাঁড়িয়ে। কোথায় তার ছিঁড়েছে না কি। এ লাইনে তো মেঘ ডাকলেই তার ছেঁড়ে।

সিং-দরোজার কাছে দুদিকে দুটো সিমেন্টের বেঞ্চ করা। বাঁদিকেরটা দেয়ালঘেঁষা, পায়রার গু ভর্তি। ডানদিকেরটা একটু যা পরিষ্কার। সেখানে বসে নকাকা বলল—বোস একটু। তোর সঙ্গে কথা আছে।

ব্যাপার কি? নকাকা বলছে কথা আছে। এমনিতে দেশে হঠাৎ এলে 'কেমন আছো' শুনে যে কোনো উত্তর দেয় না; 'বোসো না, একটু কথা বলি' বললে একদিন বলেছিল—কথা আবার কী? সে বলছে কথা আছে। হা-ক্লান্ত শরীরে ধপ্ করে শুকনো পায়রার গুয়ের ওপরেই বসে পড়ে হাবলা। কি এমন কথা যে বাস থেকে নামতে না নামতেই বাইরে বসিয়ে বলতে হবে?

হেলান দিয়ে পা তুলে বসে নকাকা। পঁক পঁক করে কয়েকবার পাদে। বেশ দুর্গন্ধ। তারপর বলে—নিজে সংসার না পাতলে তোর বৌ কোনদিন কাজ শিখবে না। ই-য়ে, মানে, তোর পিসির তো বয়স কমচে নে, বাড়চে।

অ, এই কথা। তার মানে চলে যেতে হবে। হনিমুন পিরিয়ড ওভার। বরানগরে ছিল শাশুড়ি-বৌয়ের ঝামালি। এখানে কোনো নতুন গণ্ডগোল—।

তোমার কোনো অসুবিধে—

না-না, আমার আবার অসুবিধে কি। ব্যাচিলার লোক। তোরা থাকতে ভালোই লাগছিল।

হঠাৎ?

তোদের জন্যেই বলছি। মুচির কাছে চুল কেটেছিস তো? পয়সা দিয়ে দিয়েছি। বাজারে কোথাও কিছু বাকি নেই। সব হিসেব লেখা আছে। বৌমা তো মেয়ে ভালো। তোর মাথাও তো আজকাল ঠিক থাকে। বিয়ে করিচিস, সংসার পাততে হবে না? একটা বঁটি আমার বেশী আছে। সঙ্গে দিয়ে দোব। চাল কেনার থলেও দোব'খন একটা। ক্যালেণ্ডারও নিতে পারিস। বাংলা ইংরিজি দুরকম যেটা আছে সেটা নয়। শুধু ইংরিজি একটা আচে। সেটাই নিস নাহয়। তোদের তো বাংলা লাগে না?

বৌমাকে বলেছো?

বৌমাই তো তোর পিসিকে বলেচে—এ্যান্দুর থেকে যাতায়াত, হরিপালে ঘর দেখচে।

ওহ। তার মানে পারুলপিসিই মিনতিকে বলেছে। কথাটা অবশ্য বলে না মধু।

ঠিক আছে। ঘর পেলে তো। চলো। মধু উঠে পড়ে। খিদে পাচ্ছে খুব।

ঘর পাবিনি কেন? কতো লোক পাচ্চে।

খোনা গলা বেশ পুরুষালি শোনায় হঠাৎ। কতরকম গলাই যে থাকে মানুষের।

খেয়ে নিয়ে ছাতে উঠে পাচিলে পা ঝুলিয়ে ব'সে সিগারেট টানে মধু।

পড়ে যেও না যেন।

মিনতি হাঁটুমুড়ে বসে আছে।

এ ঠেকটাও গেল। কথা বাড়ায় না মধু। একটা পুজো কাটিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল। শুধু পুজোয় সময় বাড়িটা জেগে ওঠে, জানো? টেম্পোরারি লাইন টানা হয় ইলেকট্রিকের। আলোয় ঝলমল করে। নিচের আটচালা থেকে সবসময় ঢাকের শব্দ। নবমীর রাত্তিরে জলসা। এলাহি ব্যাপার। তখন আর পোড়োবাড়ি বলে মনেই হবে না।

আসবো আমরা বেড়াতে। উদাসীন স্বরে বলে মিনতি।

থেকে গেলেও তো হতো! আমাদের ভাগেও দু-চারটে ঘর আছে এখনও। যাকে বলে চাবি আনিয়ে—।

সম্পর্ক ভালো রাখতে গেলে ঠিক সময় দূরে সরে যেতে হয়। বোঝো না কেন? জোর করে ঘাড়ে চেপে থাকলে কেউ তোমায় খাতির করবে?

মিনতি কি প্রাজ্ঞ! নিজেকে নাবালক মনে হয় মধুর।

ঘন শ্যামবাজার

জীবনে, অনেকরকম হল। মরা ধানক্ষেতে ফুটবল খেলতে গিয়ে ধানের গোড়া যে খেলার কতখানি বাধা হতে পারে, জানা হল। সত্যি কথা স্বীকার করার যে কি শাস্তি, সে তো আগেই জেনেছি। কলকাতায় যাবার আগে, পাগলাগারদে যেতে হল। খুপরি ঘরওলা সেই নার্সিং হোম অবশ্য কলকাতাতেই। সেখানে, ইলেকট্রিক শক দেবার সময়-সীমা বাড়িয়ে দিয়ে, মানুষ খুনের ব্যবস্থা ছিল। দু:খের বিষয়—কেউ খুন করেনি আমাকে। জানলার কাঁচে ঘুষি চালিয়ে বাঁ হাতের ব্রেকিয়াল আর্টারি কেটে ফেলার পরেও, আমাকে বাঁচানো হয়েছে। হাসপাতালে দৈত্যের মত চেহারার একটা লোক আমাকে দুধ দিয়ে যেত; এক বিশাল কাঁচের গ্লাসে, শাদা, গরম দুধ। তারপর, পারিবারিক ভাঙনের ঢল বেয়ে, খারাপ পাড়ার ভেতরের গেরস্থের গলিতে, অল্প ভাড়ার একটি মাত্র ঘরে, আমরা থেকেছি অনেকদিন। তখন, মন খারাপের দিনে—আমরা মাতাল ধরে পেঁদাতাম। তাতে, সময় কেটে যেত বেশ। রাত্রে, ছাদে শুয়ে শুনতে পেতাম বেশ্যাদের হাসি, হারমোনিয়াম, ঘুঙুরের শব্দ। এক বন্ধুর বাড়ির ছাদ থেকে দেখতাম বেশ্যাদের স্নান করা, হুড়োহুড়ি; খিস্তি ও স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য। তখন, যুবক হয়েছি।

তারপর, যে কোনো যুবকই যা চায়, আমিও, তাই চেয়েছিলাম; অর্থাৎ—আমার জীবনে, একটু, প্রেম হোক। সজীব উন্মাদ প্রাণবন্ত; উচ্ছল তরঙ্গময় অবাধ; গভীর আপেক্ষিক অশান্ত; এক প্রেম। হায়, তা হল না। পরিবর্তে, মাংসের গুহাপথে মৃত্যুর অভিষেক হল; যা, মনে হল—জীবনের চেয়ে বেশী আকর্ষণীয়। চিরন্তনের চেয়ে তাৎক্ষণিকের মূল্যই যে অধিক; কোনো ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তের জ্যামিতি যে অনেক দীর্ঘস্থায়ী পরিমিতির আততায়ী—তখন জানলাম।

এক পরাক্রমশালী মস্তানকে, একদিন তার অসহায় অবস্থায় যৎসামান্য সাহায্য করার কৃতজ্ঞতা হেতু, সে আমাকে মধ্যরাতে তার রক্ষিতার কাছে নিয়ে যেতে চায়। ঘুমন্ত মাঝিকে সে, ঘুম থেকে তোলে এবং নৌকা বাইতে প্রায় বাধ্য করে। গঙ্গার ওপারে শালকের এক একতলা বাড়ির ছাদে অনেক আধাঘুমন্ত মানুষের মধ্যে মই বেয়ে উঠে সে হারিয়ে যায়; কিন্তু আমার, সে রাত্রের, ঘুম ভাঙা নৌকোয় চিৎ হয়ে শুয়ে তারা ভরা আকাশের দোলাচল—যেরকম লেগে-ছিল; বুঝতে পারি—দ্বিতীয়বার আর সেরকম লাগবে না কখনো। সকাল বেলার আলুপটল-তেলাপিয়া-পুঁইশাক থেকে রাত্রের ক্ষোভ ও পরিকল্পনাময় পরিব্যাপ্ত যে জীবন; তার কাছে আর যাওয়া হল না আমার। যে কাছে এল, সে—অভিশপ্ত নক্ষত্রের সকরুন মিটমিটে চেয়ে থাকা; মধ্যরাতের হাওয়ার ঠাণ্ডা, কনকনে হাসি; প্রতিমার মাটি ধুয়ে ফেলে কাঠামোকে জাগিয়ে তোলে ভাসিয়ে নিয়ে যায় যে জল, তার অতিথিবৎসলতা। চেতনার মধ্যেকার সেই নিষ্ঠুর হত্যাকারী আমাকে জাগিয়ে রেখেছে দীর্ঘকাল। একটানা জেগে থাকার সেই অপরিমিত অত্যাচারে—আমি দ্বিতীয়বার পাগল হয়ে গেলাম।

তাতে কারো কোনো ক্ষতি হয়নি। মেশোমশাইয়ের কিছু অর্থব্যয় হয়েছে কেবল। খুব মোটা মানুষ ডাক্তার সেন। ধমক দিয়ে বললেন—আর না। তৃতীয়বার যেন তোমার মুখ না দেখি। এক বাল্যবন্ধু জ্যোতিষী হয়েছে ততোদিনে। দুটো পাথর আঙুলে গলিয়ে দিয়ে বলল—জীবনের গভীরে যাবি না। কি দরকার?

তখন, সারাদিন টাইপ করি। নিতাইবাবু, মালিক, কাজে না গেলে গাড়ি পাঠিয়ে তুলে নিয়ে যেতেন; মাইনে ষাট টাকা প্লাস দুপুরের ভাত; সকাল-বিকেল চা; মালিক বলতেন—ও পাড়ায় থাকিস ক্যান্? আমার বাড়িতে থাক! খাবি দাবি কাজ করবি। শরীলটা এত দুর্ব্বল ক্যান্ তোর? ছেলেদের পড়াবি সকাল সন্ধে; দুপুরে অফিসের কাজ করবি—বুইচস্? অফিসটা ছিল বাড়ি সংলগ্ন। অর্থাৎ নিশ্চিন্ত ভাতের দামে সারাদিন সারাজীবন শুধু টাইপ!

চাকরিটা, ছেড়ে দিতে হল। আমাকে ভালো হয়ে যেতে বলতেন এক পাতানো পিসিমা। তিনি এসে আমাকে নিয়ে গেলেন। বললেন: অনার্স পেতে হবে কিন্তু। তোকে আমি হারিয়ে যেতে দেব না।

পিসিমা, রোজ দুটাকা দিত। আমি ছাড়া তার আর কেউ ছিল না।

একমাত্র ছেলে দুর্ঘটনায় মারা গেছে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। পিসেমশাইয়ের ক্যানসার হয়েছিল।

মাজুম খেলে মাথায় জলতরঙ্গের শব্দ হয়। সে বাজনা খুব অভিমানী। চেনা লোককেও চেনা যায় না। একদিন মাঝরাতে মনে হল, পিসিমার শরীর থেকে ঘুঙুরের শব্দ আসছে। পরে, পুড়ে যাবার পর মোমবাতির পায়ের কাছে যেমন পড়ে থাকে মোম, এলোমেলো, রোজ আমাকে শুনতে হত তাঁর অনুতপ্ত ফোঁপানি; কপালে লেগে থাকতো দীর্ঘ ও স্থির চুম্বন; দম, বন্ধ হয়ে আসতো। কি অন্তিম, কি জীবন্ত, কি বিরক্তিকর সেই কান্না। মনে হত, বোধহয় প্রেম হচ্ছে।

যা হল, তা যেন আর কারও না হয়। মনে হল, সব নারীই তাহলে, হয়তো দ্বিচারিণী, চাইলে বা লেগে থাকলে সবই পাওয়া যেতে পারে। এ যে কি ক্ষতি! কাউকেই শ্রদ্ধা করতে পারি না; কিছুই সহজ সুন্দর মনে হয় না আর। ফিরিয়ে আনতে চেয়ে তিনি আমাকে এ কোথায় নিয়ে এলেন?

বাঁচিয়ে দিল বরানগর। দাদা চাকরি পাওয়াতে সবাই বরানগরে চলে এলাম। জানলাম—শ্যামবাজার পার হয়েও, যাওয়া যায়। এতদিন, ওদিকে ধর্মতলা আর এদিকে শ্যামবাজার, এই ছিল পৃথিবীর পরিধি। দেখলাম—শ্যামবাজারের এ পারে, বাসরাস্তা, লোকজন, ঘরবাড়ি—সবকিছুরই চেহারা ও প্রকৃতি আলাদা। মানুষের জীবনে, পরিশ্রমের একটা অন্য মূল্য ও ভূমিকা আছে।

সে বাড়িতে, বাড়িওয়ালার কোনো ভূমিকা ছিল না। সবই বাড়িউলি। তাঁর কাছে, পাড়ার মস্তানদের আড্ডা হত। তিন মেয়ের দুজন দুই মস্তানের হাত ধরে চলে গেল। সে অবশ্য, অনেক পরে। তার আগে, প্রথমদিকে, বাড়িউলির গোলমেলে বড় ছেলের স্বগত সংলাপ শুনতে হত সারারাত। আমরা থাকতাম নিচে। রাত হলেই ওপরের বারান্দা থেকে ভেসে আসত তার দরাজ গলা: মাস্টারমশাই, আপনার কথামত, আমি জীবন কাটাতে পারলাম না। ভেবে দেখলাম, আপনি যা বলেছেন সব ভুল!…অথচ সারাদিন সে ভালো থাকতো বেশ। তাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম, আমাকে দেখে শেখো। ওষুধ খাও, সব সেরে যাবে। পাগলামি আজকাল আমাশার মতন হয়ে গেছে।…

শেষদিকে, সে কেমন রাগত ভাবে তাকিয়ে থাকতো আমার দিকে। কিছু বলতো না।

তা, সুস্থ মানুষদের চে, পাগলদের ওপর আমার সহানুভূতি বেশী, নিজে বার দুয়েক পাগল হয়ে গিয়েছিলাম বলেই হয়তো। দ্বিতীয় বার নার্সিং হোম থেকে বেরিয়ে দেখলাম—নেশাটা, আর চলবে না। চাকরি পাবার সম্ভাবনা আছে। সামাজিক হয়ে উঠতে পারলে, 'সুস্থ ও স্বাভাবিক' জীবনযাপন করে যারা, তাদের, অনেক রগড় দেখা যাবে! তাছাড়া, ঘোষণা না করেও তো নিজের ভেতর নিজের ইচ্ছে মতো থাকা যায়।

ছাড়বো বললেই তো আর ছাড়া যায় না। তরলের বদলে, ধোঁয়া হয়ে ফিরে এল নেশা। কলকাতায়, সবাই এত কথা বলে যে কেউই কিছু শুনতে চায় না। চায় না, তাই বলাও হয় না। কথা না বললেও, দেখি, দিব্যি চলে যায়। ম্যানড্রেক্স খেলে কড়া রোদও জ্যোৎস্না হয়ে যায়। চেনা লোক দেখলেই পালিয়ে যাই। ভালো আছি কিনা জিগ্যেস করবে! যে গলিতে যৌবন নীল ধোঁয়া হয়ে গেল, সেখান দিয়ে অনেক বিদেশিনী হেঁটে যেত। সারা গায়ে উল্কির দাগ, দুই স্বাস্থ্যবান বিদেশীকে একদিন দেখলাম। কে যেন বলল—ম্যাড ম্যাক্স-এ এরা অভিনয় করে টরে। সাইকেলে মাদার ডেয়ারী যাচ্ছিল। প্যাকেটের কোন ফুটো করে দুহাতে টিপে ধরে তারা যেভাবে দুধ খেল, বাঘও বোধহয় সেভাবে মাংস খেতে পারে না। মেয়েদের দিকে তাদের তাকানো দেখে, সভ্যতার জন্য ভয় হল।

সে গলিতে, বিদেশিনীদের যাতায়াত আর আমার আচ্ছন্নতার কারণে, মনে হত, কাছেই কোথাও পিয়ানো বেজে উঠবে এখুনি; তারপর নাচ শুরু হবে; জন্মহীন, মৃত্যুহীন এক অবিরাম মেধাহন্তারক নাচ। কেউ এসে আমাকে সেখানে ডেকে নিয়ে যাবে বলে আমি বসে আছি।

ক্রমশ জীবন খুব ছোট হয়ে এল। ঘুম ভাঙে, বাড়ি থেকে বেরোই, ঠেকে যাই, এক ঠেক থেকে অন্য ঠেক; কালো হীরের পোড়া গন্ধ নাকে মনে প্রাণে ছেয়ে থাকে, হাবা হয়ে বাড়ি ফিরে আসি। চারপাশের মানুষজনকে দেখি—প্রেম, বন্ধুত্ব, সন্তানপালন, উপার্জন, হাটবাজার এইসব করে।

এই সময় এক প্রায় উন্মাদিনী আমাকে সমুদ্রে নিয়ে গেল ; সমুদ্র মানে, মোহনা—যাকে বলে বকখালি, তখন ফ্রেজারগঞ্জ বলতো। এখনও বলে ; ফ্রেজারগঞ্জ পেরিয়ে তবে বকখালি যেতে হয়। সেই উন্মাদিনীর সঙ্গে প্রথম দেখা এ পি ডি আর-এ ; এ পি ডি আর হল 'এ্যাসোসিয়েশন ফর দি প্রোটেক-শন অফ ডেমোক্র্যাটিক রাইটস্'। কে যেন নিয়ে গিয়েছিল সেখানে, আজ আর মনে পড়ে না। গিয়ে দেখি, জয়শ্রী রানা ; কি সাধারণ, কি পরিশ্রমী—বেশ ভক্তি হল। অনেকের সঙ্গে আলাপ করাকরি হল। প্রত্যেকের নাম বলেই, বলা হচ্ছিল—এ এত বছর জেলে ছিল, ও অত বছর— ; শুনতে শুনতে বলেই ফেললাম : এটা কি মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন নাকি, এখানে আসার···। এক আগুন চোখের যুবককে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় থাকেন ? সে বলে—এই শহরেই থাকি। পরে শুনলাম সে তখনো অ্যাবস্‌কণ্ডিং। বেশ ভালো লেগেছিল। আজকাল অবশ্য সে লেখক হয়ে গেছে ; একদিন বলল—আমার পুরনো লাইনের বন্ধুরা দুঃখ পাবে বলে আমি প্রকাশ্যে আমার চিন্তা পাল্টানোর কথাটা ঘোষণা করছি না—যাক্‌গে, সে কথা থাক। এ পি ডি আরের কথা বলি—ওটা ছিল জেল থেকে নকশাল ছেলেদের বের করে আনার অফিস। সেখানে মেয়েটি একদিন একটা পোষ্টার নিয়ে চলে এল : 'আসতে পারি' কথাটা এত আস্তে বলল যে শুধু তার ঠোঁট নাড়া দেখা গেল, কিছু শোনা গেল না। যেন বাতাসেরও অভিমান হতে পারে তাই তার স্বর স্তিমিত। একটা বিশাল বাজপাখি এঁকেছে সে, নিষ্ঠুর আর্ত তার ঠোঁট, তীক্ষ্ণ লোলুপ তার নখ, চোখ তার নির্ঘুম অনুসন্ধানী, তলায় ছোট ছোট করে আঁকাবাঁকা লেখা—বিচারাধীন বন্দীদের জামিন দিতে হবে। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি চাই, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, সে পোষ্টার পছন্দ হয়নি কারও। মেয়েটি—'আসি তাহলে'—বলে চলে গেল।

তারপরই, শুরু হল হাসাহাসি। সে কি নিষ্ঠুর, মর্মান্তিক হাসাহাসি। আমি, হাসতে পারিনি। সেই বাজপাখি আমাকে ঠোঁটে নিয়ে ততক্ষণে উড়ছে। জয়শ্রীদি বললেন—এই মেয়েটির স্টোরিটা শুনবে? সবাই বেশ বাধ্য ছাত্রের মত বলল—হ্যাঁ—অ্যা—অ্যা।

এ সাড়ে ছশো টাকা দামের শাড়ি প'রে বস্তিতে কাজ করতে যেত। একদিন বলল—আপনারা তো বুর্জোয়া ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে। এই বিচারব্যবস্থা তো বুর্জোয়া। তাহলে আপনারা বন্দীমুক্তির জন্য এই বুর্জোয়া বিচারব্যবস্থার

দ্বারস্থ হচ্ছেন কেন ? কেন জেল ভেঙে সবাইকে বের করে আনছেন না ?

আবার সেই সমবেত হাসি, হাসাহাসি।

এসবের কয়েকদিন পরে, সে আবার আসে। জানা যায় তার নাম পলি। জানা যায়, তার অনেক দাদা। জানা যায়, সে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে, কিছুদিন পণ্ডিচেরিতে ছিল। আরো জানা যায়, এই পৃথিবী তার আদৌ ভালো লাগে না। · বেশ খারাপ লাগে। সে যখন শিশু, তখন জ্বরগ্রস্থ অবস্থায় তাকে ফেলে রেখে তার মা, বাবার ঘরে চুপিসাড়ে চলে গিয়েছিল। মায়ের এই চলে যাওয়া, সে আজও ক্ষমা করতে পারেনি। এক আধ্যাত্মিক ছোটমামা, যখন সে সদ্য যুবতী, কালীপুজোর নামে তার ওপর অত্যাচারের চেষ্টা করে ; তাতে সে জেনে যায় মানুষের প্রকৃত স্বরূপ, ইত্যাদি। এবং মাস তিনেক নিয়মিত দেখাশোনা, চা খাওয়ার পরে—একদিন, সে জানায়, তার কাছে অনেক টাকা আছে, এবং সে কলকাতা থেকে দূরে কোথাও চলে যেতে চায়। করুণাবশতঃ, সঙ্গে নিতে চায় আমাকে। কলকাতা, নাকি অসহ্য।

আমি রাজী হয়ে যাই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। তার প্রস্তাবকে যথারীতি প্রেম বলে ভুল করি আমি।

সমস্ত যাত্রাপথ জুড়ে, সে কেবলই, বালকবেলার কথা বলে। যেন যৌবন অস্বস্তিকর, বয়স বড় বিপন্নতাময়, চারপাশের নিষ্ঠুরতার মধ্যে অস্তিত্বরক্ষার চেষ্টায় সারল্যের কোনো সম্বর্ধনা নেই। যেন স্বার্থসিদ্ধির ব্যক্তিগত পরিধির বাইরে কোনো জীবন নেই কারো ; যেন টাকা রোজগার করা আর খরচ করার জন্যেই শুধু বেঁচে আছে পৃথিবীর তাবৎ মানুষ ; যেন স্বস্তির শ্বাস ফেলার মত কোনো নিঃশব্দ ছবি নেই কোথাও। সর্বত্র শব্দ, শব্দ। সবদিকে ছদ্মবেশী কান্না ও ফোঁপানি। কুৎসিতের এই পরিধি পেরিয়ে যেতে চাই। আমাকে আনন্দের সাগরে নিয়ে চলো। আমি ঢেউ হয়ে ভেঙে যেতে চাই। যে সৈকত কখনো আমার হবে না, তার গায়ে আছড়ে পড়ে ফের ফিরে আসতে চাই অথৈ জলের স্বদেশে, যে আমাকে যেতে বলেছিল।···

প্রসঙ্গত, আমারও বালকবেলার কথা মনে পড়ে। কিছু কিছু বলি। যেমন, বন্ধুদের চক্রান্তে আমি বাল্যপ্রেমিকাকে পাইনি। দুজনকে একসঙ্গে দেখলেই, তারা আশপাশ থেকে শিয়ালের মত ডেকে উঠত। তখন গ্রামে থাকি। সারাটা ইস্কুল জুড়ে কারা যেন আমাদের দুজনের নাম যোগচিহ্ন দিয়ে লিখে রেখে দিল। এক দমবন্ধ গ্রীষ্মদুপুরে, এক বন্ধুর কাছে, তাকে বিয়ে করব বড়

হয়ে ; এরকম বলে ফেলি। সেই বন্ধু আবার সেসব কথা তাকে বলে দেয়। তারপর, যা হয়, সেই চেতনাপ্লাবিনী, আমাকে তার বাড়ির পাশের টগর গাছের নিচে, চেপে ধরে—এসব কি শুনছি! নাবালকত্বের কারণে, আমি পালিয়ে আসি। তারপর থেকে তেমন করে সাবালক হয়ে ওঠা আর হল না। সাবালকত্বের অনেক দায়।

আর একবার, স্পোর্টস্ হচ্ছিল। অন্য কোথাও, বেশ বাসে করে যেতে হল। গণ্ডি ভেঙে হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়া, সেই প্রথম। ওমা, গিয়ে দেখি —অনেক দাগ টাগ কাটা একটা বিশাল মাঠ ; সীমানা বোঝা যায় না ভালো ; সেখানে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে সবাই কেমন অনুগত ছাগলের মতন ছুটোছুটি করছে —ভাবছে প্রাইজ নিয়ে বাড়ি যাবে। নিয়মকানুন আমার চিরকাল খুব খারাপ লাগে। মনে হয়, যেখানেই ডিসিপ্লিন, সেখানেই আনন্দের শেষ। একজনমাত্র সঙ্গী জুটিয়ে আমি সারা মাঠে লুকোচুরি খেললাম কত ; অচেনা একটা ফুল কুড়িয়ে পেয়ে তাকে বললাম তুইও ঠিক এই ফুল খুঁজে নিয়ে আয়, আমি ততক্ষণ শুয়ে থাকি। সদ্য সদ্য আবিষ্কার করা নতুন নতুন অনেক খেলা খেলে টেলে, যখন বিকেল শেষ, সন্ধে হব হব, মনে পড়ল ফেরার কথা ; খুঁজে বের করা হল সবাইকে ; আমার খেলার সঙ্গী বিস্কুট রেসে প্রাইজ পেয়ে থাকে সাধারণতঃ—সে জানতে চায় বিস্কুট রেস কখন হবে কিংবা সেসব হয়ে গেছে কিনা ; মাস্টারমশাই আমাদের খুঁজে পাওয়ার স্বস্তিতে বকুনি দেবার কথা ভুলে গিয়ে গভীর স্বরে বলে ওঠেন—সব শেষ হয়ে গেছে। শুনেই তার, সে কি কান্না। তুই কাঁদছিস কেন? জানতে চাইলে সে বলেছিল—বাড়ি গেলে বোন বলবে, দাদা, প্রাইজ কই? সেই প্রথম মিথ্যাচার করি আমি—তাকে, প্রাইজ জোগাড় করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিই। সে, অনিচ্ছাসত্ত্বেই যেন, কান্না ভুলে বাসে গিয়ে ওঠে। না, আমার কোনো দুঃখ হয়নি, সব খেলা শেষ হয়ে গেছে এবং কোনো খেলাতেই অংশ নেওয়া হল না বলে আমার খেলার সঙ্গী কেঁদে ফেললেও ; আমি জানি— সমস্ত দিন নিজের খুশিমত নানারকম নতুন নতুন খেলা খেলে আমি যত আনন্দ পেয়েছি, অন্য কেউই তা পায়নি। আমার সঙ্গীর কেঁদে ফেলার মধ্যে সংস্কার ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রাথমিক বিহ্বলতা ছিল ; আজ বুঝি, আমার তেমন কোনো সংস্কার কোনদিনই ছিল না, তাই ছিল না কোনো অনুতাপ প্রবণতাও!

ছোটবেলায় পলির বালির ঘর ভেঙে দিয়েছিল পলির বন্ধুরা। পলি আজও তার জন্য অনুতাপ করে। সমুদ্রের কাছে গিয়েও, টানা আড়াইদিন সে সমুদ্রে

যায় না ; শুধু শুয়ে থাকে, শরীরের ডাকে সাড়া দেয় ও শুয়ে থাকে ; অবসাদে ডুবে যেতে যেতে শুরু করে বিলাপ ও অনুতাপ : এ জীবন মনের মত হল না !

আমার, অনুতাপবোধ নেই কোনো। বোধহয় ক্লাইভে পড়ি, এক বন্ধুর একটা ছুরি—যার দাশটা ফলা, দেখে লোভ হয়েছিল, তার বাড়ি থেকে পরিষ্কার চুরি করেছিলাম ছুরিটা, কারণ জানতাম—চাইলে সে, ভুলু, কোনদিনই ছুরিটা দেবে না। কারণ ওটা তার খুব প্রিয় ছিল। পরে সে, ভুলু অনেক ভেবে জেনে গিয়েছিল যে আমিই চোর ; ঠারে ঠোরে প্রকাশ্যে অপমানও করেছে অনেক, লাভ হয়নি। চুরির কথা তবু আমি স্বীকার করিনি। ছুরিটা ব্যবহারও করতে পারিনি কোনদিন, ধরা পড়ার ভয়ে। তবে মাঝে মাঝে, গোপন জায়গা থেকে লুকিয়ে রাখা দশ ফলাওলা ছুরিটা বের করে আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। মনে পড়তো ভুলুর অপমান। বন্ধুত্ববিচ্ছেদ। তবু, কিসের কেন একটা সুখ হত। না, অন্যায় করেছি বলে মনে হয়নি একবারও। শুধু, কেমন একটা অস্বস্তি কেন যেন ঘিরে থাকতো আমার সেই নিষিদ্ধ তৃপ্তিকে। ভুলুকে বঞ্চিত কবার জন্য কোনো দুঃখ নেই, থাকলে, বঞ্চিত হতে হত নিজেকেই। শুধু, ছুরিটা ব্যবহার না করতে পারাটাই কি তাহলে অস্বস্তির মূল কারণ ছিল? আর ভুলুর অপমান? তাকে পাল্টা অপমান ফিরিয়ে দেবার সাহস আমার ছিল কি? মনে পড়ে না। নাকি জানতাম, ভুলু নিজেই ঠিক থেমে যাবে একসময়, ক্লান্ত হয়ে পড়বে। অতি বড় প্রিয় জনের শোকও তো মানুষ ভুলে যায়। ছুরি তো সামান্য!

তৃতীয় দিনে পলিকে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে সমুদ্রে নিয়ে যাই আমি ; শাড়ি ফেলে, জামাশায়া ফেলে, সৈকত জনশূন্য ছিল বলেই হয়তো, শুধু ব্রা ও প্যান্টি পরে জলে নামে পলি, আমাকে নামায়। তখন কে জানে যে কলকাতা ভেসে গেছে একটানা অঝোর বৃষ্টিতে, পলির দাদা আমার দাদার সঙ্গে ঘুরে বেরিয়েছে কলকাতার সব হাসপাতাল, সব থানা, চেনাপরিচিত সব বন্ধুদের কাছে খোঁজ করেছে আমাদের—জলে ভিজে ; জল জমে থাকা রাস্তায়, জল ভেঙে ভেঙে? পলি তখন ঢেউয়ের ওঠানামার মধ্যে কোমর ডুবিয়ে আমাকে বলছে : আদিমতা কি আনন্দময়, তাই না?

আমার চেতনা জুড়ে তখনো এন্তার মধ্যবিত্ততা। পলি আমার কেউ নয়।

সে এসেছে নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পেতে ; জীবনের আনন্দকে চুরি করে জেনে নিতে ; এই পাওয়ার জন্যে সে দাম দিতে রাজী ; বস্তুত দুহাতে সমানে খরচও করে যাচ্ছে সে প্রচুর। আমি এসেছি সুযোগের সসম্মান ব্যবহার জেনে নিতে ; আত্মসম্মান বা মানুষ্যত্বের ভুল ফাঁদে অপচিত হয়ে যাওয়ার ভয় থেকে উদ্ধার পাবার আশায়, ক্রীতদাস হয়েও প্রভুত্বের স্বাদ জেনে নিতে।

ঘণ্টা দুয়েক পরে তীরে উঠি। পলি তখনো জলে। তাকে দেখে মনে হয়, সে জলেই তো ছিল এতকাল। জন্মের পর জন্ম সে এভাবেই ঢেউ নিয়ে করে গেছে খেলা। আমার হাত শাদা হয়ে গেছে, আঙুলে শীর্ণ দাগ, হাড়ে কাঁপুনি, মেজাজ রুক্ষ, মন বিধ্বস্ত। অনুনয়, আদেশ, তিরস্কার—কোনো কিছুতেই পলি জল ছেড়ে ওপরে ওঠে না।

অদূরে ঝাউবন। সেখানে জামাকাপড় রাখা ছিল। সেসব প'রে এসে সৈকতে হাত পা ছড়িয়ে বসে সিগারেট খাই, খেতে থাকি। একসময়, বোধহয় নিঃসঙ্গতার কারণেই, পলি উঠে আসে। ভেজা ব্রেসিয়ার খুলে ফেলে দেয়। তার বর্ণনাতীত, অল্প বাদামী আভার স্তনেরা অবনত হয়ে থাকে পলির বুকে। লজ্জা পাবার পক্ষেও তাকে বেশী কিছু ক্লান্ত করেছে ঢেউ। পলি প্যান্টি খুলে ফেলে দেয়। তুলে নেয় শাদা শায়া। তখন সমুদ্রে বিকেল। পলি মাথায় ওপর দিয়ে শায়া গলায়।

পলি আমার কেউ নয়। তবু বুঝতে পারি, এই সমুদ্রতীরের বিকেলে, এই নির্জনযুবতীর এই ছবি, মাথার ওপর দিয়ে শরীরে সে গলিয়ে নিচ্ছে শায়া, এই প্রাকৃতিক ভঙ্গভঙ্গি, এই উন্মোচন আড়াল করার চেষ্টা—এই ছবিটুকুই আসলে আমার।

ফিরে আসার পথে পলি বলে, শ্যাম, ফলের বাজারে গিয়ে তোমার কি কিছু মনে হয় ? আমি দেখি—একটা পচা ফল অনেক ভালো ফলকে নষ্ট করে ; আমার ভেতর থেকে কে যেন এইসব বলে ওঠে। পলি বলে, ধুর, তুমি কিছুই জানো না। প্রকৃতি যে আসলে শুধু রঙ—তা তুমি বুঝতে পারো না কেন! তোমার মধ্যে একটা অবসন্ন হলুদ দেখতে পাই, হিংসুটে ভিখারি হলুদ ; ছোটকাকা রেকর্ডের দোকান চালায় আর নবকল্লোল পড়ে—তার রঙ ক্যাকাশে নীল ; বাবার মধ্যে একটা ক্রিম কালারের শৌখিনতা ছিল, আজকাল শাদা হয়ে যাচ্ছে খুব, আর মা, জানো—একদম স্বার্থপর খয়েরী ! আমার নিজের রঙটুকু আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না।

আমি তখন ভেবে যাচ্ছি—আর আড়াই মাস পরে আমার কলেজের শেষ পরীক্ষা। আমি এখনো ভালো করে সিলেবাসটাই জানি না। আমার এখন কোনো চাকরি নেই। বন্ধুদের ফেলে দেওয়া জামাপ্যাণ্ট পরে দিন কাটে। পিসিমা আমাকে অনার্স রাখতে বলেছে। পলিকে, কল্পনাতেও জীবনসঙ্গিনী ভাবা যায় না।

কলকাতায় নামতেই গাঁক গাঁক করে উঠল শব্দ। বাসের শব্দ, চাকার শব্দ, কথা বলার শব্দ, হর্নের শব্দ। কোথায় ঝাউবন।

পলির দাদা একদিন—ডিড ইউ টেক এনি মেজার ?

নো।

তোমাকে দায়িত্ব নিতে হবে।

কার, আপনার ?

আমার বোনের।

ওহ্, তাই বলুন। সে আমার চে বয়সে ছ বছর বড়।

হঠাৎ গলা ধরে ধাক্কা দেয় সে, পলির দাদা। ফুটপাথের কিশোর মুড়ি বিক্রেতাকে দেখিয়ে বলে—ওদের দেখো, পরিশ্রম করতে শেখো, শুধু ফুর্তিবাজি করলে চলবে ?

আমার দাদা একদিন—পলি কি চায় ?

কিছুই চায় না।

হঠাৎ রাজী হয়ে গেলি কেন ?

ও যা সেন্টিমেণ্টাল। না গেলে হয়তো সুইসাইড করতো।

পলি ছেলে হলে কি যেতিস !

দেয়ার ইজ এ ম্যান বাই ইয়োর নেম ইন ক্যালকাটা। ডু ইউ নো—হু ইজ হি ?

ইয়েস, আই ডু। ঘনশ্যাম্ দাস—সিনিয়র ডি এ জি, অ্যাডমিন—

ইণ্টারভিউ এরপর আর এগোয় না। মোটা কি হতেই হবে এদের ? এই যারা চাকুরিপ্রার্থীর সামনে সাক্ষাত ঈশ্বরের ভূমিকায় থাকে; প্রায় বারোটা এক্সপেরিয়েন্স সার্টিফিকেট ছিল আমার ফাইলে, কোনোটারই মাইনে দেড়শো টাকার বেশী যে ছিল না, তা অবশ্য লেখা ছিল না কোথাও। সেসব ক্রুটিনি

করে, চেহারাটা দেখে, রেজাল্টের পার্সেন্টেজ দেখে শুধু ওই একটাই প্রশ্ন উচ্চারিত হল : দেয়ার ইজ এ ম্যান বাই ইয়োর নেম ইন ক্যালকাটা···

এভাবে যে কারো চাকরি হয় জানা ছিল না। এই প্রথম ঠাকুমার ওপর শ্রদ্ধা হয় আন্তরিক, আমার নাম ঘনশ্যাম রাখার কারণে যাকে ক্ষমা করতে পারিনি কোনোদিন, মহাভারত পড়ে শোনাবার কাকুতি জানাতে যিনি ঘন ঘন ডেকে উঠতেন ওই কৃষ্ণনাম ধরে—ঘনশ্যাম, বাবা ঘনশ্যাম···। বড় হয়ে মেয়েদের কাছে গল্পটা তেমন দাঁড়ায়নি। নাম বলার পর তাদের ফিক ফিক হাসি দেখে ঠাকুমার ওপর কি যে রাগ হত। আজ শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে এল। শুধু নামের জন্যেই একটা সম্পূর্ণ সরকারি চাকরি—আহ্।

ঠাকুমার আম খাওয়া মনে পড়ে। আম যারা নিয়ে আসতো ঝুরি মাথায়, তাদের সঙ্গে কেজি হিসেবে কথা বলেনি কখনো, ঠাকুমার কথা ছিল—কত করে শ? ফোকলা মুখে দালানে বসে আঁটির পাহাড় জমাতো ঠাকুমা; একবার বসে অন্ততঃ পঞ্চাশটা আম পর পর খেয়ে যেতে অনেকবার দেখেছি। পেট খারাপ হতোই। গামছা পরেই কেটে যেতে পরের দু তিনটে দিন; মুখে লাগাতার গজগজানি—নজর লেগেছে, জানি জানি, নজর লেগেছে, আমি জানতুম। তা পেট ছেড়েছে ছাড়ুক, পেটের কাজ পেট করেছে, আমার কাজ আমি করিচি। বেশ করিচি খেইচি। খেতে ভালো লাগে কেন? ভালো লাগলে খাবুনি!

ধানের গোলা থেকে ধান সরিয়ে লুকিয়ে বেচে দিয়ে ভারতের সব তীর্থ ভ্রমণ করেছে ঠাকুমা; একা একাই। শেষদিকে কৈলাসে গিয়ে শুনে এসেছে—বাড়ির কাছেই তো ছিলুম; এতদূর আসার কি দরকার ছিল? বাড়ির কাছে মানে তারকেশ্বর। রাঢ়েচ তারকেশ্বর।

দুষ্টুমি করলেই ঠাকুমা একটা ক্যালেণ্ডার দেখাতো। সেখানে উদাহরণ সহযোগে আঁকা ছিল পাপের শাস্তি। চুরির শাস্তি ছবিটায় ছিল করাত দিয়ে হাত কেটে নেওয়ার ছবি। পরস্ত্রীগমণের শাস্তি ফুটন্ত তেলের কড়াইতে হাত পা বেঁধে ফেলে দেওয়া। ইত্যাদি। সব পাপের মানে সেই বয়সে বুঝতে পারতাম না ভালো। মানে জিগেস করার ইচ্ছে হত খুব। তবু, এটুকু অন্তত বুঝতাম, বুঝতে না-পারা পাপের, মানে জিগেস করলেও পাপ হয়।

পায়খানা যেতে গিয়ে পেছল পৈঠেয় পা হড়কে পড়ে গিয়ে মাথা ফেটে তিনঘণ্টার মধ্যে মরে গেল ঠাকুমা। শেষদিকে পায়খানা যেত খুব। বলতো

—গেরস্থর ওই একটা জাগাতেই তো শান্তি। আমি ওইখেনেই মরবো। ঘরের ভেতর মরলে জ্যান্ত মড়াদের শাপ লাগবে।

অবোধবেলার সেই পাপের শাস্তি আঁকা কালেণ্ডার ফিরে এসেছে পরে নানা-ভাবে। অনেকটা আধুনিক বিমূর্ত ছবির ভঙ্গিতে। কখনো স্বপ্নে, আধো জাগরণেও কখনো বা। সমুদ্রের ধারে, আমাদের অস্থায়ী ঘরে গল্প করতে এসেছিল সরকারি রেষ্টহাউসের ম্যানেজার ; রোগা লম্বা গর্তে বসা চোখ ; সে চলে গেলে পলি আবিষ্কার করে তার প্যাণ্টিটা পাওয়া যাচ্ছে না। সে রাত্রে, ঠাকুমার ক্যালেণ্ডারে একটা নতুন ছবি দেখি আমি—প্যাণ্টি চুরির শাস্তি। নদীর ধারে বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা এক লিঙ্গহীন উলঙ্গ পুরুষ !

বরানগরের ছেলেরা বেশ অন্যরকম। শ্যামবাজারের এপাশের ছেলেদের মতন, তারা অকারণে স্মার্ট হয়ে থাকতে চায় না। মদ খাওয়াবার প্রস্তাব দিলে মাংসের খরচটা কে দেবে, আগেই জেনে নিতে চায়। খোকন নামের এক মস্তান, কয়েকদিন আড্ডার পর, এক বিকেলে আমাকে রেললাইনের দিকে, ৩৪সি বাস টার্মিনাস পেরিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যেতে থাকে ; গোপন সন্দেহ হয় বোধহয় মারবে। বিশ্বাস হয় না। কাউকে মারার মত পরিশ্রম কেউ অযথা করে না। সে সম্ভবতঃ বুঝতে পেরেই বলে ওঠে, 'তুই ভয় পাচ্ছিস নাকি ! আসলে আমার হিষ্ট্রী তো খুব ফেয়ার নয় ! এই গ্যাখ,' ব'লে সে দর্মার বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা ফাঁকা পরিষ্কার জায়গা দেখিয়ে জানায়, 'এটা আমার ফ্যাক্‌টারি।' দেখি সেখানে অনেক যত্নে আগাছা সাফ করার ইতস্ততঃ চিহ্ন। 'আমি এখানে পুরনো টিন থেকে নতুন কনটেনার তৈরি করে বেচবো। বাঁধা অর্ডার পেয়ে গেছি। গোটা পৃথিবীতে এই এইটুকু জাগা আমার একার।…' তাকে সত্যিই মস্তান মনে হয়েছিল। একদিন দেখি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে খোকন। আমাকে দেখেই বলল—তুই এই বেশ্যাবিদ্যালয়ে পড়িস্ নাকি ? স্মিত হেসে তাকে জানাতে হয়—নাম লিখিয়েছি।

বেশী নেশা হয়ে গেলে একসময় কলেজ স্কোয়ারের সুইমিং পুলে উঠে ঘুমিয়ে পড়তাম। অত উঁচুতে, পুলিশ ওঠে না। রাতবিরেতে রাস্তায় শুয়ে থাকার নিয়ম হল, সঙ্গে কম্বল বা ন্যাকড়াজাতীয় কিছু থাকা চাই। নইলে পুলিশ ধরবে। অর্থাৎ, বৈধ ফুটপাথবাসী ছাড়া অন্য কেউ হঠাৎ ফুটপাথে রাত কাটাতে চাইলে, আইনে ও সামাজিকতায় আটকায়। কলকাতা অভিমান করে।

সেসব দুঃখের দিনে, কলেজ স্কোয়ারের জলে, গভীর রাতে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়া পড়ত। নেশার চোখে সেই জলমগ্ন ছায়া বিশ্বের দিকে চেয়ে, ভাবতে সাধ হত, ওখানে কি যাওয়া হবে না, পড়া হবে না কোনদিন? দিনের আলোয় যারা ঘোরাফেরা করে ওই নিরপরাধ কোঠাবাড়ির ভেতরে বাইরে তারা তো আমার মতই দেখতে। না না, তাদের কত পালিশ! গ্রামের স্কুলে আমার জন্যে আলাদা পরিশ্রমে রুটিন করা হত, সে পরিশ্রম আমি দূর থেকে দেখেছি। সারা জেলায় হিউম্যানিটিসে ইলেকটিভ ম্যাথমেটিক্স যে আর কারো ছিল না, অংক আর সংস্কৃত ক্লাস বরাবর ওভারল্যাপ করত; অবশ্য আমার স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট ছিলেন আমার বাবা; আমার খাতিরেই আলাদা। একবার তো সকালের পরীক্ষা বিকেলে দিয়েছি। একটায় পরীক্ষা শেষ। আমি দুটোর সময় গিয়ে দেখি, কেউ কোথাও নেই। সোজা হেডস্যারের সঙ্গে দেখা করতে তিনি শুধু বলেছিলেন—কোশ্চেন দেখেছ? কারণ তিনি জানতেন, যে ছেলে ফার্স্ট হয় তাকে বকতে নেই। একবার টিফিনে আমার পেন হারিয়ে গেল খেলতে গিয়ে। খুঁজে পাচ্ছি না দেখে এক সহপাঠী, বিশে, মজা পেয়ে গেল। আমি পেয়েছি, দেব না! এমনই বোকা ছিলাম, মনে হল সে সত্যিই পেয়েছে, সত্যিই দিতে চাইছে না। সবচেয়ে কড়া ধাতের মানুষ, ইতিহাসের হিমাংশু স্যারকে সোজা নালিশ—স্যার বিশে আমার পেন দিচ্ছে না। টিফিনের শেষে বিশেকে বঁচিশ ঘা বেত মেরেছিলেন হিমাংশু স্যার; বিশে যত বলে আমি নিইনি স্যার—তিনি তত বলেন—ও মিথ্যে কথা বলছে? ছপাং করে বেত পড়ে বিশের পায়ে; লাফিয়ে ওঠে বিশে। পরের দিন অংকের ক্ষেতুবাবু ক্লাসে সবায়ের সামনে—আমি একটা পেন কুড়িয়ে পেয়েছি; যার পেন…সে এসে নিয়ে যাও। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াই আমি—স্যার…। ক্ষেতুবাবু শুধু বিশেকে ডাকলেন—বিশ্বনাথ, পেনটা ঘনশ্যামকে দিয়ে এসো। …বিশে যখন ধীরে সুস্থে গদাইলস্করি চালে ক্ষেতুবাবুর কাছ থেকে পেনটা নিয়ে আমাকে দিতে আসছে, মনে হয়েছিল…কি যে ঠিক মনে হয়েছিল…। মনে আছে বিশু রাগ করেনি তেমন। তোরা ফার্স্ট বয়, তোরা ইচ্ছে করলে পৈদানি খাওয়াতেই পারিস্, এ আর নতুন কথা কি! এরকম শান্ত চোখে পেনটা এগিয়ে দিল সে—নে। খুশি? প্রায় সেই প্রথম বুঝলাম—বিশেদের জগৎ আলাদা। আমাকে আর ওরা কোনদিন কাছে যেতে দেবে না।

কাছে যাবার চেষ্টায় কোন ত্রুটি করিনি কখনো। তবু কেউ যে কেন কিছুতেই কাছে থাকতে চায় না। সবাই যে যার কাজ মিটিয়ে সরে পড়ে। মধ্যরাতে পায়চারি করে বেড়াই বাড়ির ছাদে—নক্ষত্রদের বেশ বন্ধু মনে হয়। হাওয়ার ভেতরকার নীরবতাকে বান্ধব ও আপন লাগে খুব। এই রাতগুলো আমাকে আমার নিজের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে বরাবর। দিনগুলো যেন ভুল দুঃস্বপ্ন। যাকে বাবা বলি, তার সঙ্গে পয়সা চাইবার সময় দেখা হয়। শুধু খিদে পেলেই মায়ের কথা মনে পড়ে। বন্ধুদের মায়াহরিণ মনে হয়। ছুটিয়ে বেড়ায়, ধরা দেবার সময় কই।

লাইব্রেরিতে প্রত্যেক দিন বই পাল্টাতে যাওয়া ছিল জীবনের প্রথম নেশা। একটা দিন চলে গেলে মনে হত, জীবন থেকে একটা নতুন বই চলে গেল। বইগুলো শেষ করতে হত রাতে। ছাদের ঘরের সেই মগ্ন গ্রন্থপাঠ চারপাশের স্তব্ধ গ্রাম থেকে আমাকে ছড়িয়ে দিত পৃথিবীময়। তারপর ভোর হত। টিয়ার ঝাঁক উড়ে বেড়াতে শুরু করলে আর বসে থাকা যায় না। ছাপার অক্ষর থেকে ছাড়া পেয়ে গ্রন্থ তখন কাঠবিড়ালির পায়ে চলে গেছে। কেন যে ঘুমিয়ে থাকে মানুষ।

ক্রমশ মাঝরাতে বড়পুকুরে স্নান করে আসার ইচ্ছে হল। কালির দোয়াত উল্টে আঙুল টেনে টেনে এক কালীমূর্তি আঁকলাম, একদিন গুপীকাকা, যে ঠাকুর গড়ে, সে এসে ছবিটা দেখে—মা, মাগো, এ তুই কি কল্লি মা—বলে চিৎকার কয়ে পালিয়ে গেল। বাবা আমাকে এক দূর গ্রামের ওঝার কাছে নিয়ে গেল। 'শ্যামের বাঁশি শুনবে নাকি'—বলে তার ঘরের জং ধরা দরজা নাড়িয়ে টানা ক্যাঁচ কোঁচ শুনিয়েছি তাকে শুধু; সে বলল—বাবু, আমার দ্বারা হবেনি।

যেন দীর্ঘ ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখলাম, চারপাশে কলকাতা। চায়ের দোকানে যে বন্ধু বসে আছে তার কোমরে পিঠে জামার নিচে পেটো বাঁধা। হাতিবাগান থেকে শ্যামবাজার ওব্দি হেঁটে যেতাম রোজ বিকেলে। কত রঙবেরঙের মেয়ে। বাড়ি ফেরার পথে একদল ছেলে হঠাৎ হঠাৎ ঘিরে ধরে বলতো—সুভাষ কোথায়? পানুর পাড়ায় থাকো আর শালা পানুর নাম শোনোনি বানচোৎ? শুধু শ্যামবাজারে সন্ধের মুখে একা গিয়ে দাঁড়ালে মনে হত কলকাতায় সন্ধে হয় নিঃশব্দে, হঠাৎ। মনে হত, এই পাঁচমাথার মোড়

থেকে পৃথিবীর সবদিকে যাওয়া যায়। চারপাশে এত শব্দ হচ্ছে বলেই বোধ হয় ভুলে গেছি, আমি কোথায় যাবো। আমি কোথা থেকে এলাম? কেন এলাম? শ্যামবাজারে দাঁড়ালে মনে হত, পৃথিবীতে দুঃখ বলে কিছু নেই।

সারাদিন এলোমেলো ঘোরা, শেষ হল বাবার হাত ধরে এক খোঁড়া উকিলের কাছে গিয়ে। বাবা তাকে অনেক কেস দিয়েছে জীবনে। ছেলেকে টাইপ শিখিয়েছি উকিলবাবু। আপনি যদি—।

তারপর থেকে টাইপ মেশিন ছাড়া আমার আর কোনো আত্মীয় রইল না। সারাদিন টাইপ করে সন্ধেবেলার কলেজে ইংরেজী অনার্সের ক্লাসে বসে মাথা ফাঁকা হয়ে যেতো। প্রফেসর পড়াতেন রেপ অফ দি লক। চুল কাটলে কাটলে, তা আমার মাথার চুল কাটলে কেন? যেখানকার চুল বাইরে থেকে দেখা যায় না, সেখানকার চুল কাটলেই তো হত! এসবের সঙ্গে আমার যোগ কোথায়? মাস দুয়েক কলেজে না যেতে একদিন ডাক পড়লো প্রিন্সিপ্যালের কাছে। সাতজন পার্ট-টাইম প্রফেসার বোঝালেন—তোমাকে নিয়ে এবছর ইংলিশ অনার্স খোলা হল! তুমিই যদি না আসো, আমাদের চাকরি থাকবে না।

পার্ট ওয়ানের ফর্ম ফিল্-আপের লাষ্ট ডেট চলে গেছে কবে জানতেই পারিনি। খোঁজ নিতে গেলে বেয়ারা ভগবানদা বলল—এতদিন কোথায় ছিলেন? লেট ফাইন দিয়ে জমা দেবার লাষ্ট ডেটও তো এক মাস আগে চলে গেছে।

আমার তাহলে কি হবে ভগবানদা?

কি আবার হবে? কিছুই হবে না! একটা কাগজে সব লিখে দাও। বাড়িতে বসে অ্যাডমিট কার্ড পেয়ে যাবে। পরীক্ষা হল ওব্দি দয়া করে যেও।

কার ভগবান কেমন, আমি জানি না। আমার ভগবান বিদ্যাসাগর ইভনিং কলেজের সামান্য বেয়ারা। নিজের হাতে ফর্ম ফিল-আপ না করেও আমি অ্যাডমিট পেয়েছিলাম।

কলেজের শেষ পরীক্ষার আগে নোট্‌স্ পাবার আশায় একদিন বাঘা যতীন যেতে হল! শ্যামবাজার থেকে কোনো বাস সেদিকে যায় না। ধর্মতলা থেকে পাল্টে, অনেকক্ষণ। ঠিকানা খুঁজে পেতে, একটা মোটামতন বেঁটে ছেলে তার

ঘরবাড়ি দেখাল। নতুন বাড়ি। সংলগ্ন পুরোনো পুকুর। পাশের পাটক্ষেত দেখিয়ে বলল—এই সব জমিগুলো সব আমাদের। পুকুর আরও ছিল। বেচে দিয়েছি। আমি বেশ ভয়ে ভয়ে বলি—আমার অনার্সের নোট? সে অভয় দেয়—এসে যখন পড়েছ একবার, হবে।

একটু বেশী নম্বরের আশায়, ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যেতাম রোজ। লাইব্রেরির ভেতরের চে বাইরেটাই ভালো লাগত বেশী। বই পেতে বেশ দেরী হয়। অন্য সব পড়ুয়াদের দেখি। চমৎকার সব জামা-কাপড়। পরীদের মত গায়ের রঙ। নিজেকে অবাঞ্ছিত লাগে পৃথিবীতে। একদিন একটা ইনডেক্স ড্রয়ার টেনে খুলতে পারছি না কিছুতেই, একটা কালো রোগা বেঁটে মেয়ে এসে খুলে দিল।

তাকে আগে দুএকদিন দেখেছি। সে বেশ তাড়াতাড়ি বই পায়। সরাসরি রহস্যটা জানতে চাই।

এত তাড়াতাড়ি আপনি বই পেয়ে যান কি করে? সবায়েরই তো বেশ দেরী হয়।

আমার ভবেশদা আছে। এক পাড়ায় থাকি।

কোন পাড়ায়?

রাসবিহারী।

পরে জেনেছি, মুখে রাসবিহারী বললেও, সে আসলে থাকে চেতলায়। স্লিপ জমা দিয়ে: দেরী তো একটু হবেই—চলুন চা খেয়ে আসি। এখানে চা-কা পাওয়া যায়?

ক্যান্টিনে যেতে হবে।

সেটা কোথায়?

দাঁড়ান, খাতাকাতা নিয়ে আসি।

প্রথম দিন মাত্র তিন ঘণ্টা কথা হয়। তারও একই সমস্যা, বই নেই, অংকে অনার্স, গাইডান্স নেই, সবাই এগিয়ে যাচ্ছে।

মাসখানেক লেগেছে আপনি থেকে তুমিতে নামতে, ডাক নাম জেনে ফেলেছি—গেঁড়ি; ভালো নাম চৈতী চক্রবর্তী; নাচ জানে; বাড়িতে ফোন আছে। প্রেম হচ্ছিল, একদিন হঠাৎ—ক্যান্টিনে যাবো বলে সিঁড়ি দিয়ে নামছি, হঠাৎ দেখি পলি, সঙ্গে একজন অচেনা বেশ সুবেশ বোকাহাবা লোক,

চোখে রিমলেস চশমা। চৈতীকে দেখে পলির সে কি হাসি। থামতেই চায় না। এ তোমার নতুন কেস্ নাকি, শ্যাম? একে তো দেখলেই মনে হয়, কোনো কঠিন রোগ আছে!

আমি বলি—সেই হাবা লোকটাকে দেখিয়ে, এ তোমার নতুন কেস নাকি পলি? এনাকে অবশ্য দেখলেই মনে হয়, সঙ্গে গাড়ি আছে।

আছেই তো। পলি বলে—এসো। এক জায়গায় যাবো। এক্ষুনি।

বলা বাহুল্য, আপত্তি চলে না। পলির অভিধানে বাধা বলে কোনো শব্দ নেই।

শাদা ড্রাইভারহীন মার্ক-টুর জানলা থেকে দেখি, ন্যাশনাল লাইব্রেরীর সিঁড়িতে চৈতী দাঁড়িয়ে। বুকে অনেক বই-খাতা ধরা। তার কালো শ্যামল ছিপছিপে শরীরে অসম্ভব বড় বড় শুধু চোখ দুটি। আস্তে আস্তে নিজের পায়ের পাতার দিকে নেমে আসছে।

চাকরি পেয়ে একদিন চৈতীর ফোন পাই। কেমন আছো? অনেক কষ্টে তোমার ফোন নাম্বার পেলাম।

এখনো মনে রেখেছ আমাকে?

ভুলে যাবো বলছো?

শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে সাপ নেমে গেল। এ কি প্রেম? আহ্, আর চিন্তা নেই। এত দিন পরে।

অফিস পাড়ায় বন্ধু খুঁজে খুঁজে, পয়সা চেয়ে চেয়ে দিন কাটানোর দিনগুলির গ্লানি মুছে যায় এক মুহূর্তে। ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেও ক্লাসে না যাওয়ার কারণ ছিল সরকারি চাকরি। এখনই তো প্রেম আসার প্রকৃত সময়। কোথা থেকে ফোন নাম্বার পেলো কে জানে।

চৈতী তুমি আজ বিকেলে শ্যামবাজারে এসো। ঠিক সাড়ে ছটা। সাউথটা তোমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে মুখস্থ হয়ে গেছে। এবার তুমি এসো।

নর্থটা আমি ঠিক—।

আরে শ্যামবাজারে না এলে···। আমি শ্যাম, জানোই তো, ঘনশ্যাম।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওফ্। বলে রেখে দেয় চৈতী। কট্ করে শব্দ হয় কানের ভেতর। বেশ ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে মাথা।

শেষ চিঠিতে চৈতী লিখেছিল—চাকরির জন্য চিন্তা কোরো, দুশ্চিন্তা কোরো

না। আচোট বেকারদের আড্ডায় এসে বলেছিল—আপনারা সবাই একদিন চাকরি পাবেন ; আপনাদের সবায়ের একদিন ঘরসংসার হবে ; ছেলেপুলে হবে ! আমাদের সে কি হাসি। সেই চৈতী। বেশী দেখা করতে চাইতো না। হঠাৎ চিঠি দিত। বাড়িতে চলে আসতো হঠাৎ।

শ্যামবাজারে। সাড়ে সাতটা বেজে যায়। ভিড়, বাসের হর্ন, মানুষের ব্যস্ততা, একইরকম থাকে। কোনো চৈতী আসে না।

হাল ছেড়ে দিয়ে যখন বরানগর ফিরবো বলে বাগবাজার বাটার দিকে আসছি, দেখি চৈতী দাঁড়িয়ে। তুমি এখানে ?

সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি।

এটা বাগবাজার, চৈতী। শ্যামবাজার নয়।

বললাম না তোমায়, নর্থটা আমি ঠিক··· ।

সেদিন, তারপর, দেশবন্ধু পার্কে নটা ওব্দি বসে থেকেও, সুর এল না কোনো। কোথায় যেন তার ছিঁড়ে গেছে মনে হল বার বার। কেউ প্যাটিস বিক্রি করে গেছে। কেউ চাঁদা চেয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত চৈতী বলেই ফেলল—তোমাদের নর্থের চে আমাদের সাউথ অনেক ভালো।

চেতলা কি সাউথ ? প্রথম আলাপের দিন তুমি রাসবিহারীতে থাকো বলেছিলে। চেতলা কি রাসবিহারী ?

প্রেম, এবারেও হল না। এরকম চলতে চলতে, কিছুক্ষণ পরে বেশ ঘনিষ্ঠ অবস্থায়, তাকে বলে ফেলি : তোমাকে যতটা ভালো লাগে, তোমার চেহারাটা আমার ঠিক ততটাই খারাপ লাগে, জানো ?

ছিটকে, সোজা হয়ে বসে চৈতী। অনেকক্ষণ গোঁজ হয়ে থাকে। তারপর আস্তে উঠে দাঁড়ায়। বলে—পিসিমার সঙ্গে দেখা কোরো। অনেকদিন যাও না, বলছিলেন।···

আমি তার চলে যাওয়া দেখি। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে—তুমি কি করে জানলে ?

বলা হয় না কিছুই। চৈতী চলে গেলে, ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ি আমি। পিঠে নরম ঘাস কাঁটার মত বেঁধে। আকাশে, তারাদের শয়তান মনে হয়। সবাই নিঃশব্দে হাসছে।

রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ, নেশায় আবছা দেখছি সবদিক, শ্যামবাজার

কাকা ; হঠাৎ দেখি—নিরুপায় নেতাজীর নিচে রেলিঙের ধারে এক ঘুমন্ত যুবতী। মৃত না জীবিত? গেরস্থ না বেওয়ারিশ? কাছে গিয়ে দেখি। না, শ্বাস তো পড়ছে? ওঠানামা করে যায় বুক। বস্তিবাসিনী বলেই মনে হয়। খুব কি টেনেছে? ঠেলা দিই। নিঃসাড়, অনিকেত, অপ্রকৃতিবাদিনী। শ্যামবাজার জনমানবহীন। পাশে বসে, ঝিমোই কিছুটা। শাড়ি উঠে এসেছে হাঁটুতে। তুলে দিই আরো। উরুদেশে, বুলিয়ে দিই হাত। ত্বক, কর্কশ। আরো ঊর্ধ্বে উঠে যায় হাত।

ঠাকুমার পিঠ ছিল ঘামাচিতে ভরা। ঝিনুক দিয়ে মেরে দিলে, পিট্‌ করে শব্দ হত। আঙুলে পিঠের স্পর্শ, ঠাকুমার। নির্লোম, টান টান পেশী, খাঁজকাটা।

কি রে, কি হচ্ছে এখানে?

বিলুপ্তচেতনা সে যুবতীর শরীরে ছায়া পড়ে। মুখ তুলে দেখি, চার পাঁচ জন লাল লাল চোখের কালো-কালো যুবক। একজন আমাকে চুল ধরে টেনে তোলে, আর একজন···

মধ্যরাতের সে শ্যামবাজারে, না, কোনো ঠাকুমা আসে না।

শ্যামবাজার, ঘন হয়ে আসে।

উদ্ধার পর্ব

বাপের এক ছেলে হওয়া যে কি জ্বালা ! বাপ যদি বুড়ো হয় তাহলে আরও। বাড়ির সব কাজ, দায়দায়িত্ব—সব একার ঘাড়ে। সাতসকালে বলে কিনা—ফ্রিজের ভেতরের আলোটা জ্বলছে না, যা, মিস্তিরি নিয়ে আয়। বললেই হল, মিস্তিরি নিয়ে আয়। মিস্তিরি সেই তালডাঙার মোড়ে। সবে এক কাপ চা খেয়েছে কি খায়নি, 'জিতু—ও 'জিতু' করতে করতে ঘরে ঢুকলো জিতুর মা। কি হল? সক্কালবেলা জিতু—জিতু কেন? নিশ্চয়ই কোনো কাজ দেবে।…তিনদিন ধরে বলছি ফ্রিজের আলোটা জ্বলছে না…। আলো জ্বলছে না তো আমি করবো! আলো জ্বলবার দরকারই বা কি! ফ্রিজটা তো চলছে। না, ভেতরের খাবার দাবার ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। অত দেখার কি আছে? বাইরে বের করে এনে দেখলেই তো হয়। তা হবে না। এক্ষুনি, এই সক্কালবেলা সব কাজ ছেড়ে তালডাঙার মোড় থেকে মিস্তিরি ডেকে আনতে হবে। তিনদিন ধরে বলছি! মিস্তিরি ঘুম থেকে উঠবে তবে তো? ওসব জানি না। ওরা তোর মতন আল্‌সে না, জন্মোকুঁড়ে না! যেমন বাবা, তেমন তার ছেলে! এরপর আর বসে থাকা যায়! যতক্ষণ না বেরোবে জিতু, নন-স্টপ ফাটা রেকর্ডটা বাজতেই থাকবে। ঘাড় গোঁজ করে নিজের মনে বকবক করতে করতে, অবশ্যই নিঃশব্দে, যেহেতু ভাষাগুলো সরবে বলার মত নয়, এবং তা সবই বিধাতার উদ্দেশে—কপালকার্তন, কোনো মানুষকে বলা নয়, তাই শব্দহীন, যেমন প্রায়ই করে থাকে জিতু, জিতেন সেন, বয়স বাইশ, কলেজে পড়ার ছাপ এখনো সর্বাঙ্গে, বাড়ির কাজ ছাড়া আর সব ব্যাপারেই যার উৎসাহ অন্তহীন—সাইকেলটা বের করে চেপে বসল। উদ্দেশ্য—ফ্রিজের আলোর মিস্তিরি, তালডাঙাব মোড় থেকে।

সকালবেলাটা, বিছানায় শুয়ে বসেই কাটে রোজ। সকালবেলায়, বাইরে না বেরিয়ে পড়লে—অনেক কিছুই বোঝা যায় না। বোঝা যায় না সকালটা কেমন দেখতে, সকাল আসলে কি, বিভিন্ন ঋতুতে, এই মফঃস্বলে, সকালের কতরকম রূপ হয়। এই শেষচৈত্রে, আকাশে মেঘ নেই, রোদ এখনও তীব্র হয়নি, বসন্তের নতুন পুষ্ট পাতায় গাছপালাগুলোর যৌবন ফিরেছে—সবুজও যে কতরকম হয়! দেখার মন না থাকলে কত কিই যে দেখা হয় না আসলে। মানুষজন বাজারে যাচ্ছে, মানুষজন বাজার থেকে ফিরছে, এসব দৃশ্য, জীবনের টুকটাক ছবি—এত ভালো লাগছে কেন আজ? জিতু ভাবলো—আসলে রোজ আমি অনেক বেলা ওব্দি ঘুমোই, অনেক রাত ওব্দি বই নিয়ে শুয়ে থাকি, সকালটাকে আলাদা করে পাবার কোনো সময়ই হয় না। ইস্, ভাগ্যিস্ মা তাড়া দিল। ছোট ছোট চায়ের দোকানে পাঁচমিশেলি ভিড়, কোনো কোনো স্টেশনারি দোকান সবে খুলছে, লম্বা টানা শার্টার একটানে ঠেলে তুলছে একটা লুঙ্গি পরা লোক, এই দৃশ্যও আজ এত ভালো লাগছে কেন? অনেকদিন পরে হঠাৎ সকালবেলা বাইরে বেরিয়ে পড়লে এত ভালো লাগে? জানা ছিল না।

গঞ্জের বাজারের মাঝখানে এসে সাইকেল থামিয়ে নেমে পড়ল জিতু।

নেমে পড়ল মানে নেমে পড়তে প্রায় বাধ্য হল জিতু।

একখানা বাস কোনোরকমে পাস করতে পারে—এরকম জায়গা ছেড়ে দিয়ে জি টি রোডে কর্ডন ক'রে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ, একপাশে পুলিশের জীপে খুব আর্ট নিয়ে বসে আছে চুনীলাল মেহেতো, পার্টির একনম্বর দাদা এখন। পুলিশ কর্ডনের ভেতর, ডাঁই হয়ে ছড়িয়ে আছে টি ভি, ফ্রিজ, টেপ, আলমারি, আলনা, বিছানা, তোষক, হাঁড়িকুড়ি—হেনা তেনা। এবং একপাশে, জনা পঞ্চাশেক নানাবয়সী যুবতী একজোট হয়ে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে—ইস্, সেই চিৎকারের বক্তব্য কি বাস্তব, ইস্, সেই চিৎকারের ভাষা কি অশ্লীল।

ব্যাপারটা কি? জি টি রোডের একপাশে সাইকেল রেখে পানের দোকান থেকে দুটো সিগারেট কিনে, একজায়গায় দাঁড়িয়ে মাত্র একটা সিগারেট শেষ করতে না করতেই পুরো ব্যাপারটা বুঝে গেল জিতু।

কলকাতার কোন মাড়োয়ারী প্রোমোটার এখানে ফ্ল্যাটবাড়ি তুলবে। কেউ বলছে সুপার মার্কেট, ফ্ল্যাটবাড়ি নয়। সে যাই হোক, আপাততঃ ভেকেট করা হচ্ছে বাড়িগুলো। পার্টির ছেলে গিজগিজ করছে আশেপাশে। হাতে

হাতে বিলি হয়ে যাচ্ছে লিফ্‌লেট। লক্ষ্মীগঞ্জের বাজারকে পতিতাদের হাত থেকে উদ্ধার করুন। সুস্থ সমাজ গড়ে তুলুন। সুস্থ? আহ্‌। গদাম্ ধড়াম শব্দে মালপত্র টেনে টেনে রাস্তায় ডাঁই করে ফেলছে পুলিশ। পরিবেশের সুস্থতা বজায় রাখার প্রথম পদক্ষেপ। জিতু যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে চুনীলালের জীপটা কাছেই। কে একজন চুনীলালকে বলল—আরো অনেকগুলো তালা লাগবে বস্‌। চুনীলাল গম্ভীর—লাগবে তো জোগাড় কর। আমি কি করবো? এত সকালে অত তালা কেনা যাবে না, দোকান খোলেনি। খোলে নাকি? না খুললেই বা কি। চুনীলাল বললে সব খুলে যায়। সব খোলা দোকান বন্ধও হয়ে যায়। আসলে খরচার রাস্তায় যাবে না। ভট্‌ ভট্‌ করে মোটরসাইকেল স্টার্ট দিল কে? তালা আনতে যাচ্ছে? সব ঘর খালি করে তালা দিয়ে দেবে আজই? ইস্‌, মেয়েগুলো যাবে কোথায়!

তালডাঙার মোড় থেকে মিস্তিরি ডাকা মাথায় উঠল। এক্ষুনি একবার অমরেশের কাছে যেতে হয়। অমরেশকে খবরটা দেবার জন্যে জিতু চুলবুল করছে। সর্ষেপাড়ার খানকি বাড়িগুলো ফাঁকা হয়ে গেল—এতবড় খবরটা প্রথম পরিবেশন করার একটা আলাদা ক্রেডিট আছে না?

সাইকেলে স্টার্ট দিল জিতু। আছো, জেলেপাড়ার মস্তান্‌গুলো তো দিনরাত পড়ে থাকতো এইসব বাড়িতে। তারাও তো কিছু বলছে না? স্‌শালা কত টাকা ছড়িয়েছে মাড়োয়ারী প্রোমোটার? পুলিশ থেকে, পার্টির ছেলেরা থেকে, মস্তানরা পর্যন্ত, কেউ কোনোরকম আপত্তি করছে না? করবেই বা কি করে? খানকি উচ্ছেদ বলে কথা! এ কি যা-তা ব্যাপার! বানচোৎ। মেয়েগুলোর কি হবে তা নিয়ে কার কোনো মাথাব্যথা নেই। নেই কি?

পোজিশনটা কিন্তু দারুন। গঞ্জের বাজারের ঠিক মাঝখানে, রাস্তার এপারে ওপারে ঠিক এইকটা বাড়িই যা একটু অন্যরকম ছিল। এপারে চার-পাঁচটা, ওপারে পাঁচ-ছটা। সর্ষেপাড়ার এই বাড়িগুলো জুড়ে দিলে, পুরোটাই গঞ্জের বাজারের মধ্যে ঢুকে যাবে। নিচের তলাগুলো দোকানঘর হবে নিশ্চই, সবটা যদি আপাততঃ মার্কেট-বিল্ডিং নাও হয়। কম টাকা সেলামি পাবে শালারা? আপাততঃ দু-হাতে নোট ছড়াচ্ছে নিশ্চই। রেসিডেন্সিয়াল ফ্ল্যাটগুলোও তো এক একখানা অন্ততঃ আড়াই কি তিন লাখ করে দাম হবে। বাড়িগুলোর দু-জন মালিক কলকাতায় থাকে, একজন লোকাল; তারাও কেউ

নিশ্চয়ই কোনো আপত্তি করেনি। নোট পেলে আবার আপত্তি কি!

অমরেশের চেহারাটা ভাল্লুকের মতো। রোজ সন্ধের পর এক পাঁট দিশি টানে, এই বয়েসেই, চেহারাটা যার ফলে এখনই কেমন মিষ্টির দোকানদারের মতন নাদুসনুদুস হয়ে গেছে। চন্দননগরে আসলে ওর মামার বাড়ি। অন্য নানারকম আত্মীয়ও আছে অবশ্য। মামার ছেলেমেয়ে নেই বলে এখানে অমরেশের ভারী খাতির। নর্থ ক্যালকাটার এঁদো গলিতে নিজের মা-বাবা ভাই-বোনের সংসারে খুব বেকায়দায় না পড়লে অমরেশ যায়ই না।

হাফ-প্যান্ট পরে ঘুমোচ্ছিল অমরেশ। সেভাবেই উঠে এসে বিরাট হাই তুলতে তুলতে বলল—ক'টাকা?

রাগ করার সময় নেই জিতুর। কলেজে যাবার আগে সকালবেলা মাঝে মাঝে একদম হাতখালির দিনে অমরেশের কাছেই হাত পাতে জিতু—আগের রাতের সর্বস্ব খোয়ানোর পার্টনার ছাড়া কার কাছেই বা বলবে। ঘুম থেকে উঠে জিতুকে দেখলে অমরেশের তাই 'ক-টাকা' বলাটা অভ্যেস হয়ে গেছে। আজ অবশ্য সে ধার দিয়েও গেল না জিতু। ফিস্ ফিস্ করে সব কথা খুলে বলল অমরেশকে।

সব শুনে আরও বড় করে একটা হাই তুলে অমরেশ বলল—কালার টি ভি আছে? ছোটমাইমার একটা কালার টি-ভির খুব শখ। কদিন ধরে খুব বলছে।

জিতু হঠাৎ খুব খচে গেল। খানিকক্ষন গুম্ হয়ে বসে রইল। শেষ-মেষ বলেই ফেলল—চোখের সামনে এতবড় একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, আর তোর শুধু কালার টিভির কথা মনে পড়লো?

আবার একটা হাই তুললো অমরেশ।

—তুই শালা আতুয়াই রয়ে গেলি বরাবর। আরে, যা হবার তা তো হবেই। মেয়েগুলোকে লরী করে পাচার করে দেবে রাতারাতি। জিনিসপত্তর সব নীলাম হয়ে যাবে। এখন শস্তায় একটা কালার টি-ভি বাগাতে পারলে কত টাকা পয়দা হবে বল্ দিকি! স্‌শালা। বচ্ছরকার বাংলু খরচা ফ্রি! চল্ দেখি কি করা যায়।

অমরেশ বাথরুমে পর্যন্ত গেল না। তিন মিনিটের মধ্যে জামাকাপড় পরে নিয়ে সাইকেল টেনে বেরিয়ে পড়ল।

টাকা ছাড়া আর কেউ কিছু বুঝতেই চায় না আজকাল।…ভাবতে

ভাবতে জিতু অমরেশের পাশাপাশি সাইকেল চালাতে লাগল মুখ বুজে।

রাস্তায় আটকালো কিরণ। বাড়িতে আঠেরোটা গরু আছে। নিজে একটা মার্চেন্ট ফার্মের অফিসার। পাঁচ-ছজন খুচরো গয়লা কিরণ পুষে রাখে।

—এই জিতু সর্ষেপাড়ায় কি হয়েচে রে? সকালে আমার লোক দুধ দিতে গিয়ে ফিরে এল।

—তুই বল ওকে কি হয়েচে, আমি চললুম। অমরেশ দাঁড়ালো না।

জিতুর কাছে পুরো রিপোর্ট নিয়ে কিরণ প্রথমেই বলল—বলিস্ কি? মেয়েগুলো হাপিস্ হয়ে গেলে মাস কাবারির টাকা দেবে কে?

আবার টাকা। জিতু হাঁকিয়ে উঠল মনে প্রাণে।

—চল্ তাহলে তোর টাকা আদায় করার চেষ্টা করি। জিতু কোনরকমে কথাটা বলল। সে আসলে সর্ষেপাড়ায় যেতে চায়, এক্ষুনি।

—ধুর, আমি গিয়ে কি করবো! আমি তো কাউকে চিনি না। দুধ তো দিতে যায় অন্য লোক। যাকৃগে, সে যা হবার হবে। এই সাতসকালে তুই কোথায় বেরিয়েচিস্?

—ওই হো। আমার তো তালডাঙার মোড় থেকে ফ্রিজের মিস্তিরি ডেকে আনার কথা।...জিতুর মনে পড়ল!

—তাহলে তাই কর। ওসব ছেঁড়া ঝামেলা নিয়ে মাথা ঘামাসনি। বলে হন হন করে চলে গেল কিরণ।

চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে জিতুর মনে হল, তালডাঙার মোড়ের দিকেই এখন তার যাওয়া উচিত। মিস্তিরি না নিয়ে বাড়ি ঢুকলে মা ছেড়ে কথা বলবে না।

মন পড়ে রইল সর্ষেপাড়ায়, তবু উল্টোদিকে সাইকেল চালিয়ে দিল জিতু। আসলে, রেজাল্ট খারাপ করার জন্যে বাবা যেদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলল প্রথম—আজকাল অবশ্য প্রায়ই বলে থাকে, আর তেমন গা করে না জিতু—সেই প্রথমবার অত্যন্ত বেজেছিল মনে, ঘটনাটা। প্রচুর সম্পত্তি আছে। মা-বাবার এক মেয়ে—এরকম ঘর দেখে প্রায়ই বিয়ের সম্বন্ধ আনছিল বাবা। এই বয়সে বিয়ে? তাছাড়া, যাকে চিনি না জানি না, ধুর। একটু প্রেম ফ্রেম হবে না জীবনে!...মুখের ওপর বাবাকে 'না' করে দেওয়ার পর থেকেই তাল খুঁজছিল। রেজাল্ট বেরোনোর প মার্কশিট দেখাতে যেতেই একদম ফেটে পড়লো—দিনরাত খাচ্ছো দাচ্ছো আর ধর্মের ষাঁড় হচ্ছো একটা—অকাল-

মাণ্ড—এই তোমার রেজাল্ট ? কবে থেকে বলছি দোকানে বোসো সেদিকে যাবার নাম নেই—বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে—। প্রসঙ্গত, জিতুরা সোনার বেণে।

সেদিন, মনের দুঃখে এই অমরেশের সঙ্গে, সর্ষেপাড়ার ওই বাড়িগুলোর একটাতে—কি যেন নাম ছিল মেয়েটার ? মায়া ? লক্ষ্মী ? ছায়া ? সবিতা ? নাম কি আর মনে থাকে। খরচ খরচা সব অমরেশই করেছিল। ক্যাসেট চালিয়ে মেয়েটা যা নাচলো না, কি বলবো ! অমরেশ শুধু মাল খেল বসে বসে। মেয়েটা মাঝে মাঝে অমরেশের থেকে গ্লাস কেড়ে নিয়ে খেয়ে নিচ্ছিল। আর ছিপছিপে লম্বা জিতুকে টেনে নিয়ে নাচাচ্ছিল। তখন কে কার বাবা—কে কাকে বেরিয়ে যাও বলবে—আর দুঃখই বা তার জন্যে করবে কে ! যুগ যুগান্তর ধরে কতরকম ভেঙে পড়া কিংবা না-পড়া, কানা খোঁড়া চোর-ছ্যাঁচোর দুঃখী ডাকাত ভিখিরিকে পার করে দিচ্ছে মায়া লক্ষ্মী ছায়া—কে তার হিসেব রাখে ? স্‌শালা। গঞ্জের বাজারকে পতিতাদের হাত থেকে উদ্ধার করুন ! বানচোত। থুক্ করে থুতু ফেলল জিতু, অবশ্য রাস্তায়।

সর্ষেপাড়ায় যাবার সময় পেল জিতু সেই সন্ধেবেলা।

মাতাল কচি-দা টলমলে পায়ে হেঁটে এসে থপ্ করে বসে পড়ল বাসুর চায়ের দোকানে। জড়ানো গলায় বলল—পরীরা তাহলে উড়ে গেল ? বিনোদিনী কার্ণিচারের বেঁটে মালিকটা তা'লে একন যাবে কোথায় ? তোর আমার বোন মাগ ধরে টানাটানি করবে যে, এ্যাঁ ?

মাতালের কথায় কেউ কোনো উত্তর দেয় না। এ পাশে ও পাশে দু-দুটো মদের দোকান মাছি তাড়াচ্ছে। ঘুগ্‌নিওলা ফুটপাথে মাথায় হাত দিয়ে বসে। মাংস-পরোটার দোকানটা রোজকার মত আজও খুলেছে। তবে খদ্দের নেই একটাও।

সাইকেল থেকে নামল অমরেশ।

—চল্, আজ দোকানটা ফাঁকা দেখছি। নিশ্চিন্ত হয়ে বসে মাল খাওয়া যাবে। রোজ যা ভিড় থাকে। এক একদিন শালা দাঁড়িয়েই মারতে হয়।

—তোর কালার টিভি হল ? জিতু বলল।

চার হাজার টাকায়।

বলে অমরেশ সোজা ফাঁকা মদের দোকানে ঢুকে গেল।

উন্মুক্ত দ্বীপের প্রান্তরে

রঞ্জন বলল, যাবেন না, সোমকদা, আপনি যাবেন না, গেলেই কিন্তু হারিয়ে যাবেন একদম। আর একদিন ভাস্করদা এইভাবে হারিয়ে গেছল।

চারদিকে এলোমেলো বিক্ষিপ্ত ভিড়। ভাস্কর হারিয়ে গেছল বলে আমিও যে হারিয়ে যাব, তার মানে কি? দ্বীপের এ দিকটা বেশ খোলামেলা, একটা প্রদর্শনী হচ্ছে বলে মনে হয়। জাহাজে উঠেছিলাম সেই কবে, ঠিক কতগুলো দিন জাহাজের মধ্যে কেটে গেছে কিছুতেই মনে করতে পারছি না। খিদিরপুর ডকে একটা জাহাজে বই মেলা হচ্ছে বলে রঞ্জন টেনে নিয়ে এল। তারপর বই দেখতে দেখতে জাহাজটা কখন ছেড়ে দিয়েছে বুঝতেই পারিনি। যখন বুঝতে পারলাম তখন আর কোনো উপায় নেই। ইতিমধ্যে পাতলা দুধের মত একরকম পানীয় দিয়ে গেছে দুবার। সেটা খাবার পর থেকেই রঞ্জন ক্রমাগত রিলকের কবিতা পড়ে শোনাচ্ছে। উনামুনোর একটা বইয়ের বিরুদ্ধে লেখা একটা সমালোচনার দিকে চোখ রেখে রঞ্জনের কবিতাপাঠ শুনে যাচ্ছি হঠাৎ ক্যাপটেন ডেকে পাঠাল। কী ব্যাপার? না, লাঞ্চ রুমে হুইস্‌কার খেলা হবে, যারা খেলতে চায় তারা যেন···। রঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, আমি খেলতে চাই না। আমি রিল্‌কে পড়তে চাই। আপনি কি খেলতে চাঁন? আপনি কি যেতে পারবেন? গেলে কি, আপনি পথ চিনে, ফিরে আসতে পারবেন? রঞ্জন একবার লোয়ার ডেকে থ্রিলার সেকশনে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। শেষে একজন সেলারকে ধরে এই পোয়েট্রি সেকশনে ফিরে আসে। রঞ্জন হারিয়ে গেছল বলে আমি হারিয়ে যাব কেন? কিন্তু খেলার বদলে ওই সাদা পানীয়টা আর একটু খাওয়া যায় না? ওটা খেলে বেশ তর্ক করার ইচ্ছে হয়। বাড়ি ফিরে যাবার কথা একদম মনে পড়ে না। রঞ্জন বলল, সেলারদের বললেই

দিয়ে যাবে। ওটা তো ফ্রি। ওটা খেলে আর কোনো ফুডও খেতে হয় না শুনেছি।

খেতে হয়ওনি তিন চারটে দিন কোথা দিয়ে কেটে গেল কে জানে। ঘুম পেলে যে কোনো একটা বা কারে যে কোনো একটা বই নিয়ে শুয়ে পড়লেই হল। অন্তহীন জল দেখতে দেখতে বিরক্ত লাগলে, কিংবা একটু মন খারাপ মন খারাপ লাগলেই বেশ খানিকটা ওই সাদা পানীয় খেয়ে নিলেই হল। কাইন। পোয়েট্রি সেকশনে আমি অবশ্য বেশিক্ষণ একটানা থাকছিলাম না। শর্ট স্টোরি আর নভেল সেকশনে ঘুরে আসছিলাম মাঝে মাঝে। ওদিকে সুন্দরীদের ভিড় বেশি। রঞ্জন অবশ্য একবারও ওদিকে যায়নি। রঞ্জনের ধারনা—মেয়েরা, মানে সুন্দরী মেয়েরা আর কী, কবিতা বোঝে না।···

সে যাই হোক, আমাদের একটা দ্বীপের মধ্যে নামিয়ে দিয়ে জাহাজটা চলে গেল। বিরক্তিকর কোনো উপন্যাস হঠাৎ শেষ হয়ে যাবার মতন, অনেকদিন পরে ডাঙায় পা দিয়ে ভারী আরাম হল। জায়গাটা যে একটা দ্বীপ, কোনো ঘরবাড়ি নেই কোথাও, সেটা বোঝার আগেই সব লোক—ওমা, কী সুন্দর, কী সুন্দর—করতে করতে দুদ্দাড় করে নেমে যে যেদিকে পারে চলে গেল। এক-দিকে, কাঠের গুঁড়ি কেটে ভাস্কর্য করা ছিল অনেকগুলো, আমি সেদিকে এগোতে যাব, রঞ্জন বলল—যাবেন না, সোমকদা, আপনি যাবেন না, গেলেই কিন্তু হারিয়ে যাবেন একদম। আর একদিন ভাস্করদা এইভাবে···।

ততক্ষণে আমি একটা কাটা গুঁড়ির দিকে এগিয়ে গেছি, গুঁড়িটা দূর থেকে দেখে মনে হয়, কোনো বউ নদী থেকে জল আনতে যাচ্ছে, অথচ কাছে গেলে কিছুই বোঝা যায় না—শুধুই কাঠের গুঁড়ি বলে মনে হয়। রঞ্জন হঠাৎ বলল, আরে দেখুন দেখুন, স্কাল্পচারটার খাঁজে খাঁজে বিভিন্ন বই আটকানো! বাহ্, চমৎকার—এইভাবে সাজিয়ে কেন কেউ বইমেলা করে না! কাছে গিয়ে দেখি, সত্যিই—গাছের গুঁড়ির বিভিন্ন খাঁজে খাঁজে নানারকম মূল্যবান বই। দেখুন দেখুন, এই প্রাউগ্যান গুঁড়িটা দেখুন, এ যে জয়দেবের পাণ্ডুলিপি! এসব বলতে বলতে রঞ্জন কোথায় চলে গেল।

আমাকে হারিয়ে যাবার ভয় দেখিয়ে রঞ্জন নিজেই ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল।

কী আর করি, মন খারাপ করার কোনো অবকাশ এই দ্বীপে নেই বুঝতে পেরে একা একাই আর একটু এগিয়ে গেলাম আমি। চারদিকে ইতস্তত

লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারও মুখে কোনরকম দুশ্চিন্তার ছাপ নেই। সবাই বেশ উৎফুল্ল, একরকম ফুরফুরে মেজাজে চলাফেরা করছে, কথাবার্তা বলছে। রঞ্জন হারিয়ে যাবার পর বেশ একা একা লাগছিল, কার সঙ্গে কথা বলা যায় ভাবছি—হঠাৎ এক ভদ্রমহিলা বললেন—আচ্ছা, চিড়িয়াখানাটা কোনদিকে বলুন তো?

চিড়িয়াখানা? বেশ অবাক হলাম। এখানে কোনো চিড়িয়াখানা আছে জানি না তো!

আমি একবার দেখলাম, জানেন? অবশ্য শুধু বাঁদর ছাড়া আর কিছু নেই সেই চিড়িয়াখানায়; অনেকরকম, অনে-করকম বাঁদর আছে, জানেন? শুধু বাঁদর দেখতে বেশিক্ষণ ভালো লাগল না বলে সেখান থেকে চলে এলাম। কিন্তু কেন যেন, চারপাশে গিজগিজ করছে এত মানুষ—মানুষ দেখতে আর ভালো লাগছে না, আমার আবার বাঁদর দেখতে ইচ্ছে করছে—

মহিলাকে এবার বেশ ভালো করে দেখলাম। প্রচুর চেষ্টা করেও বয়স লুকোতে পারেননি, প্রায় চল্লিশ হয়ে গেছে কিংবা হবে হবে। মুখচোখে একটা উন্মন চঞ্চলতা…। কথা বলতে বলতে মহিলার সঙ্গে অনেকদূরে চলে এলাম। চিড়িয়াখানার কোনো চিহ্ন নেই কোথাও। এক জায়গায় একটা জলের ফোয়ারা করে কৃত্রিম রামধনু করা আছে। সেটা অবশ্য সন্ধের পর দেখা যাবে। দিনের বেলা সেটা সামান্য ফোয়ারা।

—রাত্রে এখানে থাকার কি ব্যবস্থা আছে? কোথাও তো কোনো ঘরবাড়ি দেখছি না।

—সেটাই তো মুশ্‌কিল! আপনি বুঝি আজ নতুন এলেন? এই দেখুন, নিজের কথা বলতে বলতে আপনার কোনো খবর নিতে ভুলেই গেছি।

—আজই তো জাহাজ থেকে নামিয়ে দিয়ে গেল। আপনি কি অনেকদিন আছেন?

—কতদিন ঠিক হিসেব নেই, জানেন? প্রথম প্রথম খুব ভালো লাগত। আজকাল ভীষণ বোর লাগে। খবরের কাগজ নেই, টিভি নেই, রেডিও নেই, সিনেমা নেই—

—রাত্রে কোথায় থাকছেন?

—আরে, সেটা কোনো সমস্যাই নয়। যেখানে ইচ্ছে শুয়ে পড়লেই হল। মাঝে মাঝে যে ওপেন এয়ার রেস্টুরেন্টগুলো দেখছেন, ওদের বললেই ওরা

সতরঞ্চি বালিশ সব দেবে। খাবার তো চাইলেই দেয়। পয়সার কোনো কারবার নেই, জানেন? প্রথম প্রথম মজা লাগত, যখন খুশি খেলাম, যেখানে ইচ্ছে শুয়ে পড়লাম, আকাশের নিচে সবাই আমরা সবায়ের বন্ধু—

—এ তো ভারী আশ্চর্য! এত খরচ জোগাচ্ছে কারা? এখান থেকে ফিরে যাবার কোনো ব্যবস্থা নেই?

—সেসব কিছুই জানি না! আমি আর আমার মেয়ে খিদিরপুর ডকে একটা জাহাজে বইমেলা দেখতে গিয়েছিলাম···তারপর।

—হঠাৎ কখন জাহাজটা চলতে শুরু করেছিল, বুঝতে পারেননি?

—ঠিক তাই। আপনারও তাই হয়েছিল?

—তারপর কয়েকদিন পরে এখানে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল?

—ঠিক তাই। কিন্তু কবে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবে সেটা কেউ বলতে পারছে না।

—আপনি কি ফিরে যেতে চান? আমার তো ফিরে যাবার কথা ভাবতেই ইচ্ছে করছে না।

—প্রথম প্রথম আমারও করত না। কিন্তু আজকাল···।

—আপনার মেয়ের কথা বলছিলেন···।

—ও হ্যাঁ সে তো এই দ্বীপে নামার মিনিট পনেরোর মধ্যে—

—হারিয়ে গেল? কিন্তু তার জন্যে আপনার কোনো দুঃখ হচ্ছে না। তাই তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক তাই। কিন্তু, এ'ত কথা আপনি কি করে জানলেন?

—আমার সঙ্গে একজন বন্ধু ছিল। সেও ওই ভাবে···।

—হারিয়ে গেছে?

—ঠিক তাই। ওইরকম দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে।

—কী আশ্চর্য! এখানে বোধহয় পরিচিতরা একসঙ্গে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। অপরিচিতরা খুব তাড়াতাড়ি পরস্পরের পরিচিত হয়ে যায়। তারপর তারাও—

—হারিয়ে যায়। আচ্ছা, এখানে ঘরবাড়ি তো নেই দেখছি, কিন্তু বাথরুম? কিছু মনে করবেন না।

—না না, আপনি তো নতুন। ওই তো, রাস্তার ধারে ধারে ছোট ছোট টয়লেট করা আছে, চলে যান।

—অনেক ধন্যবাদ।

টয়লেট থেকে বেরিয়েই দেখি ভদ্রমহিলা নেই। চারদিকে একই রকম ভিড়। আবার একা একা হাঁটছি, হঠাৎ একটা শালোয়ার কামিজ পরা, ছোট্ট করে ছাঁটা চুল, এক যুবতী এসে বললেন—দূর থেকে দেখলাম, আমার মায়ের সঙ্গে আপনি কথা বলছেন—আমার মা কোথায় গেল বলুন তো?

—সেটা তো বলতে পারব না। হঠাৎ হারিয়ে গেলেন।

—এখানে সবাই এত দ্রুত হারিয়ে যায়, কেউ কাউকে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারে না। কেন বলুন তো?

—তা তো বলতে পারব না। কিন্তু এখানে কেউ কাউকে খোঁজে বলেও মনে হয় না। আপনি আপনার মাকে খুঁজছেন কেন?

—ঠিক মাকে তো খুঁজছি না। আসলে আমার মায়ের কাছে আমার সিগারেটের প্যাকেটটা রয়ে গেছে। অনেকক্ষণ সিগারেট খাইনি তো, খুব ইচ্ছে করছে, এখানে আবার ওসব পাওয়া যায় না—।

—সে না হয় আমি খাওয়াচ্ছি।

—সত্যি? প্রায় ঝলমল করে উঠল মেয়েটি। আপনার কাছে আছে? আমি তাহলে ঠিক ধরেছি।

পরিষ্কার বুঝলাম, আমার সম্পর্কে মেয়েটির কোনো আগ্রহ নেই। সে শুধু সিগারেট চায়। সিগারেট দিতে সে খুব যত্ন করে ধরাল। অসীম তৃপ্তির সঙ্গে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল—আহ, অনেক ধন্যবাদ। আসলে কী জানেন, কলকাতায় হোস্টেলে থেকে থেকে এমন কয়েকটা বদভ্যাস করে ফেলেছি না, কী বলব!

সিগারেট দেওয়া হয়ে গেছে, চলে যাব কিনা ভাবছি—মেয়েটি হঠাৎ বলল, আসুন, ওইদিকে একটা চমৎকার কালভার্ট আছে, ওইদিকে বসে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলি। এখানে কোনো নিরালা নেই, জানেন? এমন চমৎকার দ্বীপ, অথচ···।

কী বলতে চায় মেয়েটি? দেখাই যাক। কালভার্টের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে মেয়েটি প্রথমেই বলল—আমার মা কি আপনাকে প্রোপোজ করেছে?

—কেন বলুন তো? বেশ একটু রাগ রাগ ভাব দেখাই আমি। তাছাড়া ভদ্রমহিলা তো সত্যিই সেরকম কিছু বলেননি।

—না, মানে, একটু প্রেজেন্টেবল ছেলে দেখলেই মা আজকাল···। আমি

আবার তাদের ডেকে ডেকে বলে দিচ্ছি, তারা যেন কিছু মনে না করে! আমার বাবা বিজনেস নিয়ে খুব বিজি থাকেন তো, আমায় মায়ের আসলে সময় কাটে না…।

বেশ বিরক্ত লাগল। এমন চমৎকার একটা দ্বীপে এসে মা মেয়ের চক্করে পড়ার কোনো মানে হয় না। আসলে রঞ্জন হারিয়ে গেল বলে এইসব হচ্ছে।

—এখানে সবাই কেন হঠাৎ হঠাৎ হারিয়ে যায় বলুন তো? কথা পালটাবার জন্য বলে ফেলি।

—হারিয়ে না গেলে তো আমরা কে কোথায় আছি বুঝতে পারব না!

এই কথাটা বেশ ভালো লাগে। চোখ বুজে সিগারেট টানছে মেয়েটি।

—আচ্ছা, এখানে কারো কোনো প্রাইভেসি নেই কেন বলুন তো?

—এটাকে প্রথম প্রথম সবায়েরই সমস্যা মনে হয়। পরে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায় ব্যাপারটা। মনে করুন, আমি হাজার চেষ্টা করলেও আপনার সঙ্গে কোনো বন্ধ ঘরে যেতে পারব না, কারণ ঘর জিনিসটাই এখানে নেই। যার ফলে আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার কোনো ভয় নেই, অসুবিধে নেই…।

—মাথার ওপর ছাদ থাকার ধারনাটাই তো তাহলে পালটে যাবে।

—যাচ্ছে তো। আসলে এই দ্বীপে বৃষ্টি হয় না। দক্ষিণ দিকে একটা লণ্ড্রি ভিলেজ আছে, ওখানে ইচ্ছেমত জামাকাপড় পাওয়া যায়। তবে চেঞ্জ রুম সংখ্যায় কম। বড্ড লাইন পড়ে!

—আপনার মা চিড়িয়াখানার দিকে যেতে চাইছিলেন।

—চিড়িয়াখানা? মেয়েটি লাফিয়ে উঠল। চলুন, চলুন, শিগগির যাই। মা যদি আবার অন্যদিকে চলে যায় তাহলে আর সিগারেটের প্যাকেটটা পাব না!

যেতে যেতে হঠাৎ কাকিমার সঙ্গে দেখা হল। আরে কী ব্যাপার, তুই এখানে—এসবের পর হঠাৎ কাকিমা বলল—বাড়ি যাবি? গাড়ি বার করব? শুনে বেশ হাসি পেয়ে গেল। গাড়ি নিয়ে কোথায় যাবে? দ্বীপের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে লাভ কি? জাহাজ না এলে তো এখান থেকে বেরনো যাবে না! আর জাহাজ যা আসছে সব তো লোক নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। লোক তুলে নেবার জাহাজ তো একটাও আসছে না। কাকিমাকে এসব না বলে শুধু বললাম—নাহ, এখন যাব না। কাকিমা আমার সঙ্গের মেয়েটির দিকে সরু চোখে তাকাতে তাকাতে চলে গেল।

চিড়িয়াখানার সামনে গিয়ে দেখি, আমার স্ত্রী।

—আরে, তুমি কোথা থেকে এলে? এসব কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বউ বলল—দেখো, বাঁদরগুলো কী দুঃখী!

সত্যিই তাই। চিড়িয়াখানা মানে সরু সরু খাঁচায় সারি সারি দুঃখী মনমরা হতাশ সব বাঁদর। দুঃখী বাঁদর জিনিসটা কেউ দেখেছে কিনা জানি না, না দেখলে ব্যাপারটা বোঝানো মুশকিল। এত কুৎসিৎ দৃশ্য পৃথিবীতে আর কিছু হয় না।

হঠাৎ আমার সঙ্গের মেয়েটি বলে উঠল—দেখুন, দেখুন, ওইদিকে ওই বাঁদরটা কেমন হাত-পা ছুঁড়ছে, মুখ বেঁকিয়ে কীসব বলছে, ওটা একদম অন্য-রকম। স্বাভাবিক বাঁদরদের মতন চঞ্চল, কী সুন্দর এণ্টারটেন করছে!

আমরা দ্রুত সেই বাঁদরটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বউ হঠাৎ সরু খাঁচাটার পেছন দিকে চলে গেল। আমাকে ইশারায় ডেকে বলল—দেখো।

দেখলাম। একটা গরম লোহার শিক সেই বাঁদরটার পেছনে ঢোকানো। সামনে থেকে দেখা যায় না। শিকটার শেষ প্রান্তে একটা টিকিট ঝুলছে। নিচু হয়ে টিকিটটা দেখলাম। লাল কালিতে লেখা আছে—সংসার।

খুব হাসি পেলেও হেসে ফেলাটা উচিত হবে কিনা ভাবছি, হঠাৎ দেখি পাশে বউ নেই। একগাল হাসতে হাসতে এগিয়ে এল রঞ্জন। বলল—দুধের বাটি থেকে দুধ খাচ্ছে বেড়াল, বেড়ালটা ইয়া বড়—জানেন তো, সেটা আবার শ্বেতপাথরের, কী সুন্দর জানেন? আর দুধের বাটিতে উনামুনোর 'ট্র্যাজিক সেন্স অফ লাইফ'! বলে হা-হা করে হাসতে লাগল রঞ্জন।

আমি হাসতে পারলাম না কিছুতেই।

শূন্যতার শব্দ

—সবুজ কাগজে টাইপ করাতে হবে।

—সবুজ ঠিক না, একটু নীলচে, ওকে বলে কংকোয়েস্ট পেপার। একটা উকিলের কাছে টাইপ করতুম তো ছোটবেলায়, তখন দেখেছি।

—অফিসে ওরকম কাগজ পাওয়া যায় না ?

—কেন ? অফিস থেকে কাগজ ঝেড়ে পয়সা বাঁচাবি ? তোর শালা সবসময় এক ধান্দা !

—ধূর, মাসের শেষে এতগুলো টাকা···অন্তত কুড়ি পঁচিশ টাকা খরচা !

প্রকাশের সঙ্গে এসব কথা হচ্ছিল দিন দুয়েক আগে। লালবাজারের উল্টোদিকে ফুটপাথে টুল নিয়ে বসা টাইপিষ্ট ছেলেটাকে পয়সা দিতে গিয়ে মনে পড়ল। কুড়ি পঁচিশ নয়, পুরো পঁইত্রিশ টাকা বিল হল। টাইপিষ্ট ছেলেটা আমারই বয়েসী। এক জায়গায় স্টার মার্ক দিয়ে ফুটনোট কয়েক লাইন বসাতে হবে, আগে থেকে বলতে ভুলে গেছি, যখন বললুম তখন যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে ; কিছুতেই ধরানো যাচ্ছে না—বাঁদিকে মার্জিন বাড়িয়ে কোনোরকমে ধরিয়ে দিতে বলছি বারবার—ছেলেটা হঠাৎ বলল—আপনি টাইপের কিছু বোঝেন না।

—কিছু বুঝি না ? জানেন, আমি আপনার মতন কতদিন টাইপ করেছি ? পুরো কলেজ লাইফ, বলতে গেলে তারও আগে থেকে, আমিও আপনার মত টাইপ করতাম।

অবশ্য ফুটপাথে নয়। প্রথম প্রথম বিভিন্ন উকিলের কাছে, তারপর তিনটে প্রাইভেট ফার্মে ; শেষে একটা এক্সপোর্ট কোম্পানিতে—টাইপিষ্ট কাম ইনডিভিজুয়াল করেসপণ্ডেন্ট—অফিসটা ছিল মালিকের বাড়িতেই—দুপুরে পাকা পোনা দিয়ে ভাত, সকাল বিকেল চা-জলখাবার ; মাইনে ছিল ষাট টাকা প্রথম।

মাসে, তারপর পঁচাত্তর, তারপর একশো পঁচিশ। ছেলেটা বলছে—আমি টাইপের কিছু বুঝি না ?

বলুক গে। ছেলেটাকে এখন এত কথা বোঝাতে গেলে দেরী হয়ে যাবে। অফিস লোনের ফ্ল্যাট, মর্টগেজ রাখতে হবে কোম্পানির কাছে, তার কাগজ পত্র এক্ষুনি কপি করে জমা দিতে হবে, নিজের একগাদা কাজ ফেলে বেরিয়ে পড়েছি ; এখন নিজের পুরনো অভিজ্ঞতার কথা একজন অচেনা টাইপিষ্ট যুবককে না বোঝালেও চলবে।

তবে, ছেলেটা স্মৃতির চৌবাচ্চায় একটি ছোট্ট ফুটো বার করে দিল শুধু। সেখান দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে অনবরত। এখন আর কোনো উপায় নেই। হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর দিকে মাঝে মাঝে ফিরে তাকাতেই হবে সারাদিন।

ছেলেটা টাইপ করে যাচ্ছে সমানে। মাঝে মাঝে কোনো শব্দ বুঝতে না পারলে জিগ্যেস করছে। বলে দিতে দিতে মনে হচ্ছিল—মাত্র কয়েক বছর আগেও, আমি নিজে এরকম অন্য লোকের কাগজ পত্র টাইপ করতাম, এখন আমি নিজের বাড়ির মর্টগেজের কাগজ পত্র অন্য একজনকে দিয়ে টাইপ করাচ্ছি। ভাবা যায়! ভাবতে ভাবতে এক গভীর আত্মতৃপ্তির মধ্যে ডুবে যেতে থাকি ; দুপুর বেলা লালবাজারের উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে।

বাড়ি মানে অবশ্য বাড়ি নয়, ফ্ল্যাট। তাই বা কম কি, এই বাজারে। বেশ কয়েক মাস ধরে যে শুনেছে সেই জিগ্যেস করেছে—কত পড়লো ? যেন কিছু নয়, যেন মেয়ের বয়স কত জানতে চাইছে কেউ—এরকম উদাসীন ভঙ্গিতে সবাইকেই বলেছি—বেশী না, এই, এক ছাব্বিশ। অর্থাৎ কিনা, এক নয়া পয়সা যার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নেই, সে কিনা, এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা দিয়ে একটা ফ্ল্যাট কিনে ফেলেছে ; যার জীবন শুরু হয়েছিল ষাট টাকা মাইনের একজন টাইপিষ্ট হিসেবে ; তারও আগে, যে প্রায় বিনা পয়সায় বিভিন্ন উকিলের কাছে টাইপ করে বেড়াতো, শুধু কাজ শেখার চেষ্টায়। তারপর, চাকরি হল এক উকিলেরই চেষ্টায় তারই ক্লায়েন্টের অফিসে। সন্ধে বেলার কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে, তারপর তুম করে এই সরকারি চাকরি। তারপর···।

—আরে, আপনি ? কি খবর ?

শালোয়ার কামিজ পরা সরস্বতী কর্মকার ; কাম্যার ইনসিওরেন্সের এজেন্ট ; অফিস লোনের চেকটা ভাঙাতে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার সময় খুব হেল্প

করেছিল ; ফায়ার ইনসিওরেন্সটা, অবশ্য ওনার কাছে করানো হয়নি।

—এই, একটু টাইপ করাচ্ছি। 'করাচ্ছি' বলতে গিয়ে প্রায় 'করছি' বেরিয়ে যাচ্ছিল মুখ দিয়ে।

—আপনি তো আর এলেন না ? আপনার সেই ফ্ল্যাটটা··· ।

—ওসব হয়ে গেছে। আপনার তো দেখাই পাওয়া যায় না।

—বাইরে বাইরে কাজ থাকে তো ; আপনাদের মতো সারাদিন অফিসে বসে থাকলে আমাদের চলে না।

—আপনি ভালো আছেন ?

—এই, আছি। আচ্ছা, আসি তাহলে ?

—আচ্ছা।

অন্য জায়গায় করিয়ে ফেলেছি শুনে আর দাঁড়াল না। বলে না ফেললে কি চা খাওয়াতো ? খুব চা খেতে ইচ্ছে করছে। টাইপিষ্ট ছেলেটা তো নিশ্চয়ই চা খায়।

—এই ভাই, এখানে চা পাওয়া যায় ?

—ওই গলিতে গিয়ে খেয়ে আসুন। কি নির্বিকার, প্রতিক্রিয়াহীন তার গলা। টাইপ করতে করতে কথাগুলো বলে আবার টাইপ করতে লাগল।

—আপনি একটু দেখেশুনে করবেন ভাই ; আইন কানুনের ব্যাপার তো ? লাইন বাদ দিয়ে ফেলবেন না যেন।

—আপনি চা খেয়ে আসুন।

এবার যেন প্রায় হুকুম করল ছেলেটা।

গলির চায়ের দোকানে বেশ ভিড়। চা-টা দিতে বলে একপাশে সরে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল—অফিসেরই একটা মুখ চেনা ছেলে, সঙ্গে একটু বেশী বয়সের এক মহিলা, চশমা পরা, স্বাস্থ্যবতী, সম্ভবতঃ অবিবাহিতা, কিংবা বিধবা হলেও হতে পারে, মাথায় সিঁদুর নেই আর কি। চাকরি করেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না ; করলেও, আমাদের অফিসের নয়, হলে অন্ততঃ, মুখ চেনা হত। আমার দিকে একপলক তাকিয়ে, ছেলেটা একটু হাসল। একে হাসি বলে কি ? চোর চোর ভঙ্গিতে একটু ঠোঁট বেঁকালো আর কি। ছেলেটার নিশ্চয়ই তীব্র কোনো অভাববোধ আছে, যা সে এই ধরনের পরিণতিহীন আপাত অবৈধ সম্পর্ক দিয়ে পুষিয়ে নিতে চাইছে। সুস্থ, সহজ, সুন্দর, স্বাভাবিক বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হলে, কেউ এই ধরনের অসুস্থ সম্পর্কের মধ্যে যেতে চাইতো না। নারী-

পুরুষের সম্পর্কের ওরকম অবৈধতার মধ্যে দু-একবার গিয়ে দেখেছি, অসম্মান ও অসঙ্গতিময় বিরক্তিকর অশান্তি ছাড়া আর কিছু হয় না। মাংসল যে সরল স্বরলিপির ওপর মানুষের সীমাহীন লোভ থাকে, বিবাহ আর সংযম ছাড়া তার আর কোনো তাৎপর্য্যপূর্ণ ব্যবহার নেই; আছে শুধু যৌবনের অপমান আর অপচয়। অযথা কিছু বিভ্রম।

ফ্ল্যাট না কিনলে বোধহয় এত কথা আমি জীবনে বুঝতে পারতাম না! চা খেয়ে, সিগারেট ধরিয়ে, টাইপিস্ট ছেলেটার কাছে ফিরে আসি। সে ততক্ষণে সেরে এনেছে প্রায়। তার ক্রিয়াশীল তৎপর আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে পড়ে—আমার বাবারও, এই দৃশ্য দেখতে দেখতে, টাইপ শেখার ইচ্ছে হয়েছিল, বেশ বুড়ো বয়সে; শিখে ফেলা অবশ্য হয়ে ওঠেনি আর। যার ফলে, স্কুলের গণ্ডি পেরোতে না পেরোতেই, তখনও রেজাল্ট বেরোয়নি; আমাকে নিয়ে সোজা টাইপ-স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিল বাবা! 'নিজের পায়ে দাঁড়ানো'—কথাটা বলে লোকে, 'নিজের হাতে দাঁড়ানো'—কেন যে বলে না! টাইপ তো হাত দিয়েই করতুম।

রেমিংটনের একটা সেল্‌স্‌ম্যান এসে একবার এমন বোঝাতে লাগল, যে এক্সপোর্ট ফার্মে কাজ করতুম, তার মালিক একটা ঝকঝকে নতুন রেমিংটন টাইপমেসিন কিনতে রাজী হয়ে গেল। তখন আমার বয়স এই সতেরো কি আঠেরো হবে! নতুন মেসিন পেয়ে কী স্ফূর্তি যে পেয়েছিলুম, আজও সে আনন্দের কথা মনে পড়ে। জীবনের টুকটাক দু-একটা স্মৃতি। আগের মেসিনটা যখন তখন স্লিপ করতো, অক্ষরগুলো ভাঙাচোরা—কতরকম অসুবিধেই যে হত। নতুন মেসিনটা আনার পর সবাই বলতে লাগলো—এতদিনে ঠিক হয়েছে, নতুন লোক, মেসিনও নতুন! সুন্দর জিনিস না পেলে সুন্দর মানুষের কাজ হবে কি ক'রে!

একটা মেসিনের জন্যে এতদূর! মাসখানেকের মধ্যে আমার নবোদ্যমের করেসপনডেন্সের চোটে মালিকের ব্যবসা বেড়েছিল অনেক! মালিক প্রায় হাতের মুঠোয় আর কি। আমি যা বলি তাই শোনে। অথচ, যখন প্রথম ঢুকি, মাথা নিচু করে দুরু দুরু বুকে মালিকের বক্তৃতা শুনতাম; এই চিঠিতে এই উত্তর দিতে হবে, এক্সপোর্ট ডকুমেণ্ট এইভাবে টাইপ করতে হয়, একে বলে ইনভয়েস, একে বলে চালান—ফাইলিং করতে হয় এইভাবে, ইত্যাদি। এখন মালিক আমার লেকচার শোনে—এটার কোটেশন আনা হয়নি কেন, নতুন ফ্ল্যাট ফাইল

কেনা হচ্ছে না কেন, ওভারড্রাফ্টের জন্যে অমুক ব্যাংকই ভালো, এই এই মাল বেশী এক্সপোর্ট করলে গভর্মেণ্ট সাবসিডি বেশী পাওয়া যাবে! শুধু একটা মেসিনের দৌলতে।

এইরকম একটা লোককে লালবাজারের উল্টোদিকের টাইপিষ্ট ছেলেটা বলে দিল—আপনি টাইপের কিছু বোঝেন না?

—লাইন বাদ গেল যে!

আমার গম্ভীর গলা শুনে ছেলেটা একটুও ঘাবড়ালো না। ভালো করে মিলিয়ে দেখল। হ্যাঁ, বাদ গেছে। যেখান থেকে বাদ গেছে সেখানে স্টার দিয়ে কোনরকমে ম্যানেজ করে দিল। বলল—'ঠিক আছে?'······এই সুযোগ। এখন আমি ওকে একটার জায়গায় দশটা কথা শোনাতে পারি ইচ্ছে করলে। টাইপের কি জানি না জানি বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দিতে পারি একদম। কিন্তু···না, কেমন মায়া লাগল। আমাকে কেউ খারাপ কথা বললে আমার অপরিসীম খারাপ লাগে; অনেকটা সেই কারণেই যেন, আমি চট্ করে কারো সঙ্গে তেমন খারাপ ব্যবহার করতে পারি না! মোটামুটি দেখে নিয়ে বললাম—ঠিক নেই, তবে চলে যাবে।···মর্টগেজের পেপার, কে আর অত খুঁটিয়ে দেখবে। আইনসঙ্গত দিকগুলো ঠিকঠাক থাকলেই হল।

নিজের, সম্পূর্ণ নিজের যে কোনোদিন ঘরবাড়ি হবে, পুরোপুরি ফ্ল্যাট হবে একটা, জীবনে ভাবিনি। স্বপ্নও দেখিনি বলতে গেলে। ইচ্ছে হত খুব, বেশ নিজের মনের মতন একটা ঘর থাকবে, প্রচুর বইপত্র সাজানো থাকবে, পায়চারি করার মত যথেষ্ট জায়গা থাকবে, একপাশে একটা এককেলে ইংলিশ খাট থাকবে নিচু মতন। যখন এসব কথা ভাবতুম, তখন ঘর দূরে থাক, নিজের একটা পড়ার টেবিল পর্যন্ত ছিল না। বাবা, মা, পাঁচ ভাই, দু-বোন, মোট ন'জনই তো এক সঙ্গে একটা ঘরে থেকেছি মাঝখানে বেশ কটা বছর। সেসব বিপর্যয়ের দিনগুলো···! এখন ভাইয়েরা সবাই চাকরি পেয়ে গেছি, যে যার কর্মক্ষেত্রে নিজস্ব সুবিধেজনক পরিবেশে থাকি, কেউ কারও খবর রাখি না, বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে। মা-বাবা যখন যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়ায়। বেশীর ভাগ দিন অবশ্য গ্রামের বাড়িতেই থাকে।

প্রথম খোঁজটা দিয়েছিল প্রকাশই। অফিসে টিফিন টাইমের আড্ডায়। প্রাইভেট প্রমোটারের সঙ্গে কি কথা হয়েছিল প্রকাশের তখনো জানি না। পার্টি দিতে পারলে কমিশন পাবে—এমন কোনো ব্যাপার হয়তো ছিল, হয়তো ছিল

না। নিজে নিচ্ছে বলে, অফিসের বন্ধুবান্ধবরা কেউ কেউ একই জায়গায়, কাছাকাছি—পাশাপাশি থাকুক, এরকমই হয়তো চাইছিল। টিফিন টাইমে হঠাৎই একদিন বলল—ফ্ল্যাট কিনবি নাকি? তোর তো থাকার জায়গায় অসুবিধে। বৌয়ের অফিস কোয়ার্টারে থাকিস্। নিজের একটা জায়গা কর পৃথিবীতে। আমাদের উত্তরপাড়ার ফ্ল্যাট হচ্ছে। নিস্ যদি তো বল।

কোনো কথাটাই ভুল নয়। তবে এটাও ঠিক, তখন মাসের শেষ—টিফিনটা ক'রে, কার কাছে ধার পাওয়া যেতে পারে—মনে মনে সে কথাও ভাবছি। সে কিনা, ফ্ল্যাট কিনবে। মুখে এসব না বলে প্রকাশকে ঠাণ্ডা মাথায় বলি—জায়গাটা আগে দেখতে যাবো। কিনবো কিনা, সেটা পরের ব্যাপার। আগে পছন্দ হোক।

—আজ বিকেলেই চল্ তাহলে। অফিস ছুটির পর একসঙ্গে চলে যাবো। তুই তো ওই লাইনেই থাকিস কোথায় যেন, হরিপাল না কি···।

—হরিপালে আগে থাকতুম। এখন সিঙ্গুরে থাকি।

—তাহলে তো তারকেশ্বর লাইনে। সাইট দেখিয়ে তারকেশ্বরের ট্রেনে তুলে দোব। আমার বাড়িটাও চিনে যাবি। ফ্ল্যাট নিলে তো আমার বাড়িতে আসতে লাগবে মাঝে মাঝে।

—ঠিক আছে।

উত্তরপাড়ায় যাতায়াতের সেই সূত্রপাত। জায়গাটা যে এত ভালো, সেটা না এলে কোনদিনই বুঝতে পারতাম না। স্টেশন থেকে খুব আস্তে ধীরে হাঁটলেও, 'সাইটে' পৌঁছতে—খুব বেশী লাগলেও দশ মিনিট। ওপাশে জি, টি রোড—গঙ্গা, গঙ্গার ধারে লাইব্রেরী, বাজার, সব একদম, যাকে বলে—হাতের কাছে। এরকম জায়গায় একটা নিজস্ব ফ্ল্যাট হলে তো জীবনের মানে পাল্টে যাবে প্রায়! প্রকাশ যাকে 'সাইট' বলল—সেখানে বহু লোকজন মিলেমিশে কাজকর্ম করছে—একটা বিশাল ক্যাম্পাস জুড়ে একতলা কনস্ট্রাকশন হয়ে গেছে; চারপাশে চুনসুরকির গন্ধ, সিমেন্ট মাখা হচ্ছে এখানে সেখানে। এখানে আমার একটা ফ্ল্যাট হবে? ভাবাই যায় না। ট্রেন বন্ধ হলে জি টি রোডে বাস আছে। শ্যামবাজার মাত্র আধ ঘণ্টার রাস্তা। উত্তরপাড়া বাজারে রোজ গঙ্গার ইলিশ, ঢালাও চিংড়ি মাছ। সামনে বালী স্টেশন দিয়ে শিয়ালদার ট্রেন, ডানকুনি লাইন। মাথাটাই প্রায় খারাপ হয়ে যাবার জোগাড়। কেন যে টাকা জমাইনি সারাজীবন।

প্রকাশ বলল—বুকিং কি দশ হাজার। সেটা না হয় জি পি এফ থেকে তুলে দিয়ে দেওয়া গেল। কিন্তু বাকিটা ? এক লক্ষ ষোল হাজার টাকা কি কম কথা। প্রকাশের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। 'ও ঠিক যোগাড় হয়ে যাবে, তুই বুঝতেও পারবি না কি করে কি হল।' প্রকাশ বলে কি ? মাসের শেষে পঞ্চাশ একশো টাকা ধার জোগাড় করা যার হাড়ে কুলোয় না···। প্রকাশ বলল—কেন, আশি হাজার তো অফিস থেকেই পাবি। হাউস বিল্ডিং। ফ্ল্যাট কিনলে তো একসঙ্গে দেয়। জমি কিনে বাড়ি করলে তিনটে ইনস্টলমেণ্টে দেয়। তুই তো একসঙ্গে পাবি।

—আরও ছত্রিশ হাজার বাকি থাকে।

—অফিস কো-অপারেটিভ থেকে নিবি। চোদ্দ-পনেরো তো হবেই।

—আরও অনেক বাকি থাকবে।

—ও ঠিক একটা না একটা ব্যবস্থা হয়ে সাবে।

অম্লানবদনে এসব কথা বলেছিল প্রকাশ। ঠিকই বলেছিল।···

মা বলল—কিরে, বাড়ির কথা মনে পড়ে না ? মাঝে মাঝে এলে তো পারিস।

—তুমি থাকো বাড়িতে, যে আসবো ? আগে তো একদিন অদ্দূর থেকে এসে দেখলুম, বাড়ি খাঁ খাঁ করছে, সব ঘরে তালা, তুমি ভাইয়ের বাড়ি গিয়ে বসে আছো।

—যাবো না তো কি করবো ? নাতি পুতিদের দেখতে ইচ্ছে করে না ? শ্বশুরের এই ভিটেতে কি আচে ?

সেটা ঠিকই। এই গ্রাম ট্রেন লাইন থেকে অনেক ভেতরে, এক দেড়ঘণ্টা অন্তর একখানা মাত্র বাস, তাও প্রায় বন্ধ থাকে বিভিন্ন গোলমালে। 'বাবার খুব শরীর খারাপ, একবার দেখা করিলে ভালো হয়'—মায়ের চিঠি পেয়ে গ্রামে আসা ; এলে যে ভালো লাগে সেটা অনস্বীকার্য্য, ছোট বেলার হাজারো স্মৃতি প্রতিটি ধুলিকণার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এখানে। উত্তরপাড়ার ফ্ল্যাটে প্রথম ঢোকার সঙ্গে, ছোট বেলার গ্রামের পৈতৃক বাড়িতে ঢোকার আনন্দ—এই দুটোর মধ্যে তফাৎ অনেক। অনেকটা যেন, একই খাবার রেষ্টুরেণ্টে খাওয়া আর বিয়ে বাড়ির সমারোহের মধ্যে খাওয়ার মতো।

সাধ ও সাধ্যের ফাঁক ফোকরের মধ্যে জোড়াতালি দিয়ে এগিয়ে চলেছে যে ফ্ল্যাটসভ্যতা, তার মধ্যে নাড়ির টান বা মাটির গন্ধ নেই। আরও কত কিছু

যে নেই।

বাবা বলল—একটা ডাক্তারও পদের নয়। ইনজেকশন দেয় যেন গুনছুঁচ কোটাচ্ছে গায়ে। সাকুল্যে তিনটে ডাক্তার—তিন জনকেই দেকিয়েচি। কোনো লাভ হল না।

ডায়াবেটিস, খারাপ হার্ট, ব্রংকিয়াল অ্যাজমা, তার ওপর হাইড্রোসিল। এতগুলো অসুখ এক সঙ্গে হলে তার চিকিৎসা গ্রামে বসে হয় না। মায়েরও কাশির সঙ্গে রক্ত আসছে। বোধহয় টিবি। সেটা অবশ্য আজকাল সহজেই সারে।

—কাল সকালে উত্তরপাড়ায় চলে এসো বাবাকে নিয়ে। কলকাতার কোনো হাসপাতালে দুজনকেই দেখাবার ব্যবস্থা করবো।

মা এসব কথার কোনো উত্তর দিল না। উল্টে বলল—জামাই তো বেড়াতে যাচ্ছে, গোয়া। এল টি সি না কি আছে সব। তোর অপিসেও তো আছে। মা-বাবাকে নিয়ে তো গেলি না কোথাও।

বাড়িটা বিষ হয়ে গেল মুহূর্তে। বাবা এমন অসুস্থ, আর মা কিনা বেড়াতে যাবার স্বপ্ন দেখছে!

স্টেশনে যাবার বাস আসছে। 'কাল এসো'—বলে আমি উঠে পড়ি। অফিস কামাই হবে ক দিন। টাকাও খরচ হবে বেশ কিছু। হাজার হোক, মা-বাবা।

এল টি সি ;—অর্থাৎ কিনা, লিভ ট্রাভেল কনসেসান ; চার বছরে একবার, সারা ভারতে, যেখানে যেতে চাও, সরকার তার ভাড়া দেবে, তাও স্ট্রেট ওয়ে ; কিন্তু—শুধু ভাড়া দিয়ে তো আর বেড়াতে যাওয়া যায় না! টাকা যে, এক পয়সাও জীবনে জমলো না। উল্টে, ঘরবাড়ি করতে গিয়ে ধার হয়ে গেল আকণ্ঠ।

জি পি এফের দশ দিয়ে বুকিং। হাউস বিল্ডিংয়ের আটাত্তর। অষ্টআশি। কো-অপারেটিভের চোদ্দ। এক লাখ দু-হাজার। আবার জি পি এফ দশ। এক লাখ বারো। মোটর-সাইকেল অ্যাডভান্স চোদ্দ। এক লাখ ছাব্বিশ।···কম কথা? যে কটা টাকা মাইনের দিন হাতে পাই, সেগুলো অন্যের সামনে, গুনতে লজ্জা করে! অথচ, দু-তিন মাস যেতে না যেতেই, নতুন ফ্ল্যাটে থাকার সুখটা, নিতান্ত যন্ত্রণা হয়ে দাঁড়াল। মলয়ার পোস্টিং এখন কৃষ্ণনগরে, ট্রান্সফারেবল্

সার্ভিস, ওয়েস্ট বেঙ্গল হেল্‌থ্‌ ডিপার্টমেণ্ট ; কখন কোথায় ঠেলে দেয় কিচ্ছু ঠিক নেই ; সে জন্যেই অনেকটা—সাততাড়াতাড়ি, কলকাতার যত কাছে সম্ভব—মাথা গোঁজার একটা নিজস্ব আস্তানা করার জন্যে এত চেষ্টা। যদিও, গত দশ বছরের বিবাহিত জীবনে, আমাদের সন্তানাদি নেই। এ ব্যাপারে স্ত্রীর বক্তব্য—ও যখন হবার ঠিক হবে, ব্যস্ত হবার কি আছে! আসলে, ডিস্ট্রিক্ট হেলথ্‌ অফিসারের চাকরি নিয়ে, সে এত ব্যস্ত—এসব ভাবারও সময় নেই খুব একটা। আর, আমার ফ্ল্যাটে তিনি আসেন শনিবার রাত্রে, সোমবার ভোরবেলা কৃষ্ণনগরে চলে যান। ওখানে হস্টেল আছে। টেবিলে ভাত আসে।

ফলতঃ, প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে বাড়ি করার, মানে ফ্ল্যাট কেনার পর যা দাঁড়ালো—তা হল, ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং নিজস্ব, কিন্তু জনপ্রাণীশূন্য ফ্ল্যাট ঘরে। এক গ্লাস জল গড়িয়ে দেবার কেউ নেই। প্রায় ব্যাচেলরস ডেন হয়ে দাঁড়াচ্ছে বাড়িটা। আর শনিবার রাতে তিনি ফিরে এসে—এটা কেন, ওটা কেন, সেটা কেন···। ওহ্‌, সে কথা থাক।

লোক রাখার কথা ভাবিনি তা নয়। একশো অন্তত সবাই চায়। শুধু একটা লোকের জন্যে মাসে একশো টাকা দিয়ে···। দশ দিন দু-বেলা খাওয়া হয়ে যাবে ওতে। সব কেটে কুটে যে কটা-টাকা হাতে পাই···।

—তোমার মা-বাবার অসুস্থতার কথা আমাকে বলে কোন লাভ নেই। ওসব নিয়ে তুমি ভাবো। সামনের মাসে ছোট বোনটার বিয়ে লাগতে পারে, হাজার পনের টাকা দিতে পারো ?

—টাকা !

—হ্যাঁ, টাকা। মাত্র পনেরো হাজার। জীবনে তো কিছুই দিলে না।

এক শনিবার রাতে এসব কথাবার্তার পর পাশ ফিরে শুয়ে থাকা ছাড়া আর কিই বা করা যেতে পারতো।

বাবার ব্লাড সুগার দুশো একুশ। ই সি জি রিপোর্টও বেশ খারাপ। এই অবস্থায় হাইড্রোসিল অপারেশন করবে না ডাক্তার। চোখের নিচের চামড়াটা টেনে ধরে বেশ বিচিত্র স্বরে বললেন ডাক্তারবাবু—রক্ত এত কম কেন ?

আর কেন! আমাদের জীবনে রক্ত মানে তো টাকা। সেটাই যখন কম···।

ওষুধপত্র খেয়ে, মায়ের অবশ্য থুতুর সঙ্গে রক্ত আসাটা থেমেছে।

তবু, যাই হোক, মাথার ওপর এখন আমার তো একটা ছাদ আছে অন্ততঃ। ঘুম ভাঙলে নিজের চা-টা নিজেকেই করে নিতে হয়। কি আর করা যাবে। দোকানে গেলে ফালতু খরচ। রান্নার গ্যাস আছে। সকালে দুধ দিয়ে যায় আধ সের। ভাতে ভাত করে নিতে মিনিট দশেক লাগে।

দুটো ঘর। একটা ডাইনিং। ঝাঁট দিতে সময় লাগে। একটা সরু ব্যালকনি। সেখানে জামাকাপড় শুকোতে দেবার স্ট্যাণ্ড। তাতেই ব্যালকনির অর্ধেক শেষ। ফ্ল্যাট বাড়িতে অন্য অনেক অসুবিধের মধ্যে, জামাকাপড় শুকোতে দেওয়ার অসুবিধেটা পারমানেণ্ট।

জীবনে কত রকম ভাবে যে থাকা হল। একদম বাচ্চাবেলায় কলকাতায়, সে সব ঘরবাড়ি এখন মাড়োয়ারীদের কবলে। বাঙালীর দুর্দিন দেখে জলের দরে কিনে নিয়েছে সব। স্কুল লাইফ গ্রামের বাড়িতে—যেখানে এখন ফিরে গেছে মা বাবা। মা অবশ্য হাঁফিয়ে উঠলেই কোনো ছেলের বাড়ি চলে যায়। ছেলেরা যে প্রায়ই টাকা পাঠাতে ভুলে যায় কিনা! তাছাড়া, নাতিপুতিদের সঙ্গে দেখাও হয়। গ্রামের বাড়িতে তো কেউ থাকে না।

কলেজ লাইফটা আবার কলকাতায়—পুরোনো বাড়িতেই; গুলু ওস্তাগর লেনের একটা সূর্যের-প্রবেশ-নিষেধ ধরনের কম ভাড়ার ঘর, বারান্দায় রান্নার ব্যবস্থা, আমি তো খাটের তলায় ঘুমোতাম; জায়গার অভাবে। দাদার চাকরি পাবার, বিয়ে হওয়ার পর বরানগরে—নপাড়ায়; মিলিটারি ওয়্যারলেস মাঠের ধারে, একটা অসমাপ্ত বাঙাল বাড়ির একতলায়: সেখানে অবশ্য ঘর ছিল তিনটে—কিন্তু সন্ধেবেলা ঝাঁক ঝাঁক মশার চোটে ভারতনাট্যম নাচতে হত রোজ। তারপর আমার চাকরি, বিয়ে, বিয়ের পর পরই মায়ের সঙ্গে বৌয়ের—মানে, যা হয়; সোজা সস্ত্রীক গ্রামের বাড়িতে—ওখানে অনেক ঘর খালি, অবিবাহিত এক কাকা, বিধবা এক কাকিমা—এরা ছাড়া কেউ নেই। যাতায়াতের কষ্ট বলে তিন-চার জায়গায় ভাড়া থাকা, তারপর স্ত্রীর অফিস—কোয়ার্টার··· এই উত্তরপাড়ার ফ্ল্যাট···কম কি।

একটা জানলা দিয়ে সূর্য দেখা যায় ভোরের দিকে। এইটুকুই যা শান্তি। বাকি দুটো ঘর বেশ অন্ধকার। দিনের বেলা আলো না জ্বাললে মাছ খাওয়া যায় না। মাছ অবশ্য খাওয়াই বা হয় কোথায়। যা দাম।

কৃষ্ণনগরের হস্টেল চার্জ, উত্তরপাড়া থেকে মান্থলিই তো একশো টাকার কাছাকাছি—নিজের বাড়িতে ছোট ছোট ভাই বোন চার-পাঁচটা, বুড়ো

রিটায়ার্ড. বাবা—সব মিলিয়ে মলয়ার হাতেও এমন কিছু থাকে না, যে মাছ আসবে।···

কিন্তু, ওর বোনের বিয়ে লাগলে···অন্তত হাজার পনেরো···কোথায় পাবো। অফিস লোন তো সব শেষ প্রায়··· ।

দেওয়ালের প্লাষ্টিক পেণ্ট ঝকমক করে। এসব মলয়া করিয়েছে। পেলমেট পর্দা। কিচেন আর বাথরুমে একস্ট্রা টাইল্‌স্‌। সেল্‌ফ। মেঝের মোজাইক অবশ্য কোম্পানির। দরজার বাইরের কোলাপসিব্‌ল্‌ গেট, বাথরুমের সিনটেক্সের দরজা—এসব চেয়ে চেয়ে দেখি পকেট হাতড়াই। ইচ্ছেমত সিগারেট খেতে পারি না। সিনেমা দেখতে পারি না। আলুও পাঁচ টাকা হয়ে গেল—বলে স্বর মেলাই অন্যদের সঙ্গে, যা জীবনে করিনি আগে কখনো। ফাঁকা ফ্ল্যাটে এ ঘর ও ঘর করি রোজ। শুয়ে থাকি যতক্ষণ খুশি। চা ক'রে খাই বার বার।

শুধু কেউ ঠিকানা জিগ্যেস করলে, বেশ কায়দা করে বলি—সি দুশো তেত্রিশ রাজবাড়ি অ্যাপার্টমেণ্ট···। দরজায় নেমপ্লেট। ওয়াটার্লু স্ট্রিট থেকে লেটার-বক্স কিনে নাম-ঠিকানা লিখিয়ে সেটা হাতে নিয়ে, খুব সাবধানে, কাঁচা রঙ যাতে না উঠে যায়, বাড়ি ফিরছি—মনে হল, হাসপাতাল থেকে কাঁচা ছেলেকে কোলে নিয়ে, এভাবেই বাড়ি ফেরে লোকে।···

এসবের মাঝখানে, এক শনিবারের রাতে, মলয়াকে চেপে ধরি আমি—এভাবে তো পারা যাচ্ছে না আর। কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হয়।

—কিসের? যেন কিছুই হয়নি, এমনভাবে বলল মলয়া।

—দিনের পর দিন এইভাবে একা একা থাকবো বলে তো বিয়ে করিনি আমি, ফ্ল্যাট কিনিনি। সর্বস্বান্ত হয়ে বাড়ি করে, শেষে বাড়িতে থাকাই অসম্ভই হয়ে যাচ্ছে! বাইরে খেয়ে খেয়ে তো অ্যামিবায়োসিস ধরে গেল।

—কি করতে চাও? বিয়ে করবে আর একটা?

—আমি ঠাট্টা করছি না মলয়া। কিছু একটা ব্যবস্থা করার কথা তোমার ভাবা উচিত।

—তুমি কি ভাবছো?

—বাবাকে দাদার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে আমি মা-কে আমার কাছে এনে রাখবো।

এই একটা মোক্ষম প্রসঙ্গ—মা। মলয়া অসম্ভব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে, আমি জানতুম। বিয়ের পর সদ্য সদ্য সেই কবে কি হয়েছিল, মলয়া এখনও···।

ঝাড়া বাইশ মিনিট লেকচার ঝাড়ল মলয়া। যার সারমর্ম হল—মা থাকলে, সে থাকবে না এখানে! গলার পর্দা এত চড়িয়ে ফেলেছিল শেষদিকে, যে আমিও খেপে গেলুম। নিজের মায়ের নামে আজে বাজে মন্তব্য কতক্ষণ আর সহ্য করা যায়। বেশ তুলকালাম চলছে, এমন সময় দরজায় কলিং বেল বাজল।

প্রত্যেক ফ্লোরে চারটে করে ফ্ল্যাট।

ল্যাণ্ডিংয়ে আশপাশের ফ্ল্যাটের আট-নজন লোক।

—আমরা এখানে ছেলেপুলে নিয়ে সংসার করি দাদা; আপনারা প্রায়ই যদি এরকম চেঁচামেচি করেন রাত্রের দিকে, তাহলে···।

জায়গাটা কলকাতা হলে হয়তো এরকম হত না। তবে, কলকাতায় একটা ফ্ল্যাটের দাম এর তিনগুণ। অন্তত দ্বিগুণ তো বটেই।···

রবিবারটা কেটে যায়, শান্ত। সোমবার ভোরে মলয়া আর বিছানা থেকে উঠতেই চায় না।

বেলা বাড়ে।

—কি ব্যাপার? ট্রেন ধরবে না?

কোনো কথা বলে না মলয়া। শুয়েই থাকে।

কি হল কে জানে। চাকরি ছেড়ে দেবে নাকি?

অনেকক্ষণ পরে গুণগুণ করে ওঠে মলয়া—ভালো একজন গাইনোকোলজিস্টের কাছে যাবো, চলো, বাচ্চা কাচ্চা একটা···।

বাড়িটাই যেন কথা বলে ওঠে আমার বদলে—চলো। চলো। চলো।

আহা, অপালা

এক

—এই অসীমদা, তারাপীঠ যাবার ট্রেন কখন আছে ?

—তারাপীঠ ? কেন বলো তো ?

—আমি আর বিপ্লব তারাপীঠ চলে যাবো ভাবছি। আমি তো বেরিয়েই পড়েছি। বাড়ি ফেরার কোনো ইচ্ছে নেই। বিপ্লব বসন্ত কেবিনে আসবে ছটার সময়। আচ্ছা, এখান থেকে হাওড়া স্টেশন ট্যাক্সি ভাড়া কত পড়বে ? আমার কাছে সবশুদ্ধ—ঠিক বিরাশি টাকা আছে। বিপ্লবকে অবশ্য কিছু টাকা আমি জোগাড় করতে বলেছি।

—কি ব্যাপার বলো তো ? বাড়ি ফিরবে না, তারাপীঠ যাবে, বিরাশি টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছো—আমি কিছু বুঝতে পারছি না অপালা।

বাস ধরবে বলে কলেজস্ট্রিট বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে ছিল অসীম। বেশ কয়েকটা বাসে অপর্যাপ্ত ভিড়। সিগারেট ধরালে অনেকসময় খালি বাস আসে, সেই আশায় একটা সিগারেট ধরাতেই অপালার সঙ্গে দেখা। সেই পিঠ ছাপানো সোজা ঢেউবিহীন চুলের ঢল ; সেই বইখাতাভর্তি ঝোলা ব্যাগ কাঁধে ; শ্যামলা চেহারার টানা টানা চোখের অপালা ; দুতিনদিন আগে বিপ্লবের সঙ্গে বসন্ত কেবিনে বসেছিল—হঠাৎ চা খেতে ঢুকে অসীমের সঙ্গে গল্প হয়েছিল অনেকক্ষণ। আজ তার সঙ্গে বলতে গেলে অসীমের এই সবে দ্বিতীয়বার দেখা। অপালা বিপ্লবের ক্লাশমেট, তুইতোকারির সম্পর্ক ; অন্যরকম কিছু তো মনে হল না। এখন হঠাৎ বাড়ি ফিরবে না বলছে, খামোকা তারাপীঠ যেতে চাইছে কেন অপালা ; তাও, বিপ্লবের সঙ্গে ? বোঝাই যায় তেমন কোনো প্রস্তুতি ছিল না

তার ; কারণ সঙ্গে রসদ মাত্র বিরাশি টাকা ! এবং সঙ্গে লগেজ বলতে কিছু নেই।

এখনও ঠিক সন্ধে হয়নি, কলকাতায় অবশ্য কখন সন্ধে হয় কিছুই বোঝা যায় না। অফিস ছুটির বোঝাই ভিড় প্রত্যেকটা বাসে।

—বসন্ত কেবিনে চলুন না। বিপ্লব আসবে এক্ষুণি। কলেজ থেকে বেরিয়ে ও টাকা জোগাড় করার জন্যে কার বাড়ি যেন গেল একটা। চলুন না অসীমদা- অবশ্য আপনার যদি···।

অপালার দিকে এবার বেশ মনোযোগ দিয়ে তাকাল অসীম। সারাদিন ক্লাশ করার ক্লান্তির কোনো ছাপ নেই চেহারায়। চোখেমুখে কেমন একটা চাপা অস্থিরতা। হাবভাব দেখে মনে হয়, চারপাশের ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী কোনোরকম ছায়া ফেলতে বা রেখাপাত করতে পারছে না তার মনে।

বিপ্লব কোনো অর্থেই সাধারণ ছেলের পর্যায়ে পড়ে না। বিপ্লবের সঙ্গে যখন অন্তরঙ্গতা আছে, অপালাকেও নিশ্চয়ই আর পাঁচজন সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরোয়া মেয়ের দলে ফেলা যায় না ; অথচ, মাত্র একদিনের চা-আড্ডায় তেমন কিছু অসাধারণত্বের আভাসও পায়নি অসীম, যে তাদের গতিগতি সম্পর্কে পরিষ্কার কোনো ধারণা করতে পারবে। তবে অপালা যে, কোনো একটা গোলমালে পড়েছে, সেটা বোঝাই যাচ্ছে। হাওড়া স্টেশনের ট্যাক্সিভাড়া কত, তারাপীঠ যাবার ট্রেন কখন আছে,—হঠাৎ সন্ধের মুখে কলেজ স্ট্রিটের ব্যাসস্ট্যাণ্ডে একজন অল্পপরিচিত মানুষকে এইসব অসংলগ্ন প্রশ্ন করার মানে কি ?

অসীম বলল—বিপ্লব আসবে ? তাহলে চলো। আমার তেমন কিছু তাড়া নেই। অপালা যেন নিশ্চিন্ত হল অনেকখানি। মাথা নিচু করে হাঁটতে শুরু করল। বলল—চলুন। আপনার সঙ্গে কথা আছে।

বসন্ত কেবিনে পৌঁছনো পর্যন্ত অপালা আর কোনো কথা বলল না।

অফিস ছুটির পর সন্ধের মুখে কোনো যুবতীর সঙ্গে দেখা হলে খারাপ লাগার কথা নয়। কিন্তু অপালার হাবভাব দেখে মনে মনে কিছুতেই স্বচ্ছন্দ হতে পারছিল না অসীম। বিপ্লব যখন স্কুলে পড়ে, তখন সে অসীমের ব্যক্তিগত ছাত্র ছিল। নামে সে বিপ্লবের প্রাইভেট টিউটর হলেও সম্পর্কটা ছিল প্রায় বন্ধুর মত। মাঝে মাঝেই নিজের একান্ত ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে বিপ্লব ছুটে আসতো অসীমের কাছে। বই পড়তে পাগলের মত ভালোবাসে বিপ্লব। শেষবার অসীমের কাছ থেকে জোসেফ হেলারের 'ক্যাচ টোয়েন্টিটু' নিয়ে গেছে বিপ্লব।

এখনও ফেরৎ দেয়নি। সেদিন বসন্ত কেবিনে বিপ্লবকে দেখে প্রথমেই সেই কথাটা মনে পড়েছিল অসীমের। কাছে গিয়ে জিগ্যেসও করেছিল—কিরে, বইটা পড়া হল? অনেকদিন আসিস না! বই প্রসঙ্গে কোনো কথা না বলে বিপ্লব বলেছিল—আরে, অসীমদা এসো এসো, বোসো। টেবিলের উল্টো দিকের চেয়ারে বসে থাকা অপালাকে দেখিয়ে বিপ্লব বলেছিল—এর নাম অপালা। আমার ক্লাশমেট। আমি ক্লাশে যাই না বলে তখন থেকে হেজাচ্ছে!

—কি করছে? বলতে বলতে বসে পড়েছিল অসীম। খিল খিল করে হেসে উঠেছিল অপালা—ওটা আমাদের নিজেদের ভাষা! হেজানো—মানে বোর করা আর কি! দেখুন না, তিন চার মাস ধরে বিপ্লব কিছুতেই ক্লাশে যাচ্ছে না। অথচ রোজ কলেজের ক্যান্টিনে আড্ডা দিতে আসে। আমি ওকে ক্লাশে আসতে বলছি বলে খালি রেগে যাচ্ছে, সমানে আমাকে এডুকেশন সিস্টেমের অর্থহীনতা বুঝিয়ে যাচ্ছে তখন থেকে; কোনো মানে হয়? ক্লাশ করবি না তো কলেজে ভর্তি হলি কেন? এত ভালো ছেলে, শুধুমুদু কেন যে এত নেশা করে—

—নেশা? বলে একটু ঝুঁকে বসেছিল অসীম।

—কি হচ্ছে কি? একটু লাজুক ভঙ্গিতে বিরক্তি মেশানো গলায় বিপ্লব বলেছিল—অসীমদাকে এসব আজেবাজে কথা বলছিস কেন?

—আজেবাজে হতে যাবে কেন? বেশ ঝেঁজে উঠেছিল অপালা। শ্যামবর্ণা হলেও অপালার মুখশ্রী খুব মিষ্টি। রেগে গেলেও তাকে কিছুতেই তেমন কঠিন কিংবা অসুন্দর দেখায় না।—কলেজের সবাই জানে তুই আজকাল চব্বিশ ঘণ্টা নেশা করিস, দিনের পর দিন ক্লাশে যাস না। বেশ গম্ভীরভাবে, চোখদুটো যথাসম্ভব বড় বড় করে, এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলল অপালা।

—কি নেশা করে? বিপ্লবের পাশে বসে অপালাকেই প্রশ্ন করে অসীম।

—কি নেশা করে না? উল্টে অপালা সোজাসুজি অসীমের দিকে তাকালো। আপনি বিপ্লবকেই জিগ্যেস করুন না। পাশেই তো বসে আছে।

অস্বীকার করার আর কোনো চেষ্টা করেনি বিপ্লব। নিরুত্তরম্ সম্মতি লক্ষনম্—ভঙ্গিতে নিশ্চুপ বসেছিল সর্বক্ষণ। অসীম আর অপালা, বিপ্লবের দিনযাপন পদ্ধতির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা ও সমালোচনা চালিয়ে গিয়েছিল অনেকক্ষণ। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই বিপ্লব নাকি খানিকটা বাংলা কিংবা চোলাই মদ খেয়ে নেয়; তারপর কলেজ হোস্টেলে এসে গাঁজা, চরস ইত্যাদি; ইদানীং

হেরোইন পর্যন্ত শুরু করেছে। অথচ পড়াশোনার ব্যাপারে এমনিতে বিপ্লব অত্যন্ত পপুলার সবাই তাকে নির্দ্বিধায় গভীরভাবে ভালোবাসে। তার ব্যবহার অত্যন্ত মার্জিত, কারও সঙ্গে সে উত্তেজিতভাবে কথা বলে না। সবায়ের সব বক্তব্যই সে বেশ ধৈর্য্য নিয়ে শোনে। এমনিতে সে বেশ রোগা কিন্তু তার মুখে সবসময় একধরনের অপাপবিদ্ধ সরলতা খেলা করে, এবং তার মাথায় ছিল মাথাভর্তি ঘন কোঁকড়ানো চুল, যার জন্যে তাকে আরও ভালোবাসবার যোগ্য মনে হত। ইদানীং নেশা করার কারণে সে আলোচিত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে আরও বেশী—কারণ কেউই চায় না বিপ্লবের মতো মেধাবী ছাত্র নেশা করে নষ্ট হয়ে যাক; প্রায় কেউই বিশ্বাস করতেই চায় না যে বিপ্লব সত্যিই এত নেশা করে এবং আজ অপালাই বিপ্লবকে জোর করে ধরে এনেছে বসন্ত কেবিনে শুধু তাকে ভালো করে বোঝাবার জন্যে যে, নেশা করাটা তার ছেড়ে দেওয়া উচিত। মজার কথা এই যে বিপ্লব সব কথাই নীরবে, বিনা প্রতিবাদে, শুনে যাচ্ছে আর মাঝে মাঝে বলে যাচ্ছে—হ্যাঁ, ঠিকই, সত্যি—ঠিক বলছিস্। শুধু অসীম আসার পর বিপ্লব আড়ষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল বেশ একটু, অপালার ক্রমাগত অভিযোগের উত্তরে শুধু দু-একবার 'ধুৎ' আর 'সব বাজে কথা অসীমদা'—এইসব বলছিল। 'সব বাজে কথা'—বলবার সময় অপালা এমন বড় বড় চোখ করে তাকিয়েছিল, যে অসীমের বুঝতে কোনো অসুবিধে হয়নি, অপালা সত্যিই বিপ্লবকে গভীরভাবে পছন্দ করে, বিপ্লবের ভালো চায়।···কিন্তু সেদিন অপালা প্রসঙ্গে কোনো কথাই ওঠেনি, তার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে তাই অসীমের বিন্দুমাত্র ধারণাও নেই। ইতিমধ্যে এমন কি হতে পারে যে···বিপ্লবের সাম্প্রতিক নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়া নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল অপালা যে তার নিজের সমস্যা নিয়ে কোনো কথাই বলেনি সেদিন।

বসন্ত কেবিনে অপালার ঢোকবার এবং বসবার ভঙ্গিমা দেখে অসীমের মনে হল, অপালা এখানে নিয়মিত আসে, এবং বেয়ারারা সবাই তাকে চেনে; দুএকজন তো তাকে দেখে পরিচিত মানুষের হাসি উপহারও দিল। বসতে না বসতেই দু-গ্লাস জল দিয়ে চলে গেল, কি খাবে না খাবে জিগ্যেসও করল না; যেন জানাই আছে যে অপালা এখন অনেকক্ষণ বসবে।

বয়সে অনেক ছোট হলেও, এই ধরনের সঙ্গী অথবা সঙ্গিনী সঙ্গে থাকলে, মনে হয় যেন বেশ একটা চেনা জায়গায় এসে গেছি। আর কোনো অসুবিধে হবে না। বিশেষত সারাদিন অফিস করার পরে। জায়গাটা যে অসীমের

চেনাজানা নয় তা তো আর বলা যাবে না। বসন্ত কেবিনে আড্ডা সবাই দিয়ে থাকে, বিশেষত কলেজে পড়ার সময়, অন্ততঃ কলকাতার ছেলেরা। কফি-হাউসেও যায়। কলেজে পড়ার দিনে অসীম যে কতজনকে কফি-হাউস প্রথম চিনিয়েছে। বিশেষতঃ মেয়েদের। একটু গ্রাম্য কাউকে দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে অসীম তাকে ধরতো—কফি-হাউসে যাস্‌নি কখনও? সে কি রে! ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে ঢুকতে দিল কেন? কফি-হাউসের প্রত্যেকটা বেয়ারাই তখন অসীমকে চিনতো। সে সব দিনের কথা···। এখন অপালার ভাবভঙ্গি দেখে হুড়মুড় করে নিজের কলেজ জীবনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে অসীমের। তখন অবশ্য এত নেশার চল ছিল না, ছেলেমেয়েদের মধ্যে সম্পর্কও এত সহজলভ্য বা স্বাভাবিক ছিল না। অন্তরঙ্গতা তো অনেক দূরের কথা। দৈবাং কারুর সঙ্গে কারুর হয়ে যেত হয়তো! এখন এরা যত সহজে তুই তোকারি করে হঠাৎ সম্পূর্ণ অচেনা অজানা কারুর সঙ্গে কথা শুরু করে দেয়, তখন এসব ভাবাই যেত না। শুধু পরীক্ষার আগে, নোট বিনিময়ের কারণে, কিছুদিনের জন্যে উধাও হয়ে যেত সব আড়ষ্টতা! এমনিতে, কারও সঙ্গে কথা বলতে গেলে, প্রস্তুতি নিতে, খবরাখবর নিতেই সময় লেগে যেত অনেক। —একটা কথা বলবো? জিগ্যেস করার পর খড়দহের একটা কালো মতন মোটাসোটা চশমা পরা গম্ভীর ধরনের মেয়ে অসীমকে বলেছিল—জাস্ট অ্যাজ আ ফ্রেণ্ড কিন্তু! সেই মেয়েটাই আবার পরীক্ষার আগে সাজেশানের জন্যে অসীমকে খুব···একদিন কথায় কথায় বলেছিল—অবাঙালী ছেলেদের অনেক ভালো লাগে আমার বাঙালীদের তুলনায়···

—আমি আর বাড়ি ফিরবো না, জানেন?

চিন্তায় ছেদ পড়ল অসীমের। অপালা কথা বলছে।

অপালা যে অত্যন্ত সরল, সেটা তার চুল দেখেই বুঝে নিয়েছে অসীম আগের দিনই। যাকে বলে চাইনিজ হেয়ার—জলপ্রপাতের ঢলের মত স্ট্রেট চুল সোজা নেমে গেছে কোমরের দিকে; কোনরকম কোঁচকানো ভাব পর্যন্ত নেই—গায়ের রঙ কালো হলেও শুধু ওই জন্যেই যেন, আর—হ্যাঁ, চোখের জন্যেও বটে—অপালার দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে ইচ্ছে হয় বার বার। অতিরিক্ত সারল্যের অভিক্ষেপ অনতিক্রমনীয়।

অন্যমনস্ক থাকার কারণে অসীম কথাটা ভালো শুনতে পায়নি। অপালাকে কথা বলা শুরু করতে দেখে, অপালা বলবে, অনেক কিছু বলবে—অসীম

জানতোই, না বললে আর হঠাৎ ডাকবেই বা কেন, বলবে বলেই তো, বলবার মতো কিছু আছে বলেই তো মাত্র একদিনের পরিচয়ের যাবতীয় বাধা উপেক্ষা করে তাকে ডেকেছে অপালা, যে অপালাকে সে কিছুই জানে না, চেনেও না—শুধু বুঝে নিয়েছে যে সে অত্যন্ত সরল ও সাংঘাতিক ; সরল হলেই যদিও খুব একটা সাংঘাতিক হয় না সাধারণতঃ কেউ ; সাংঘাতিক হলেই যে কেউ সরল হবে তারও অবশ্যই কোনো কারণ নেই ; কিন্তু অপালা যে দুটোই—সরল ও সাংঘাতিক, সেটা অপালার সঙ্গে একদিন কথা বলেই বুঝে গেছে অসীম ; আর, বুঝেছে বলেই আজ সে এককথায় রাজী হল অপালার সঙ্গে আসতে, একসঙ্গে বসতে—যদিও বিপ্লব, যে সেতুমাত্র, যে আর আগের মত নেই যেমন করে তাকে চিনতো অসীম, সেই অনেকদিন আগে—যখন সে তার ছাত্র ছিল ; সেই একদা ছাত্র এখন-নেশাখোর বিপ্লবকে উদ্‌ভ্রান্ত দেখে, আকুলভাবে ডেকে উঠতে দেখে,—বেশ ঘাবড়েই গিয়েছিল অসীম, রাজীও হয়ে গেছে অনেকটা—ওই—বলা যায় ঘাবড়ে গিয়েই—তাই, সেই অপালা বেশ খানিকক্ষণ কথা না বলে চুপ করে বসে থাকার পর, বিপ্লবের আসার অপেক্ষায় আর না থেকে,—হঠাৎ কথা বলা শুরু করে দিতে, প্রথমে ঠিক বুঝতে পারেনি অসীম, দেখতে পেয়েছে শুধু ঠোঁট নাড়া। শুনতে পেয়েছে শুধু শেষ শব্দটা,—'জানেন ?'

না শোনাটা চেপেই গেল অসীম। হাত দুটো টেবিলে রেখে একটু ঝুঁকে বসে বলল—কি হয়েছে তোমার বলো তো ? নির্ভয়ে বলো।

টলটলে চোখদুটো তুলল অপালা। দুঃখে চোখে জল আসে, অপমানে জাগে জ্বালা। অপালার চোখে দুঃখের সেই সজল ছায়া নেই, লেগে আছে হজম করতে বাধ্য হওয়া অপমানের তীব্র জ্বালার চাপা আলো।

—আমি আর বাড়ি ফিরবো না।

আবার ঠিক একই ভঙ্গিতে একই কথা বলল অপালা।

দুই

ট্রেন থেকে নেমে, রাত এগারোটা, লাস্ট ট্রেনের আগের ট্রেন, তারা তিনজন ছাড়া প্যাসেঞ্জার আর যারা নামলো তাদের অনেকেই ব্যাপারী, কয়েকজন নিত্যযাত্রী, দু-একটা মাতাল—অপালা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েই আড়মোড়া ভাঙলো বেশ সময় নিয়ে—তারপর, 'আহ্, কি সুন্দর চাঁদের আলো'—বলে ফাঁকা ধানক্ষেতের দিকে উদাস মুগ্ধ চোখে চেয়ে খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে পড়া

পাখির গলায় বলল—কতদিন পরে ট্রেনে চাপলাম। শুধু বাড়ি আর কলেজ, কলেজ আর বাড়ি। ধুস্! বিপ্লব ফস্ করে একটা বিড়ি ধরিয়ে গম্ভীর প্রাপ্ত-বয়স্ক ভঙ্গিতে বলল—তুমি আজকাল এত দূরে থাকো কেন অসীমদা? কি যেন নাম এই জায়গাটার?

—হরিপাল। বলে অসীম এগিয়ে পড়ল। বিপ্লব আর অপালাকে, তার কলকাতা ছেড়ে চলে আসার কথা, বিয়ে করার কথা, হরিপালে বাড়ি করার কথা, বৌয়ের ইস্কুলমাস্টারির জন্যে তার নানাবিধ অসুবিধের কথা, মায়ের অসুস্থতার কথা, পথে আসতে আসতে এবং বসন্ত কেবিনেও—অনেকবার বলেছে, অনেকবার না হলেও টুকটাক কথা বলার ফাঁকে অন্ততঃ বেশ কয়েকবার তো বলেইছে; এবং প্রত্যেকবারই, অত্যন্ত দ্রুত ভুলে গেছে ওরা অসীমের উত্তরগুলো—যদিও, টাকা জোগাড় করতে না পেরে, বিপ্লব যখন 'তারাপীঠ কারাপীঠ ছাড়, ওখানে এত কালীভক্তের ভিড়—ধুস্' বলে অপালার দিকে বিরক্ত মুখে তাকিয়েছিল, আর অপালা—'আমি কিন্তু কিছুতেই বাড়ি ফিরছি না' বলে অসীমের দিকে তাকিয়েছিল যখন বেশ আকুল ও আক্রান্ত ভঙ্গিতে—অসীম না বলে পারেনি—'তোমরা আমার বাড়ি যেতে পারো। বাইরে যাওয়াও হবে, খরচও নামমাত্র। টাকা যখন কম।' বলতেই 'হুররে' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল বিপ্লব, বসন্ত কেবিনের চা-আড্ডার কয়েকজন লোক যে সে চিৎকার শুনে ফিরে তাকায়নি তা নয়। এমনকি ক্যাশকাউণ্টারের উদাসীন বৃদ্ধটি পর্যন্ত; বিপ্লব অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে শান্ত হয়ে গেল, নিচু গলায় বলল—কিন্তু, তুমি তো আমাদের পাড়াতেই থাকো, আউটিং হবে কি করে? তারপর থেকে অসীম অনেকবার বলেছে সে হরিপালে থাকে, বৌ হরিপাল স্কুলে চাকরি করে বলেই শস্তায় জমি কিনে বাড়িও করে ফেলেছে অসীম ওই হরিপালেই—জায়গাটা তারকেশ্বরের কয়েকটা স্টেশন আগে—অথচ প্রত্যেকবারই ওরা কি অসামান্য ক্ষিপ্রতায় ভুলে গেছে, ভুলে যেতে পেরেছে সব উত্তরমালা; যে, অসীম বিস্মিত না হয়ে পারেনি। কলকাতার মাটিও কথা বলে—এই প্রবাদটা সে জানতো, কিন্তু কলকাতার ছেলেমেয়েরা কেউ যে কিছু শোনে না আজকাল, আর শুনলেও যে সঙ্গে সঙ্গে সব ভুলে যায়—অসীম এতটা জানতো না।

—ও হ্যাঁ হ্যাঁ, হরিপাল। অপলা বলল—কি একটা প্রোভার্ব বলছিলেন যেন আপনি, সব দুঃখ—

—প্রোভার্ব নয়। অসীম বলল, এখানকার একটা স্থানীয় কথা। সব দুঃখ

হরিপাল দিয়ে চলে যায়!

—কথাটার মানে কি? বিপ্লব জিগ্যেস করল গম্ভীরভাবে।

—সেটা বুঝতে গেলে অন্ততঃ একবছর হরিপালে থাকতে হবে। অসীম বলল।

—একরাত্রি থাকলে হবে না? অপালার সরল প্রশ্ন।

—সেটা তোমার কপালের ব্যাপার আর হরিপালের হাতযশ। বিপ্লব বলল।

—হরিপালের আবার হাত কোথায় যে হাতযশ থাকবে? অপালা বলল।

—রাজা হরিপালের ছিল! ফিসফিস করে বলল অসীম। হরিচরণ পাল বলে এখানে একজন ছোটখাটো রাজা ছিল, তার নামেই—। এ কথাগুলো বেশ জোরে জোরেই বলল অসীম।

—রাজা? বলে গুনগুন করে উঠল অপালা—আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে···। তারপর হঠাৎ বলল—মা এত খারাপ ব্যবহার করল হঠাৎ! ধুর—আবার সব মনে পড়ে গেল। অসীমদা, আমাকে পেয়িং গেস্ট রাখবেন? ধুর—কলকাতা থেকে বড্ডো দূর।

—আমারও প্রথম প্রথম তাই মনে হত। অসীম উত্তর দিল। হরিপাল স্টেশনে এত রাতে এই ধরনের ছেলেমেয়ে কেউ সাধারণতঃ ট্রেন থেকে নামে না। স্টেশন রোডের দু-একটা পানের দোকান, ওষুধের দোকান, মিষ্টির দোকান, এখনও খোলা। তারা চিড়িয়াখানার জন্তু দেখার চোখে অপলা আর বিপ্লবকে দেখছে। অসীমকে তারা চেনে। কিন্তু আলোকপ্রাপ্ত এলাকার এই দুই প্রাঞ্জল তরুণ-তরুণীকে এত রাতে এমন খোলামেলা ভঙ্গিতে হেঁটে যেতে দেখে তাদের আর বিস্ময়ের শেষ নেই। মফঃস্বলের এই এক মুশকিল। অসীম এইসব দোকানদারদের অনেককেই চেনে বলে তার একটা অদ্ভুত ধরনের আড়ষ্টতা হচ্ছিল।

সিনেমাতলার মোড় থেকে ডানদিকে যেতে হবে। ব্রাহ্মণপাড়ার পেছনদিকে মাঠের ধারে অসীমের বাড়ি। সেদিকে যেতে যেতে অপালা বলল—তোমাদের বাড়িটা কি পৃথিবীর শেষ প্রান্তে, অসীমদা?

অসীম অল্প চমকে উঠল মনে মনে। অপালা এতক্ষণ আপনি করে বলছিল তাকে। এই প্রথম তুমি করে বলল অপালা। স্ত্রী ছাড়া আর কেউ তাকে তুমি বলেনি অনেকদিন।

—তোমাদের পৃথিবী কত ছোট! বলতে বলতে ঘুমন্ত অন্ধকার ছোট্ট শাদা একতলা বাড়িটাকে জাগাবার চেষ্টা করল অসীম, কড়া নেড়ে।

মনে মনে ভাবতে লাগল, বিপ্লব আর অপালাকে সে হঠাৎ নিজের বাড়িতে টেনে আনতে গেল কেন? তা কি কেবলই অপালার দুঃখে তার হৃদয় গলে গেছে বলে? অপালার একনিষ্ঠ প্রেমিক সঞ্জয় কোনো অজ্ঞাত কারণে তাকে হঠাৎ পরিত্যাগ করেছে বলে অত্যন্ত অস্থির ও চঞ্চল জীবনযাপন করছে ছিন্নমূল একজন অপালা—তাতে অসীমের কি! নিজের কড়া হেডমিস্ট্রেস মাকে নিয়ে অপালা দেখা করতে গিয়েছিল সঞ্জয়ের সঙ্গে তার হোস্টেলে—সঞ্জয় নাকি তার মাকেও অত্যন্ত অবহেলা করেছে। তাতেই বা অসীমের কি! সে তো দুদিন আগে অপালাকে চিনতোই না। মায়ের সঙ্গে হঠাৎ চূড়ান্ত কথা কাটাকাটির ফলেই আজ সে…

দরজা খুলে দিলেন অসীমের মা। —আয়। এত রাত করিস কেন?

অসীম বিপ্লবদের দিকে ফিরে বলল—এসো।

তিন

—তোমাকে আর দুটি ভাত দি? ওমা, তুমি তো কিছুই খাওনি দেখছি। তখন থেকে শুধু ভাত নিয়ে নাড়ছো!

অসীমের মায়ের কথায় যেন হুঁশ ফিরল অপালার। বাস্তবিক, খেতে বসে আঙুল দিয়ে শুধু ভাত মেখে নাড়াচাড়াই করছিল অপালা। তার গভীর অন্যমনস্কতা অস্বীকার করার জন্যেই যেন সে বেশ জোর দিয়ে বলে উঠল—না না মাসীমা, আমি তো খাচ্ছি।

—ওর ভাতটা আমায় দিয়ে দিন মাসীমা। ও বোধহয় আজ আর পারবে না। বিপ্লবের বলার ভঙ্গিতে সবাই হেসে উঠল।

—তুমিই বা এমন কি পালোয়ান গামা হে? চেহারাটা তো একদম ল্যাকপেকে সিং। বৌমা বাড়ি নেই তাই বেঁচে গেলে এ যাত্রা। থাকলে তোমাদের দুজনকেই দিত বেষ্টী করে!

—জানেন মাসীমা; ভাত নাড়তে নাড়তেই অপালা বলল—আমার মাকে নিয়ে সঞ্জয়ের হস্টেলে দেখা করতে গেলাম, ও বলল—থুতু দিন, আমার গায়ে থুতু দিন, দিন, দিয়ে চলে যান! আপনার মেয়েকে আমি ভালোবাসতাম ঠিকই, কলেজে পড়ার সময় ওরকম প্রেম-ভালোবাসা অনেকেরই হয়। এখন

কলেজ শেষ, এখন আর কোনো···কথাটা শেষ করতে পারল না অপালা।

—কি তোমাদের অত প্রেম-ভালোবাসা বুঝি না বাপু! তোমার মেসোমশাই তো আমাকে তেল দাও গামছা দাও ভাত বাড়ো জামা কই গেঞ্জি কই—এসব ছাড়া আর কিছু বললই না কোনোদিন!

অপালার কথায় আবহাওয়া জটিল হয়ে যাচ্ছিল। এখন আবার খানিকটা হাল্কা হল যেন।

—হ্যাঁ তাই তো মেসোমশাইকে দেখছি না! বিপ্লব যেন দায়িত্ববান হয়ে উঠল হঠাৎ।

—সে তার সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে কোথাও যায় না সহজে। বৌমা বি এড পড়তে গেছে, হস্টেলে থাকতে হয়, ছেলের অসুবিধে হবে বলে আমি কটা দিন ওর কাছে আছি। তুমি আর একটা মাছ নাও?

—না না, না না। সজোরে মাথা নাড়ল বিপ্লব। আপনি, এত রাত্তিরে আবার এত কিছু করতে গেলেন আমাদের জন্যে—এসবের কিছু দরকার ছিল না।

—তা কি হয় বাবা। বাড়িতে লোক এলে···আমার শ্বশুরমশাই হঠাৎ হঠাৎ কলকাতা থেকে লোক ধরে আনতেন মাঝরাত্তিরে। আমার তখন···কত হবে···এই অপালার মতন বয়েস? না না, আরও কম। কাঁচা ঘুম থেকে উঠে রান্না করতুম। অসীম আর একটা মাছ নে?

—বেশী থাকলে দাও।

—কলকাতা থেকে এত দূরে এমন চমৎকার একটা আধুনিক বাড়ি, ঘরের মধ্যে বেসিন, কলতলায় শাওয়ার, এসব কি করে করলে অসীমদা? বিপ্লব বেশ সামলে নিতে চায়।

—অসীমদা, জানো, সঞ্জয় বলতো—হয় বিপ্লব করবো, নয়তো পাগল হয়ে যাবো, মাঝামাঝি ব্যাপারটা, মানে ওই সুস্থ মধ্যবিত্তদের মত বেঁচে থাকার কোনো মানে নেই। অপালা বলল।

—কেন? তাতে ক্ষতি কি! এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি, পরিধি, অসীমের ছোট বোন। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে গান শেখে। একটার পর একটা বিয়ের যোগাযোগ কেটে যাচ্ছে। মায়ের সঙ্গে ছায়ার মত লেগে থাকে সবসময়। গ্রাম্য কুমারীর কৌতূহলে সে এতক্ষণ লক্ষ্য করছিল অসীমের অতিথিদের।

—ক্ষতি মানে, লাভ নেই আর কি! অপালা বলল—বিপ্লবী আর পাগল

ছাড়া, আর সবায়ের ওপর, ও বলতো—শয়তানের একটা ছায়া পড়ে···

—শয়তানের ছায়া ? হি হি। হি হি। মুখে ভাত নিয়ে হাসতে গেল পরিধি।

—গলায় আটকে যাবে। অসীম শাসন করল বোনকে।

—আহা, অপালা। তারপর, তারপর ? তোর সেই মহান প্রেমিক আর কি বলতো ? বিপ্লব খুনসুটি করতে চাইল।

—তুমি কিন্তু সত্যিই কিছু খেলে না অপালা। এবার অনুযোগ করল অসীম।

—আমি পারছি না অসীমদা।

—ও রেস্টুরেন্টেও কিছু খেতে পারে না আজকাল। শুধু চা-টা খায়! বিপ্লব অভিজ্ঞতা জাহির করল অপালা সম্পর্কে।

—এভাবে তুমি কতদিন চালাবে অপালা ? এ প্রশ্ন অসীমের।

—এই নিয়েই তো মায়ের সঙ্গে যখন তখন···। শেষকালে এমন আজেবাজে কথা বলল মা। কিন্তু, আমি যে পারি না···

বাড়িতে এসেই, স্নান করেছে অপালা। স্নান সেরে বাথরুম থেকে বেরোতেই, অপালার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ না হয়ে পারেনি অসীম। এমনিতেই, স্নানের পর, সব মেয়েকেই একটু কোমল দেখায়। অপালার সোজা সোজা পিঠ ছাপানো চুল, সারা দিনের ক্লান্তির পর তার স্নানতৃপ্ত শরীরে—অপালা কেমন লাজুক চোখে অসীমের দিকে তাকিয়েছিল একবার। মুহূর্তের জন্যে হলেও, অসীমের সমস্ত চেতনায় কেমন একটা শিহরণ খেলে গিয়েছিল যেন।

—মা বাবা ছাড়া বাড়িতে তোমার আর কে আছে ? পরিধির সরল প্রশ্ন।

—ছোট্ট একটা ভাই আছে, খুব ভালোবাসে আমাকে।

—এই যে তুমি বাড়ি ছেড়ে চলে এলে তোমার ভাই তোমার জন্যে ভাববে না ?

—রোজ রাত্তিরে অনেকক্ষণ গল্প করে আমার সঙ্গে। আজ খুব···চুপ করে গেল অপালা।

—এই যে সবাই তোমাকে আহা উহু করছে, এসব তোমার ভালো লাগছে ? বাড়িতে থাকলে ভাইয়ের সঙ্গে সময় কাটাতে পারতে অন্ততঃ।

—তোমাদের হল ? আমি উঠছি অসীমদা।

—এই মেয়ে, এ ঘরে আমাদের সঙ্গে তোমার বিছানা করে দিচ্ছি। একটু

অপেক্ষা করো।

—বিছানা তো করে দেবেন। ঘুম বোধহয় আমার আর হবে না মাসীমা।

খাবার টেবিল থেকে উঠে ঘরের কোনের বেসিনে হাত ধুতে লাগল অপালা।

বিপ্লব বলল—তোমার ঘুম পাচ্ছে না অসীমদা?

পরিধি বলল—আপনার যে পাচ্ছে, সেটা আমরা বুঝতে পারছি!

অসীম বলল—তোকে আর পাকামি করতে হবে না। চল্।

চার

বাঁশতলা দিয়ে গেলে চাষীপাড়া। ওপাশে রেললাইন। লাইন ধরে ডানদিকে দশবারো মিনিট যেতে হবে। একপাশে ঝুপড়িতে ল্যাংড়া বৌদির ঠেক। ফেরার পথে রেললাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে বিপ্লব বলল—আজকের এই অলৌকিক রাতটা কাল সকালে কলকাতার ভিড়ে কোথায় হারিয়ে যাবে।

অসীম বলল—অলৌকিকের কি আছে? তোরা কলকাতায় থেকে, দু-চারটে ইংরিজি বই পড়ে, হাবিজাবি কবিতা লিখে—নিজেদের মানসিকতার এমন একটা কিম্ভুত চেহারা তৈরী করেছিস্—

—সে তুমি যাই বলো। এত রাতে, দু-পাশে এত গাছপালা, রেললাইনটা দূরে কোথায় হারিয়ে গেছে,—এমন ভয়ঙ্কর নিঃস্তব্ধতা—আর এই ঠাণ্ডা পেলব চাঁদের মিহি আলো—আমি তো বাস্তব জগতের বাইরে চলে এসেছি মনে হচ্ছে। এখন হয়তো এই রেললাইনের খোয়াগুলো পর পর জুড়ে জুড়ে হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াবে—আমাকে বলবে—এতদিন কোথায় ছিলেন—

—তোর মাথা আর আমার মুণ্ডু! অতটা চোলাই কোঁৎ কোঁৎ করে খেয়ে নিলি। তোর এখন অনেক কিছু মনে হবে।

—তুমি একটুও খেলে না কেন অসীমদা? ল্যাংড়া বৌদিকে কি সুন্দর দেখতে! উনি কি নিজের হাতেই তৈরী করেন মালটা? রোজ?

—হ্যাঁ।

—হেভি খেতে মাইরি। কলকাতায় সাপ্লাই করলে···

—তুই শুরু কর। অনেক পয়সা হয়ে যাবে তোর।

—আমি নেশা করতে চাই, নেশা নিয়ে ব্যবসা করতে চাই না! নিজে নেশা করলে আর নেশার জিনিস নিয়ে ব্যবসাও করা যায় না বোধহয়। আমি হলে তো নিজেই সব খেয়ে ফেলবো। হিসেব রাখতে পারবো না। ধুস্। বোরিং।

ওসবের জন্যে আলাদা ধক্ লাগে। তোমাকে ওরা মাস্টারমশাই মাস্টারমশাই করছিল কেন? তুমি তো স্কুলে পড়াও না।

—আমার বৌ পড়ায় তো! ও সকাল-সন্ধে অনেক টিউশানি করে। বৌ খুব কেমাস মাস্টারনি বলে আমাকেও ওরা মাস্টারমশাই করে নিয়েছে। এখানকার লোকেরা যে কোনো ব্যাপারকে খুব সরল করে নেয় খুব তাড়াতাড়ি!

—তুমি আপত্তি করোনি?

—প্রথম প্রথম করতাম। তারপর দেখলাম, সবাই ধরে নিয়েছে, আমি কলকাতার কোনো বড় ইস্কুলের মাস্টার!

—ল্যাংড়া বৌদির ওখানে যারা খাচ্ছিল, তারা সবাই কি ওই জন্যেই তোমায় অত খাতির করল?

—তা হতে পারে।

—আমার দিকে সবাই কেমন জুল জুল করে তাকাচ্ছিল। আচ্ছা, ওরা কি সবাই চাষাভুষো?

—সবাই নয়। সত্যনারানের মুদিখানা আছে। রবিন বাজারে চাল বেচে।

—আচ্ছা, তুমি নিজে খেলে না, অথচ আমাকে খাওয়াতে রাজী হলে কেন? অন্যদিন তো এত রাত ওব্দি নিশ্চয়ই জেগে থাকো না। ল্যাংড়া বৌদির ঠেকটাও তো তোমার বাড়ি থেকে বেশ দূরে। খেয়েদেয়ে উঠে তুমি এতটা হেঁটে—শুধু আমি একটু নেশা করতে চাইলুম বলে—

—তুই অতিথি।

—অতিথি!

বিপ্লব হি হি, হি হি করে—তারপর খিঃ খিঃ খিঃ খিঃ করে হাসতে লাগল। অসীম ঘড়ি দেখল। পৌনে একটা। অপালা কি ঘুমিয়ে পড়েছে?

—ওই যে গাছটা দেখছিস্, অসীম বলল—ওই যে গাছটার তলা দিয়ে আমরা যাবো, ওই গাছটায় তিন তিনটে কাঁচা বৌ গলায় দড়ি দিয়ে···

এসব কথার কোনো গুরুত্বই দিল না বিপ্লব। বলল—নেশা না করলে আমি আজকাল কিচ্ছু বুঝতে পারি না অসীমদা। যে মরে যেতে চায় সে মরে যাক। আমি বেঁচে থাকতে চাই শুধু নেশা করার জন্যে। যারা নেশা করে না তারা শালা হারামী। নইলে এই খচ্চড় বাস্তবটাকে সহ্য করতে পারতো না।···কি সুখে যে বেঁচে থাকে তারা আমি কিছু বুঝতে পারি না। একটার পর একটা লোক দেখি আর টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে তাদের মুখোশগুলো···

এতরকম মুখোশ পরে থাকে মানুষ···তুমি খুব ভালো লোক অসীমদা···আমাকে এত কষ্ট করে খাওয়ালে···

—তোর নেশা হয়ে গেছে।

—হ্যাঁ, বেশ হয়েছে। কাইন, কাইন বানায় কিন্তু তোমাদের ওই ল্যাংড়া বৌদি, কাইন।

বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়াল অসীম। জানলা দিয়ে ঘরের আলো এসে বাইরে পড়েছে। অপালা পায়চারি করছে ঘরে। তার ছায়ামূর্তি মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে জানলায়।

মফস্বলের নিঃঝুম মধ্যরাত ভরে যাচ্ছে অপালার গানে।

এখনও নিজেরই ছায়া কেন যে রচিছে মায়া।

এখনও কেন যে মিছে চাহি যে নিজেরই পিছে।···

কড়া নাড়ার আগেই দরজা খুলে দিল অপালা। বিপ্লবকে দেখেই ঝাঁঝিয়ে উঠল—অসীমদা দয়া করে আমাদের ডেকে আনল, আর তুই···ছি ছি ছি! ভাত খেয়েই মদ খেতে ছুটলি? ছোটলোক কোথাকার!

জামার ভেতর থেকে, পেটের কাছে গুঁজে রাখা একটা বোতল বের করে বিপ্লব বলল—তোর জন্যে এনেছি! চোঁ করে মেরে দে—সঙ্গয় কঞ্জয় সব ধুয়ে যাবে!

—তোকে কতদিন বলেছি, আমি ওসব পারি না। চাপা গলায় গর্জন করে উঠল অপালা—কোনো কথা নয়, সোজা বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড় বিপ্লব। অসীমদা অনেক সহ্য করেছেন। কত রাত হল খেয়াল আছে? কাল আবার অসীমদাকে এ্যান্দুর থেকে ট্রেন জার্নি করে অফিস যেতে হবে।

বিপ্লব চুপচাপ বোতলটা নিজের ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর একদম বাধ্য ছেলের মতন শুয়ে পড়ল গুটিসুটি মেরে।

বিপ্লবের পাশে নিজের বিছানায় অসীমও শুয়ে পড়ল দেখাদেখি। যেন তাকেও যে কোনো মুহূর্তে অপালার বকুনি খেতে হতে পারে।

মশারি টাঙানোই ছিল। আলো নিভিয়ে দিয়েছে অপালা। জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না আসছে। বাড়িটা যেন তারই, এইভাবে ঘরের মধ্যে জ্যোৎস্নার আবছায়ার ভেতর মৃদুমন্দ পায়চারি করছে অপালা।

অপালার ধীর পায়চারি দেখতে দেখতে, কিছুক্ষণ পর, মশারির ভেতর থেকে অসীম বলল—এইভাবে আহারনিদ্রা ত্যাগ করে তুমি কতদিন বেঁচে থাকবে অপালা।

অপালা কোনো উত্তর দিল না। বেশ কিছুক্ষণ একইভাবে পায়চারি করার পর বলল—সঞ্জয় তো শিশু নয়! শিশু হলে মানুষ করা যেত। শিশুদের মানুষ করা যায়। কিন্তু, বিপ্লবকে মানুষ করা যায় না, পাগলকে মানুষ করা যায় না।

বিপ্লব নাক ডাকতে শুরু করেছে। অসীম বিরক্ত হয়ে বলল—কি এমন আহামরি বিপ্লব করেছে সঞ্জয়? তাছাড়া, সে পাগলই বা হতে যাবে কেন? তোমার মত মেয়েকে যে রিফিউজ করে সে শয়তান এবং মূর্খ হতভাগ্য!

—না না। প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলল অপালা—নিজের অনুভূতিকে সে তো গোপন করেনি, সে কেন শয়তান হতে যাবে! সঞ্জয় তো আমার সঙ্গে কোনো চালাকি করেনি। তিনবছর পর একদিন হঠাৎ 'না' করে দিয়েছে। সেই না-টা আমি সহ্য করতে পারছি না ঠিকই, কিন্তু…।

—তুমি অন্য কাউকে…

—না না। আর হয় না অসীমদা। সঞ্জয়ও কিন্তু অন্য কারুর সঙ্গে কিছু… আমাদের আপনি অত শস্তা ভাববেন না প্লিজ।

—কিন্তু এভাবে কি তুমি শুধু পায়চারি করবে সারারাত? সারাজীবন?

এবার অপালা বিছানার ধারে চলে এল। মশারিটা তুলে, অসীমের মাথার পাশে বসে, তার চুলে হাত রেখে বলল—এক্সট্রিমলি সরি। তোমাকে ডিস্টার্ব করে ফেলছি হয়তো, কিন্তু অসীমদা, বিশ্বাস করো—আমি যে ঘুমোতে পারি না…

উপুড় হয়ে শুয়ে অপালার হাতটা ধরে ফেলল অসীম। গভীর আবেগে তার হাতটা চুম্বন করতে করতে বলল—তুমি ভালো থাকো অপালা। তুমি ভালো থাকো অপালা। তুমি…

—চেষ্টা করবো। একইরকম ফিস্ ফিস্ করে বলল অপালা। সন্তানকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে, এভাবে অসীমের মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে উঠে গেল।

অসীম দেখল, বেসিনে হাত ধুচ্ছে অপালা।

পাঁচ

পরের দিন, অফিসে বসে, বিকেলে, হাতের কাজ সেরে, স্ত্রীকে চিঠি লিখছিল অসীম। লিখছিল মানে, লেখার চেষ্টা করছিল; লেখা হচ্ছিল না কিছুই।

সকাল সাড়ে আটটায় হরিপাল লোকাল। অসীম পৌনে আটটার মধ্যে

ভাত খেতে বসে গেল দেখে, বিপ্লব আর অপালার কি হাসি।—তুমি এখন ভাত খাবে অসীমদা? এই সাতসকালে?

—আমাদের উপায় নেই। প্রথম প্রথম আমারও মনে হত, এত সকালে কি ভাত খাওয়া যায়! এখন সব অভ্যেস হয়ে গেছে। কৈফিয়ৎ দিল অসীম।

—তোমরাও দুজনে দু-মুঠো খেয়ে নাও না। সারাদিন তো টো-টো কোম্পানি করে বেড়াবে।

—না মাসীমা, বিপ্লব বলল—আমরা শুধু চা খাবো। আর টোস্ট খেতে পারি।

—তাহলে অন্ততঃ পরোটা খাও। আজ তুমি বাড়ি যাবে তো অপালা?

—না মাসীমা। আগে কলেজে যাবো।

—রাত্রে তাহলে আসবে তো? ঠিক করে বলে যাও, রান্না করে রাখবো ভালো করে। কাল তো কিছু খেলেই না।

—না না; বিপ্লব বলল—আমাদের কোনো ঠিক নেই। আজ হয়তো অন্য কোথাও যাবো। রোজ এক জায়গায় আমাদের ভালো লাগে না!

—কি জানি বাবা! তোমাদের কিরকম মতিগতি!

ট্রেন যখন কামারকুণ্ডু পেরিয়ে যাচ্ছে, অসীম বলল—এখানে ওপরে নিচে দুটো লাইন। নিচের ওই লাইটা বর্দ্ধমান চলে গেছে। কর্ড।

অপালা সঙ্গে সঙ্গে বলল—সঞ্জয় তাহলে ওইখান দিয়ে বাড়ি গেছে। আসানসোলে…

বিপ্লব বলল—মাইরি, পারিস তুই। প্রত্যেক মুহূর্তে খালি সঞ্জয় সঞ্জয় সঞ্জয় …একবার অন্ততঃ অন্যকিছু বল।

জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে গুনগুন করে উঠল অপালা।

আকাশে উড়িছে বকপাতি…

অসীম ইনল্যাণ্ড লেটারটা টেবিলে রেখে ভাবতে লাগল, এসব কিছুই লেখা যাবে না সুষমাকে। শুনলেই নানারকম কদর্থ করবে, বলা যায় না, কেলেঙ্কারিও করতে পারে। ওর যা মেজাজ। সারাদিন ছাত্রী ঠেঙিয়ে…

চিঠি লেখার আশা ত্যাগ করে অসীম ঠিক করল, আজ বাড়ি ফিরে মাকে আর পরিধিকে বলে দিতে হবে, অপালারা এসেছিল, এসব কথা সুষমাকে না বলাই ভালো।

অপালা হলে সঞ্জয়কে নিশ্চয়ই সব বলতে পারতো।

সঞ্জয় ঠিকই বলেছে অপালাকে।

পাগল আর বিপ্লবী ছাড়া, আর সব মধ্যবিত্ত মানুষের মনে, শয়তানের একটা কালো ছায়া পড়ে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বসে একটা সিগারেট ধরালো অসীম।

একরাত্রির জন্যে অতিথি হয়ে এসে, অসীমের ভেতরের শয়তানটাকে চোখে আঙুল দিয়ে চিনিয়ে দিয়ে গেছে অপালা।

এখন আর অসীমের কোনো উপায় নেই।

হলুদ ট্রেন

'কোন্ ট্রেন ?' বলে বর্মনদা, বাঁ হাতে বাজারের থলে, ডান হাতটা সবজিঅলার দিকে বাড়ানো, আমার দিকে ফিরে তাকায়। 'দেখি, কোন্‌টা পাই। বাজারে বেরোলে কোন্ ট্রেন পাবো, বুঝতে পারি না।' কথাটা যতক্ষণ আমি বলি, ততক্ষণে সবজিঅলা বলেছে—'খুচরো হবে না বাবু, লংকা দিয়ে দিই ?' বর্মনদা যেন দুজনকেই উত্তর দেয় একসঙ্গে—'কেন, তা কেন !'

সবজিঅলা লংকা ওজন করতে করতে বলতে থাকে—'কেন, তার আমরা আর কি জানবো বলুন !' আমি বলতে থাকি—'আপনাদের মতন অতটা পারি না ! ঘুম থেকে উঠেই কি করে যে আপনারা ভরপেট্টা ভাত খান—আমার তো বেলা বারোটার আগে খিদেই পায় না !'

বাজারের থলে এগিয়ে দিয়ে লংকা নিয়ে বর্মনদা আবার যেন দুজনকেই উদ্দেশ্য করে বলে: 'এসব তো ভালো কথা নয়! আচ্ছা ভাই, আসি। আমাদের আবার একদম ধরাবাঁধা লাইন দিয়ে চলতে হয়। কোথাও এক মিনিট বেশী দাঁড়াবার উপায় নেই। পরের ইস্টিশানের প্যাসেঞ্জার ঝামেলা করবে! এই ছাকো না—ঘড়ি দেখে দেখে নিজের চেহারাটাই কেমন ঘড়ির কাঁটার মতন করে ফেলেছি ! আচ্ছা।'

আর দাঁড়ালেন না। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা আটটা বত্রিশের জন্যে ঠিক আটটা তিরিশে স্টেশনে ঢোকে বর্মনদা। সিড়িঙ্গে লম্বা, কিন্তু অস্বস্তিকররকম সোজা, কথা বলতে হলে ঘাড় উঁচু করে বলতে হয়; তুলনায় অনেক বেঁটে লোকেরাও একটু না একটু কুঁজো যেন। ট্রেন এলে একটা নির্দিষ্ট কামরায় একদল নির্দিষ্ট লোকজনের মধ্যে পৌঁছে যায় বর্মনদা, বসতেও পেয়ে যায় ঠিক! ফেরার গাড়িরও

কোনো নড়চড় দেখিনি কোনদিন। 'রোজ কি করে একই গাড়িতে ফেরেন? বেরোবার ব্যাপারটা না হয় নিজের হাতে! জ্যামেও পড়েন না?' একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম। তা বর্মনদা বলে কি—'বাসে তো উঠি না! আমার লম্বা লম্বা এগারো নম্বর খুব ফেথফুল! আর তোমাদের কলকাতার বাস, ওসব হল ভদ্দরলোকের জিনিস; আমি অতটা ভদ্দরলোক নই ভাই। উঠতেই পারি না। মাথায় ঠেকে।'

সব কাজেই আমার বেশ খানিকটা দেরী হয়ে যায়। দাড়ি কামাবার পর দেখি পরপর দুবার কামাবার পরেও কি করে যেন দুটো একটা দাড়ি ঠিক অক্ষত থেকে যায়! বাজার থেকে ফিরে দেখি খুব দরকারী জিনিসটাই হয়তো আনা হয়নি। ধরিত্রী আজকাল লিখে দেয়। ছোট্ট চিরকুট দেখে মিলিয়ে মিলিয়ে জিনিস কিনতে দেখে ব্যাপারীরা লুকিয়ে হাসে, আমি জানি। তবু আমাকে নিয়ে ব্যাপারিদের মধ্যে একটা গোপন কাড়াকাড়ি আছে। ঘুরে ঘুরে কেনার বদলে আমি যার কাছ থেকে জিনিস কেনা শুরু করি তার কাছ থেকেই প্রায় সব কিছুই কিনে যাই পর পর। ধরিত্রী এটাকে আমার অহেতুক ভালোমানুষি মনে করে। 'এই সুযোগে সবাই যে কি নির্মমভাবে ঠকায় তুমি বুঝতে পারো না!' ধরিত্রীর ধারণা, আমাকে দেখলেই দোকানদারেরা বুঝতে পারে—এই সেই লোক, যাকে ঠকাবার জন্যে আমি দোকান খুলে বসে আছি। উত্তরে একদিন শুধু বলেছিলাম: 'আমাকে প্রথম দেখে তুমিও কি তাই ভেবেছিলে!' ধরিত্রী বড় বড় চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেছিল—'আমি দোকানদার হলে তোমার মতন আতা লোকের বদলে বেশ শাঁসালো একটা খদ্দের দেখতাম।' অপমানটা শান্তভাবে হজম করে বলতে চাই—মেয়ে মাত্রেই দোকানদার। আরো খারাপ কিছু যদি শুনতে হয় সেই ভয়ে বলা হয়নি।

সারা এলাকার প্রায় সব লোক জানে, আমি রোজ ট্রেন ফেল করি। ট্রেনদের সঙ্গে আমার কোনো গোপন চুক্তি আছে যেন, আমাকে দেখলেই হুস্ করে পালিয়ে যাবে তারা। স্টেশনে যাবার পথটা একটা মাঠের মধ্যে দিয়ে শর্টকাট করা যায়। সিনেমাতলার মোড় দিয়ে ঘুরে বাসরাস্তা দিয়ে স্টেশনে যেতে হলে কোনোদিনই ট্রেন পাই না। মাঝখানে আমতলা দিয়ে নেমে তিনঘরের সাঁওতাল পাড়ার পাশ দিয়ে একটা ছোট মাঠ—আড়াআড়ি আলপথে মাঠটা পেরোলেই ইস্টিশান। প্রায় দিনই মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাই—হলুদ ট্রেন আমার সারা সকালের প্রস্তুতি আর সারাটা দিনের ব্যস্ততা তছনছ

করে দিয়ে কেমন আরামে নিশ্চিন্ত মনে নিষ্ঠুরের মতন চলে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে সবুজের আড়ালে। দেখতে দেখতে বেশ অসহায় লাগে। চুল আঁচড়ানোর সময় আর একটু কম নিলেই হত। কিংবা চান করার সময় যদি দু'বালতি জল কম ঢালতাম! স্রেফ দু-বালতি কম ঢাললেই হয়তো ধরে ফেলতে পারতাম হরিপাল লোকাল। আমরে স্বপ্নের শহরে যাবার স্বপ্নের রেলগাড়ি। পরের গাড়িগুলোয় যা ভিড়! সারা রাস্তা দাঁড়িয়েই যেতে হয়। যেদিন না পাই, সেদিন ওই অসম্ভব বিরক্তিটা উপহার দিয়ে হেলে দুলে চলে যায় হরিপাল লোকাল। নিজের অপদার্থতার জন্য সারা পৃথিবীর ওপর রাগ হয়। আবার ভালোও লাগে। সকাল সাড়ে আটটায় মফস্বলের এই ধানক্ষেতময় পৃথিবীতে বেশ মনোরম চারপাশ। সবুজ গাছপালার মধ্যে একটা হলুদ ট্রেন যখন হেলেদুলে হারিয়ে যায়—নীল আকাশের নিচে সে দৃশ্যের যে প্রশান্তি, তাকে উপেক্ষা করা যায় না কিছুতেই।

ভাগ্যিস্ ধরিত্রী বনগাঁ লাইনে চাকরি পায়নি! তাহলে যে কি অবস্থা হত—সেসব ভেবেই এত দূরের হরিপাল, এত সকালের ফাঁকা হরিপাল লোকাল—এ সবের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেলাম। গরম পড়েছে বলে এখন ধরিত্রীর স্কুল মর্নিংয়ে। যাবার আগে আমার ভাত-ডাল এত সকালে তবু ঠিক করে দিয়ে যায়। উঠতে ইচ্ছে না করলেও, চক্ষুলজ্জায় শুয়ে থাকতে পারি না বেশীক্ষণ। ধরিত্রীকে এগিয়ে দিতে হয় টুকটাক জিনিসপত্র।

'দিদিমণির তো লেট দেখি না একদিনও। আপনি রোজ গাড়ি ফেল করেন কেন?'

সিগারেট নিতে শ্রীহরির দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছি; আয়নার দেখে নিচ্ছি মুখের ওপর থেকে সকালের প্রসন্নতাটা কতটা গলে গেছে বা আদৌ গেছে কিনা—পাশ থেকে তারক বললো। 'দশ মাইল দূর থেকে বাসে এসে লোকে গাড়ি ধরে নিচ্ছে।'

'তাতো ধরবেই!'

'স্টেশন ধারে বাড়ি হলে এই হয়।' তারক বললো।

'দাদার ব্যাপার আলাদা।' এবার শ্রীহরি।

'কি আবার ব্যাপার?' বেশ অবাক হই। কি বলতে চায় শ্রীহরি?

'যে পাইয়ে দেয় সে নিজে পায় না, জানেন তো? যে ধইরে দেয় সে নিজে ধরতে পারে না!'

হাহা করে হাসে তারক। 'দিদিমণি ঠিক সময় ধরে ফেলছে যা ধরার—আর দাদামণি সব সময় ফেল!'

'হ্যাঁ মাইরি!' তারকের হাসি হাসি মুখ দেখতে দেখতে বলি—'গিন্নি বেরিয়ে গেলে আমি আর একবার গড়িয়ে নিই। এই উঠবো এই উঠবো করে রোজ দেরী হয়ে যায়!'

'সেই কথাই তো বলছি—ঘরে থাকলে ঠিক ঠেলে তুলে দিত! আপনি ঠিক সময় বেরিয়ে ঠিক ঠিক ধরতে পারতেন যা ধরার।' বলেই মুখে পান পুরে দেয় তারক। তার চোখে যে কৌতুক, তাকে খুব শ্লীল বলা যায় না।

স্মল সেভিংসের এজেণ্ট। সারাদিন গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বেড়ায় তারক। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে লোকের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ জমানোর অভ্যেস করেছে। কথা চালাতে চালাতে একটু ঘনিষ্ঠতা হলেই তার এলাকায় একদিন হট্‌ করে চলে গিয়ে দু-চারটে কেস করে নিয়ে আসতে পারে। এমনিতে খারাপ লাগে না। আজ বেশ অস্বস্তি হল। ট্রেন ছেড়ে দেবার পর দু-তিনটে বাস ভিড় বোঝাই হয়ে খানাখন্দের ওপর দিয়ে হেলেদুলে স্টার্ট নেয়। তারই একটার দিকে 'চলি দাদা, আবার দেখা হবে' বলে ছুটে যায় তারক।

ধীরে সুস্থে সিগারেট ধরাই একটা। অন্যের ব্যাপারে এই সরবে নাক গলানো—এটা একটা যে কোনো মফস্বল শহরের প্রায় অনিবার্য ও প্রত্যক্ষ চরিত্র। রাস্তায় চেনাজানা কারুর সঙ্গে দেখা হলেই 'কি ব্যাপার' বলে শুরু হবে। কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, কি দরকার, ইত্যাদি বিশদ ব্যাখ্যা শুনে পরিতৃপ্ত হলে তবেই ছুটি। অবশ্য এর অনেক ভালো দিকও আছে।

প্ল্যাটফর্ম যেখানে শুরু হয়েছে তার বাঁদিকে রেলিঙের গায়ে শ্রীহরির পান-সিগারেটের দোকান। লুঙ্গি আর ময়লা ছেঁড়া স্যাণ্ডো গেঞ্জি গায়ে শ্রীহরিকে অভ্যস্ত হাতে পান সাজতে দেখলে কে ভাববে তার একটা রীতিমত আম-বাগান আছে। ধানজমিও যে দু-চার কাঠা নেই তা নয়। তবে তাতে তেমন বিশেষ সুবিধে টুবিধে হয় না। মাঠের কাজেই তবু দিন মোটামুটি কেটে যেত। জমিতে মই দিতে গিয়ে একদিন হঠাৎ বাঁপায়ের ডিমের কাছটা এমন টান ধরলো—ভালো করে দাঁড়াতেই পারে না আর। এতদিনকার বিশ্বস্ত পা এমন বেইমানি করছে দেখে বেশ বিগড়ে গেল শ্রীহরি! তিন দিনের মধ্যে জায়গা বেচে পান-বিড়ির দোকান। এখন তার ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হয়, এ দোকান তার অনেকদিনের, যেন অনেক জন্মের।

লাইনের ওপারে বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়। আজ বোধহয় ইলেকশন। কয়েকটা ছেলে হাতে মাইক নিয়ে তৈরি হয়ে নিচ্ছে। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে গোছগাছ চালাচ্ছে বোধহয় বিপক্ষ ইউনিয়ন। মাঝখান দিয়ে কেউ গেলেই দুদিক থেকে তার দিকে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে দুরকম লিফ্‌লেট। হ্যাণ্ডমাইক নিয়ে তারস্বরে চিৎকার তো চলছেই। ব্যস্ততা বাড়বে ট্রেন এলে। ইলেকশন থাক আর নাই থাক, ষ্টেশনে ট্রেন না ঢুকলে বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয় নিষ্প্রাণ ইঁট-চুন-সিমেণ্ট বালি দিয়ে গাঁথা জনশূন্য বেকার কোঠাবাড়ি।

ইস্টিশান ঘরের কাছে শেডের নিচে টি-ষ্টলের সামনে ছোটখাটো ভিড়। লেডিজ ওয়েটিং রুমের সামনেও পায়চারি করছে কয়েকজন, তাদের চোখমুখ অসম্ভব উদাসীন ও গম্ভীর। আশপাশ থেকে একটি দুটি করে লোক আসছে টুকটুক করে আর ষ্টেশন চত্বরের ভিড় বাড়ছে। ক্রমশ এক সময় বেশ বুঝতে পারা যায় এবার ট্রেন আসবে। অনেকজন মানুষের একমুখী অপেক্ষা ততক্ষণে বেশ ঘন হয়ে ওঠে।

দূরত্ব কম বা বেশী যাই হোক না কেন, ট্রেনের কামরার ভেতরকার সময়কে কখনোই মারাত্মক দুঃসহ লাগে না ভেতরে অনেক জীবন্ত উপস্থিতি চারপাশে সবসময় আছে বলে। থাকে বলে। তাদের ভেতর থেকে নিরন্তর কেউ না-কেউ বার বার নেমে যায়, কেউ-না কেউ কেবলই উঠে উঠে আসতে থাকে। তারা তবু, আসলে, প্রথম থেকে শেষ অবধি সব মিলিয়ে এক ধরনের নিঃসঙ্গতা-ভেদী জীবন্ত উপস্থিতি হয়ে জেগে থাকে। এমনকি, এই যে আমি এখন সেই সম্মিলিত জীবন্ত সত্তাটাকে আমার থেকে আলাদা করে দেখছি, অন্য কেউ যদি এইভাবে ভাবে তখন তার ভাবনার মধ্যেকার আলাদা জীবন্ত উপস্থিতির মধ্যে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়বো আমি। আমি যে চোখে এখন আমার চারপাশের লোকজনকে দেখছি, তারাও কিন্তু একই ভঙ্গিতে আমাকে দেখছে। লোকাল ট্রেনের অল্প দুলুনিতে সে-ও দুলছে। দুলছি আমিও।

বসার জায়গা না পেলে আমি সাধারণত গেটে ঝুলতেই ভালোবাসি। একটু ধাক্কাধাক্কি করতে হয় ঠিকই, বেশ খানিকটা শারীরিক শ্রমও যে হয় না তা নয়। সবচেয়ে বড় কথা, দুর্ঘটনার ভয় থাকে। তবু, ভেতরে বসতে না পেলে, ভিড়-গাদাগাদির মধ্যে শ্রীচৈতন্য হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে ঝুলে ঝুলে যেতেই বেশী ভালো লাগে। তাতে ভেতরেও থাকা হয়, আবার বাইরেটাও পাওয়া যায় কিছুটা। সারা দিন পরে ফেরার সময় তো এই হাওয়াটুকু নিজের প্রাণের চেয়ে

বেশী দামী।

ভেতরে বসে থাকলে ট্রেন ছাড়তে যখন বেশ লেট হয় তখন একটা প্রাণান্তকর অবস্থা। আর গাড়ি ধরার সময় প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে ঠিক উল্টো কথা মনে হয়—যদি আর একটু লেটে ছাড়ে!

দিয়াড়া পেরোবার সময় মাঠের ধারের মজা পুকুর থেকে পানিফল তোলার ফাঁকে কোনো কিশোর হয়তো ছুটন্ত ট্রেনের দিকে 'হাই হাই' করে হাত তুলে চেঁচায়। কেন চেঁচায়? যে দূর শেষ অবধি দূরেই চলে যাবে, তাকে হঠাৎ একটুখানি কাছে পাওয়ার আনন্দে? নাকি তার বৈচিত্র্যহীন কাজের মধ্যে একটা শব্দময় গতিকে চোখের সামনে কিছুক্ষণের জন্যে দেখতে পেয়ে? পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা কোনো বালক হয়তো আর কিছু না পেয়ে একটা ঢিল তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দেয়। কেন দেয়? যে দূর কাছে আসবে বার বার অথচ ধরা দেবে না কখনো—তার ওপর অক্ষম বিক্ষোভ জানাতে চায় সে! ট্রেনে চড়ে কোথাও যাবার যখন বয়েস হবে তার, তখন হয়তো আর ছুঁড়বে না সে ঢিল কিংবা পাথর। তখন সে নিজেই হয়তো অন্য কোনো চঞ্চল অস্থির বিক্ষুব্ধ বালকের পাথর ছোঁড়া দেখে বিরক্ত হবে আর ভাববে—কেন যে ছোঁড়ে!

শেওড়াফুলিতে জংশন। গাড়ি বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়াবে। কয়েকজন নেমে দাঁড়িয়ে পায়চারি করবে অকারণে। অনেকেই বসার জায়গা খুঁজে নেবার চেষ্টা করবে নতুন করে। প্ল্যাটফর্ম জুড়ে এরই মধ্যে, চারপাশের অনেক ট্রেনের আসা আর চলে যাওয়ার মাঝখানে—অনেকেই রান্না করছে কিংবা মাথার উকুন বেছে দিচ্ছে কারো। কেউ হয়তো স্রেফ শুয়ে আছে। ভারী ভালো লাগে তার এই নির্মম উপেক্ষার দৃশ্য। চারপাশের অন্তহীন ব্যস্ততার মধ্যে সে ভারী নির্লিপ্ত ও নির্বিকার। জন্ম-জন্মান্তর ধরে এরা প্ল্যাটফর্মের অধিবাসী। যেন চোখের সামনে চব্বিশ ঘণ্টা ব্যতিব্যস্ত মানুষের ছোটাছুটি দেখতে দেখতে এরা বুঝে গেছে পৃথিবীতে আসলে ব্যস্ত হওয়ার মত কিছু নেই। কোথা থেকে যে আসে এরা। এই প্ল্যাটফর্মেই এদের রান্নাঘর, ড্রইংরুম, হনিমুন, রোগশয্যা, আঁতুড়ঘর, অফিস, অবসর যাপন! এই প্ল্যাটফর্মেই কি এরা মরে যায়! কে জানে।

ঘরের টুকিটাকি কাজকর্ম করতে করতে হঠাৎ এক একদিন ধরিত্রী বলে ওঠে—'ধুর! আজ কিচ্ছু ভাল্লাগছে না! রোজ যেরকম হয় আজ সেরকম হবে না! আজকে অন্যরকম হবে।' যেসব দিন ধরিত্রী এইরকম বলে, সেইসব দিনগুলো আমার খুব আনন্দের দিন। বাড়িতে রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়ার

বদলে সেদিন যে খাওয়া-দাওয়া বাইরে হবে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। হঠাৎ কোথাও বেড়াতে যাওয়া হতে পারে। সিনেমা যাওয়া হতে পারে। কোনো বন্ধুবান্ধবের কাছে আড্ডা দেওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে। একদম কোনোকিছু না-ও হতে পারে। তবে—অন্যরকম কিছু একটা হবেই।

আজকাল বড় একটা ওরকম কিছু বলে না ধরিত্রী। বোধহয় এই মফস্বল শহরে আলাদা করে সেরকম কিছু করার নেই বলেই। একদিন সন্ধেবেলা হঠাৎ বলল—'চলো, বেড়িয়ে আসি।'

হরিপালে বেড়াতে যাবার মতন কোনো বিশেষ জায়গা আছে বলে আমার জানা নেই। বললাম—'কোথায়?'

'কোথায় সেটা কোনো বড় কথা নয়। বেড়াতে যাবার ইচ্ছে করছে এইটাই আসল।'

এরপর আর কোন কথা চলে না।

সন্ধ্যা নামতে অল্প দেরী আছে। বর্ষা ছাড়া বাকি সব ঋতুতেই এই সময়টা ভারী মনোরম। এখন গ্রীষ্ম আর বর্ষার মাঝামাঝি একটা সময়। তেমন গরম নেই। আকাশে অল্পস্বল্প মেঘ। সিনেমাতলা থেকে ডানদিকে গেলে বিডিও অফিসের পরে আর ঘরবাড়ি নেই। দুপাশের ধানক্ষেত, লোকে যাকে দিগন্ত বলে, সেই পর্যন্ত ছড়ানো। রাস্তার দুধারে গাছ। কোনো কোনো গাছ রাস্তার দুধার থেকে ডালপালা বাড়িয়ে এত ঝুঁকে এসেছে যে দূর থেকে দেখলে তোরণদ্বার বা আর্চ বলে মনে হয়। ধরিত্রী বলল—'নামধাম ইতিহাস মুছে দিলে এই রাস্তাটাই যথেষ্ট ভ্রমণযোগ্যতা পেয়ে যেতে পারে।' একশো বা দুশো বছর আগে এই সব রাস্তা কেমন ছিল কে জানে। রাজা হরিচরণ পাল এই সব রাস্তা দিয়ে প্রাতভ্রমণে যেতেন। হরিচরণ সেই রকম রাজা যিনি ইতিহাসেও জায়গা পাননি। তাঁর নামের অনুষঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের এই ছোট্ট মফস্বল শহরের নাম হয়েছে হরিপাল। সঙ্গে জুড়ে গেছে একটি গ্রাম্য প্রবাদ—সব দুঃখ হরিপাল দিয়ে চলে গেল! পৃথিবীর আর কোনো জায়গা নিয়ে এমন অসামান্য তিমিরবিলাসী প্রবাদ নেই। কেন যে নেই! সব দুঃখ প্যারিস দিয়ে চলে গেল—কেউ বলে না! অন্যমনস্কতা কাটিয়ে উঠে ধরিত্রীকে বলি—'অ্যাসোসিয়েশন ভুলে যাওয়া অত সোজা নয়। পকেটে ঘরের চাবি নিয়ে বাসদেবপুরের রাস্তাকে খুব মোহময় ভাবা যায় না।'

'ময়না, ময়না, ওই ছ্যাখো—ফিঙে, দেখেছ কেমন মানুষের মতন পেছন ফিরে বসে আছে, যেন কত দার্শনিক', আমাকে আদৌ পাত্তা না দিয়ে ধরিত্রী বলল—'যাঃ, ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। এক মিনিট স্থির হয়ে থাকতে পারে না। ভালো করে দেখাই হল না।'

'আমি বকে দেব।'

'তাহলে তোমাকে ওর পেছন পেছন উড়ে উড়ে যেতে হবে।'

'যাবো।'

'ই.। অফিস কামাই করে বাড়িতে শুয়ে থাকে—সে আবার…'

'সে তো ট্রেনের ভয়ে।'

'হাজার হাজার লোক যাচ্ছে আসছে তাদের তো কই কোনো অসুবিধে হয় না।'

'তাদের অভ্যেস আছে।'

'অভ্যেস করলেই অভ্যেস হয়ে যায়। কোনো অভ্যেসই আকাশ থেকে পড়ে না। করতে হয়।'

'ছোটবেলায় আশপাশের লোকজনদের দেখতে দেখতে অনেক অভ্যেস তৈরি হয়ে যায়। আমাদের ফ্যামিলিতে সাতজন্মে কেউ কোনদিন ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেনি।'

'অনেকেই অনেক কিছু করেনি, এখন করছে। মায়েদের টাইমে কেউ চাকরি করত? এখন কত মেয়ে চাকরি করে!'

'জহর একটা অদ্ভুত কথা বলে—'

'কে জহর?'

'আমার বন্ধু। কর্পোরেশনে কাজ করে।'

'কি বলে?'

'বাঙালীরা তো কলকাতা থেকে ক্রমশ মফস্বলের দিকে সরে যাচ্ছে। শান্তিপ্রিয় হিজড়ে প্রজাতি। বলে—হাতে হলুদ কার্ড তোমায় ধরতেই হবে!'

'হলুদ কার্ড মানে? সে তো খেলার সময় রেফারিরা দেখায়।'

'মান্থলি। মান্থলি।'

মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ল ধরিত্রী। একটা ভিড় বোঝাই বাস টানা হর্ন দিতে দিতে চলে গেল। বাসটাকে সাইড দেবার জন্যে

ধরিত্রীকে রাস্তার ধারে টেনে আনতে হল বেশ খানিকটা। ধরিত্রী তখনো হাসছে।

'সাতটা পঁয়তাল্লিশের ট্রেনে আমাকে রোজ পাবেন, এই ভেণ্ডারের আগের কামরায়।' ভট্‌চাজ্‌ হাসে। বিশাল টাকের ওপর একগাছি চুল আড়াআড়ি পড়ে আছে। গায়ত্রী, ধরিত্রীর বোন, এই ধরনের টাকের নাম দিয়েছে 'স্মৃতিটুকু থাক'। আর যাদের একেবারেই চুল নেই, মানে দুপাশে অল্প চুল আছে—তাদের নাম দিয়েছে 'অবাক পৃথিবী'। এসব কথা ভট্‌চাজ্‌কে বলে ফেলতে ভারী দরাজ গলায় হেসেছিল ভট্‌চাজ্‌। হাসি থামলে বলেছিল—'আপনাকে কি নাম দিয়েছে?' কিছুতেই বলতে চাইছি না দেখে খুব পীড়াপীড়ি করেছিল ভট্‌চাজ্‌। বলতেই হল। 'জাম্বু।' 'সে কি! আপনাকে শালীরা জাম্বুবান বানিয়ে দিল?' আমি একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বলি—'ধরতে পারলেন না। 'জামাইবাবু' থেকে সংক্ষেপে ওই জাম্বু!' ভট্‌চাজ্‌ আবার হাসে। তার হাসিতে দরজা খুলে যাওয়ার শব্দ।

যেসব দিন সাতটা পঁয়তাল্লিশে ফিরি সেসব দিনে ভট্‌চাজ্‌কে খুঁজতে ইচ্ছে করে শুধু তার হাসির শব্দ শুনবো বলে। নিজে ওভাবে হাসতে না পারলেও অন্য কাউকে হাসতে দেখলে অভাবটা বেশ পুষিয়ে যায়। কথাটা বলেওছি ভট্‌চাজ্‌কে। 'আপনি বেশ হাসেন।' শুনে বেশ নিঃশব্দে হেসেছিল ভট্‌চাজ্‌। 'আর কি আছে বলুন জীবনে! চুলগুলো তো সব উঠেই গেল। যখন গেল, তখন দুঃখ করে আর কি করবো। হেসে ফেললেই হয়!' বলেই হাসে ভট্‌চাজ্‌। এবারে আমিও হেসে ফেলি। 'আমার মেয়ে কি বলে জানেন? একদিন দিল্লির টিকিট পাইনি, অথচ যেতেই হবে—বেশ মেজাজ খারাপ করে বাড়ি ফিরছি—মেয়ে বলল, 'বাবা, তোমার কাজ হয়নি বুঝতে পেরেছি আমরা, কিন্তু এই হনুমানের মেসোমশাইয়ের মতন মুখখানা আমরা দেখতে চাই না!' বুঝুন ব্যাপারটা। সব সময় হাসি হাসি মুখ করে বসে থাকতে হবে!' শুনে মিট মিট করে হাসতে হাসতে বলি—'আপনারই মেয়ে তো।' কি যেন ভেবে নেয় ভট্‌চাজ্‌। হঠাৎ বলে, 'মাঝে মাঝে এমন পাকা পাকা কথা বলে না? কি বলবো। একদিন বেশ মেঘ করেছে, সারাদিন গুমোট গরম, অফিস থেকে ফিরে গায়ে ভিজে গামছা জড়িয়ে বসে আছি, বৃষ্টি হবো হবো ভাব, অথচ কিছুতেই বৃষ্টি হচ্ছে না। মেয়ে এসে বলল—বাবা, আকাশটার ফাইভ-প্লাস-টু হয়েছে।

আমি কিছু বুঝতে না পেরে বললাম—সেটা আবার কী? মেয়ে বলে কি—তুমি জানো না? একটা জায়গায় জল খুব খারাপ ছিল। সবাইয়ের পেটের রোগ। ডাক্তার মোটে একজন। সে একদিন বৌকে নিয়ে সিনেমা গেছে। কম্পাউণ্ডারকে বলে গেছে—যার পেট আটকেছে তাকে পাঁচ নম্বর শিশি থেকে দু-দাগ ঢেলে দিবি, আর যার পেট ছেড়েছে তাকে দু-নম্বর থেকে দু-দাগ। কম্পাউণ্ডার তাই করে যাচ্ছে। শেষ দিকে ওষুধ বেশী নেই দেখে একজনকে এটা একটু আর ওটা একটু মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়েছে। মানে ফাইভ প্লাস টু। তো সেই লোকটার কি হল জানো? একবার করে বাথরুমের দিকে যায় আর মাঝরাস্তা থেকে ফিরে আসে! একবার করে বাথরুমের দিকে যায় আর মাঝ রাস্তা থেকে ফিরে আসে। আকাশটার সেই অবস্থা!'

নিজের অজান্তেই, ভট্চাজের চেয়েও জোরে হেসে উঠি।

হঠাৎ গেটের দিকে থেকে একটা 'গেল গেল' 'পালিয়ে গেল' 'ও মাগো' এইসব আওয়াজ উঠলো। কলরব একটু থিতিয়ে এলে জানা গেল—ট্রেন ছাড়ার মুখে, কোলে বাচ্চা নিয়ে ট্রেনে উঠছেন এক ভদ্রমহিলা—এই অবস্থায় তাঁর কানের দুল ছিঁড়ে নিয়ে কে পালিয়েছে! ভদ্রমহিলার কানের লতি ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে। বাচ্চাটা তারস্বরে কাঁদছে। অনেকেই বলছে—'আপনি পরের স্টেশনে নেমে আগে হাসপাতালে যান।'

একটা বিড়ি পকেট থেকে বের করে ধরিয়ে ভট্চাজ্ বলল—'কার মুখের হাসি কখন যে মিলিয়ে যাবে কেউ বলতে পারে না।' অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলে ভট্চাজ্—'নাটি কাটলেই তো পয়সা পাওয়া যায়, কান কাটার কি আছে!'

ভট্চাজ্ গম্ভীর থাকলেও আমি আর গম্ভীর থাকতে পারি না। বলেই ফেলি—'সে নিজে দু-কান-কাটা কিনা!'

অনেক গুণের মধ্যে ধরিত্রীর একটা দোষ, এক একদিন অত্যন্ত তুচ্ছ কারনে ধরিত্রী ভয়ংকর ক্ষেপে যায়। বেঁচে থাকার খুঁটিনাটি ধারাবাহিক অপমান, অনেকদিনের অবদমিত গ্লানি, দিনের পর দিন যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে বিস্ফোরক মানসিকতা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা—হঠাৎ হঠাৎ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। অনেক না-পাওয়ার মাছ দু-একটা সামান্য পাওয়ার শাক দিয়ে ঢেকে রাখতে আর পারে না তখন। একদিন, এক শনিবারে, শনি রবি আমার ছুটি

—অন্য দিন ছুটির পরে আড্ডা কাড্ডা দিয়ে রোজই বাড়ি ফিরতে আমার বেশ দেরী হয় বলে ছুটির দিনগুলো কিছুতেই ছাড়তে চায় না আমাকে ধরিত্রী। অথচ নিজের একটা কাজে কলকাতা না গেলেই নয়; অনেক বোঝালো আমাকে —'এমনি দিনে অফিসেই যেতে চাও না, আজ ছুটির দিনে তোমার কি এত কাজ পড়লো?'

'এত কৈফিয়তের কি আছে? আসলে তোমার হাফ-ডে বলে আমাকে বাড়িতে বসে থাকতে হবে তাই বলো।'

কোনো বিতর্কে যায় না ধরিত্রী। সরাসরি বলে—'হ্যাঁ, তাই থাকতে হবে। সারা সপ্তাটা আমি যে বোর হই একা একা। কোনদিন তো তাড়াতাড়ি ফেরো না। যাদের দূরে বাড়ি তারা শহর থেকে সবাই তাড়াতাড়ি ফিরে আসে।'

'তাদের ঘরবাড়ি আছে। মা বাবা ভাই বোন আছে। পাড়া আছে! আমার আছে?'

এই জায়গাটা খুব দুর্বল, মোক্ষম, ভঙ্গুর, সূক্ষ্ম, অকৃত্রিম, আবিল এবং অসহ্য। এসব শুনলে ধরিত্রী তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। আমাকে অনেকবার পাড়া পাল্টাতে হয়েছে জীবনে, তাই আমার কোনো পাড়া হয়নি। আমাকে অনেকবার বাড়ি পাল্টাতে হয়েছে জীবন, তাই আমার কোনো বাড়ি হয়নি। আমাকে অনেকবার বন্ধু পাল্টাতে হয়েছে জীবন, তাই আমার কোনো বন্ধু হয়নি। এসব ব্যাপারে ধরিত্রীর তেমন কোনো ভূমিকা নেই, সহানুভূতি আছে। শুধু বিয়ের পর সেই আদি ও অস্বস্তিকর, অনিবার্য ও অশ্লীল, অকারণ অথচ অপ্রতিরোধ্য শাশুড়ি-বৌয়ের সমাধানহীন দ্বন্দ্ব শুরু হল, যেমন হয়, সাধারণত। উত্তর কলকাতার ঘুপচি, স্যাঁসসেঁতে, সূর্যহীন গলির ঘরের জটিল, জান্তব, যতিহীন, চিৎকারময় জীবনযাপন শেষ করে দিয়ে ধরিত্রী আমাকে নিয়ে এল খোলামেলা, সবুজ, প্রকাশ্য অপরিমিত নীলের কাছাকাছি—যেখানে খবরের কাগজ, চায়ের দোকান আর হিন্দি সিনেমা জীবনকে শাসন করে না; বাড়ি ফেরা ক্লান্তিকর নয় যেখানে; বাড়িতে জায়গা কম বলে বাইরে বেরোতে বাধ্য হতে হয় না যেখানে; মন যেখানে দমচাপা অস্বস্তির মধ্যে হাঁফিয়ে না মরে গিয়ে ডানা মেলে উড়ে যেতে পারে।

উত্তর কলকাতার ত্রস্ত ও তটস্থ জীবনে কোনো ট্রেন ছিল না। এখানকার এই অনন্ত নীলের নীচে, ছড়ানো সবুজের মধ্যে অনেক ট্রেন আছে, যে ট্রেন গ্রাম থেকে শহরে যায়, যে ট্রেন চলে যায় অভাব থেকে প্রাপ্তির ইশারার দিকে; যে

ট্রেন রাস্তার ধারে গাছতলায় হ্যারিকেন জেলে যাত্রার রিহার্সাল থেকে কাউকে টেনে এনে তুলে নিয়ে যায় বর্ণময় স্বপ্নের আলোঝলমল হাততালির মধ্যে, যে ট্রেন স্বপ্ন থেকে পথ চলা শুরু করে সম্ভাবনার দিকে বিস্তৃত হতে চায়। যে চাওয়া, মানুষেরই মজ্জাগত, রক্তাক্ত অস্তিত্বের মূল সুর, স্বরলিপির সা, মানুষের প্রধান ও প্রাকৃতিক ইতিহাসলিপি, জেগে থাকার বীজমন্ত্র, বিকাশের সিঁড়ি।

একবার জেদ চাপলে আমি আর সমঝোতায় আসতে পারি না। জামাকাপড় পরতে দেখে ধরিত্রী বলে ফেলল—'আমিও তাহলে যাবো। রোজ রোজ একা একা ফাঁকা ঘরে বসে থাকতে পারবো না।'

আমার এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে ধরিত্রীকে নিয়ে যাওয়া যায় না। কাজটাও এমন কিছু জরুরী নয় যে আজ না করলে চলবে না। ছুটির দিন আমি হরিপাল থেকে কলকাতা যাবো, ধরিত্রী আমার সঙ্গে যেতে চায়, এতে তো আমার আনন্দিত হওয়াই উচিত। তবু মনে হল, ধরিত্রীর ইচ্ছেগুলোকেই মেনে নিতে হবে চিরকাল, আমার ইচ্ছেগুলোর কোনো দামই সে দেবে না? আমি তো আগে থেকেই বলে রেখেছি শনিবারে বেরোবো। তখন তো বলতে পারতো —আমিও যাবো। এখন হঠাৎ এই অহেতুক গোঁ ধরার মানে কি? তার নিঃসঙ্গতা যে আমি অনুভব করি না তা তো নয়! আমি বেশ দৃঢ় স্বরে জানালাম—'না। তুমি আমার সঙ্গে যাবে না।'

ছুটির দিনের শেষ দুপুরের ট্রেন বেশ ফাঁকাই। জানলার ধারে একটা জায়গাও পেয়ে গেলাম। ঘণ্টাখানেক বসে থাকতে হবে। জানলা পেলে ভালো লাগারই কথা। অথচ কিছুই ভালো লাগছে না আজ। আমাদের ভালো লাগা এত বাইরের ঘটনার ওপর নির্ভরশীল! ভেতরকার স্বতোৎসারিত ভালো লাগাকে তারা গলা টিপে মেরে ফেলে।

ক্রশিং ছিল। আপ ট্রেন যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ডাউনের গাড়ি। ধরিত্রীর জন্যে বেশ খারাপ লাগছিল। অকারণে অতখানি খারাপ ব্যবহার না করলেই পারতাম! যে অহং মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব হতে শিখিয়েছে, সেই অহংই যে কি নিকৃষ্ট ঝামেলার মধ্যে ফেলে দেয় মানুষকে! পারিবারিক আবহাওয়া থেকেই মানুষের যাবতীয় উন্নতির সূত্রপাত। পারিবারিক পরিবেশই আবার মানুষের তাবৎ পতনের উৎস!

আপ ট্রেন ঢুকেছে। ওটাই আগে ছাড়বে। স্টেশনে যে আগে ঢোকে সে আগে ছাড়ে না। একটা সিগারেট ধরিয়ে দেশলাই কাঠিটা জানলা দিয়ে

বাইরে ফেলতে যাবো, হঠাৎ দেখি জানলার বাইরে ধরিত্রী। আর একটু হলে কাঠিটা ওর গায়ে পড়তো।

আপ ট্রেন ছাড়ল। এবার আমার ট্রেনটা ছাড়বে। অত্যন্ত দ্রুততায় তৈরী হয়ে নিয়েছে ধরিত্রী, তাই তার চেহারায় সেজেগুজে বেরোনোর সযত্নচর্চিত পালিশটা একদম নেই। বড় বড় চোখে চেয়ে আছে, যে চোখে রাগ, দুঃখ, অপমান, অভিমান, বিস্ময়, আঘাত ও আবেদন। চুলটা এলোমেলো করে খোঁপা করা। আমার আর ধরিত্রীর মাঝখানে ট্রেনের জানলা। ভেতরে বসেই বুঝতে পারছি সিগন্যাল দিল। ট্রেন ছেড়ে দেবে। ধরিত্রী তবু কিছু বলল না। কিছু বলতে পারলাম না আমিও। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই জানলা থেকে হঠাৎ সরে গেল ধরিত্রী। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে।

এই মুহূর্তে ট্রেনটাকে কত অভিশাপ যে দিচ্ছে ধরিত্রী, ট্রেন কি তা জানে! নেহাৎ জেদের বশে উঠে পড়েছি বলেই এই ট্রেন আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দূরে, অথচ প্রাণ মন আত্মা যে পড়ে আছে ট্রেনের বাইরে, ট্রেন কি তা জানে! তবু চলতে শুরু করার পর প্রত্যেক ট্রেনেরই নিজস্ব কিছু ছন্দ, গতি ও শব্দময় অনুষঙ্গ আছে, যা প্রভাবিত করে সব যাত্রীকেই। কিছুক্ষণ পরে সামনের দুজন যাত্রীর তন্ময় রাজনীতি-আলোচনা ইচ্ছার বিরুদ্ধে শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম আমিও।

কত রকমের কথাই যে বলে মানুষ। সামনের সিটে যেখানে একটু আগে রাজনীতির পরম মতবিনিময় হচ্ছিল এখন সেখানে এক বৃদ্ধ আর এক বৃদ্ধকে পাত্রীর গুণপনা জানাতে ব্যস্ত। একটা বয়সের লোকেদের এটা একটা চমৎকার প্যাসটাইম। বিষয় যে কিভাবে পাল্টে যায়! ট্রেনে দেখেছি, বয়স অনুপাতে মানুষজনের আলোচনার কিছু বেশ নির্দিষ্ট বিষয় আছে। কমবয়সের অত্যুৎসাহী ছেলেরা সাধারণত সিনেমা আর মেয়েদের কথাই বলাবলি করে। তার চেয়ে একটু যাদের বয়েস বেশী তারা বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা বা পিকনিকের আয়োজন বা কোনো বিয়েবাড়িতে কে কত খেয়েছে বা কোনরকম মজার কথা বলতে বা ফেনিয়ে রসিয়ে শোনাতে ভালোবাসে। তার চেয়ে একটু বেশী বয়সের লোক হলেই রাজনীতি। এই বয়েসটা বেশ অনেকদূর পর্যন্ত লম্বা। তারপর একটা বিশেষ বয়সে অব্যবস্থার বর্ণনা—দেশ উচ্ছন্নে যাচ্ছে। ছেলে মানে না বা মেয়ের বিয়ের জন্যে উপযুক্ত পাত্র পাচ্ছি না। তারপর একটা বয়স আছে যখন আর কিছুই বলে না কেউ। শান্তভাবে অন্য যাত্রীদের অযাচিত

করুণা কুড়োতে ভালোবাসে। শুধু চুপচাপ যাতায়াত করলেই মানুষের মনোযোগ পাল্টে যাওয়ার এই ধারাবাহিক বিবর্তন বেশ লক্ষ করা যায়।

সামনের সিটে এখন এক মাঝবয়েসী দম্পতি। এরা বেশ রসিক। ভদ্রমহিলার চেহারা বেশ স্থিত ও সম্পূর্ণ গৃহিণীর মতো। ভদ্রলোকের ভঙ্গিতে একটা কৃত্রিম আদুরেপনা আছে। এ রকম স্বামী-স্ত্রী গঙ্গার ওপারে কলকাতায় দেখা যায় না সহজে। তারা এত স্মার্ট হয়ে থাকে যে তাদের চেতনার ভেতরকার সরসতার অভিক্ষেপ বাইরে থেকে বোঝা যায় না কিছুতেই। আনন্দের অভিব্যক্তি শরীরে মনে ফুটে ওঠাকে বোধহয় আধুনিকতা বলে না।

ভদ্রলোক বললেন, লজেন্স খাবো। লজেন্সওয়ালাকে দেখে কোনো এই বয়সের লোক যে লজেন্স খেতে চাইতে পারেন, তাও তাঁর স্ত্রীর কাছে, ভাবাই যায় না। মৃদু আপত্তির গুনগুন জানিয়ে ভদ্রমহিলা কিনেও দিলেন। 'তুমিও খাও, লজ্জা কি!' বলে ভদ্রলোক খেতে লাগলেন। 'তোমার ইচ্ছে হয়েছে তুমি খাও না, আমার তো ইচ্ছে হয়নি!' মহিলার উত্তর শুনে ভদ্রলোক বললেন—'দেখেও তো অনেক সময় ইচ্ছে হয়!' মহিলা বললেন—'আমার হয় না।' 'আসলে তুমি পরে খাবে। কিম্বা টুম্পাকে দিয়ে দেবে।' বলেই কড়মড় করে চিবিয়ে ফেললেন ভদ্রলোক মুখের লজেন্স। মহিলা একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে বললেন—'একটা লজেন্স মুখে ফেলেই কড়মড় করে চিবিয়ে ফেলার মধ্যে কোনো ক্রেডিট নেই। কে কতক্ষণ ধরে চুষে চুষে একটা লজেন্স খেতে পারে সেইটেই ব্যাপার।' বলেই মুখটা ফিরিয়ে নিলেন জানলার দিকে। ভদ্রলোক বেশ শান্তভাবে বললেন—'মোটেই না। তাড়াতাড়ি চিবিয়ে ফেললে তবেই তো আর একটা পাওয়া যাবে!' শুনে যেন সরু চোখে তাকালেন ভদ্রমহিলা।

হাওড়ায় ট্রেন ঢোকার পর ওঠানামার সময় যে ব্যাপারটা হয় সারা পৃথিবীতে অন্য কোথাও তা হয় না। দুদল লোক একইসঙ্গে একই দরজা দিয়ে উঠতে চায় এবং নেমে যেতে চায়; দুপক্ষই অপেক্ষায় অপেক্ষায় অতিষ্ঠ; যারা উঠতে চায় তারা আবার বসতে পাবার জায়গার জন্যে অতিরিক্ত উৎসাহী, ফলে এক অবিশ্বাস্য অমানুষিক ধাক্কাধাক্কির চিরন্তনতা তৈরি হয় এবং অনেকেই ব্যাপারটা না মিটে যাওয়া পর্যন্ত না নেমে নিজের নিজের জায়গায় বসে থাকে! রেশনের দোকান থেকে সিনেমার টিকিট অবধি সব জায়গায় লাইন দেওয়ার নিয়ম চালু হলেও ট্রেনে ওঠা বা নামার ব্যাপারে কেউ সে নিয়ম মানতে চায়

না ! সারা দিনের পরে জানলার ধারে একটা বসার সিট যে নিজের জীবনের চেয়েও বেশী মূল্যবান।

যে হাওড়া স্টেশনে পা দিলেই মন কেমন উদাস হয়ে যেতো, মনে হত কোথায় যেন যাবার কথা আছে, এক্ষুনি একটা ট্রেন আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে, আমার আর কোনো চিন্তা নেই তাহলে—সেই হাওড়া স্টেশনটা কেমন ঘরবাড়ি হয়ে গেল আস্তে আস্তে। কোন প্লাটফর্ম থেকে কোন ট্রেন কখন ছাড়বে সব মুখস্ত ; গাড়ি দেরিতে ঢুকলে কোথায় গিয়ে লেট স্লিপ নিতে হবে, কেউ মাথা ঘুরে পড়ে গেলে তাকে কোথা থেকে এনে দিতে হবে ওষুধ, গাড়ির গোলমাল থাকলে কোথায় গিয়ে টেবিল চাপড়াতে হবে, এই স্টেশনের ভেতরেই কোথায় সবথেকে সস্তায় খাবার পাওয়া যায় সবথেকে ভালো, কোন দূরপাল্লার ট্রেনের টিকিট কিভাবে কোথায় কত সহজে পাওয়া যায়, সব জানা হয়ে গেল। এখন মনে হয়, না জানলেই ভালো হত। হাওড়া স্টেশনে পা দিয়েই ছোটবেলার সেই গা ছমছম করা রোমাঞ্চ, সেই অকারণ ভালো লাগা, এখন আর কিছুতেই পাওয়া যাবে না। অবশ্য শুধু হাওড়া স্টেশন নয় ; অন্য সব ব্যাপারেই এরকম হয়েছে। জানা গেল হয়ে গেলে পাল্টে যায় সব ভালো লাগা।

ফেরার সময় দেখি স্টেশন ভর্তি কালো কালো মাথা। গিস্ গিস্ করছে লোক। তার মানে অনেকক্ষণ কোনো ট্রেন নেই। বেশ গণ্ডগোল। ভালো করে হাঁটা তো দূরের কথা, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকাও যাচ্ছে না।

অভিজ্ঞতা থেকে জানি, কোনো দুরবস্থাই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ভিড় ঠেলে ঠেলে ঘুরে বেড়াই এদিক ওদিক। কেউই সঠিক কিছু জানাতে পারে না। কেউ বলে, তার ছিঁড়ে গেছে। কেউ বলে ডিরেলড্ হয়ে গেছে গাড়ি। কেউ কেউ কিছুই বলে না। ভিড়ের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখি, বিদ্যুৎপর্ণা। গম্ভীর মুখে বুকের কাছে হাত জড়ো করে দাঁড়িয়ে আছে একধারে।

'কি ব্যাপার, আটকে পড়েছো দেখছি।'

আমাকে দেখে চারপাশের এই বিভ্রান্তির মধ্যেও বেশ হাসে বিদ্যুৎপর্ণা। 'আজ হয়ে গেল।'

'কিছু হয়নি। একটু পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'সবাই তাই ভাবছে বটে।'

'মজার ব্যাপার কি বলো তো, ট্রেনের ভেতর লোকে যেমন অপরিচিত সব

লোকের সঙ্গে কেমন অনেক দিনের চেনার মতন কথাবার্তা বলে, আবার যে যার জায়গায় এলে টুক করে নেমে যায়, এখন এই গোলমালের মধ্যেও অনেক লোক অচেনা সব লোকের সঙ্গে বেশ চিরচেনার ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলছে—'

আবার হাসল বিদ্যুৎপর্ণা। 'সবায়েরই যে এক প্রশ্ন। কখন যাওয়া যাবে।'

'যাওয়া যদি নাই যায়! ক্ষতি কি'—কথাটা গলার কাছে উঠে এলেও চেপে যেতে হয় দ্রুত। খুব খারাপ শোনাবে। বিদ্যুৎপর্ণা আমার বন্ধুর বউ। এখন ডিভোর্সী।

হঠাৎ 'গাড়ি আসছে' 'গাড়ি আসছে' বলে একটা উত্তেজনা প্রকট হয়ে ওঠে চারপাশে। চার নম্বরে ব্যাণ্ডেল ঢুকছে। খানিকটা হাল্কা হয়ে যাবে ভিড়।

বিদ্যুৎপর্ণা 'আচ্ছা'—বলে মিশে যায় ভিড়ে।

কুড়িয়ে পাওয়া গ্রহ

সাইকেল নিয়ে সোজা প্ল্যাটফর্মে উঠে গেল। ডাউন ট্রেন ধরার জন্যে লাইন টপকে এপারে আসতে হয়। সকালে বৃষ্টি হয়েছে বেশ। কাদা বাঁচিয়ে প্ল্যাটফর্মের কাছাকাছি আসতেই প্রায় কাঁধ ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল সাইকেল। ঢালু গা বেয়ে সোজা প্ল্যাটফর্মে উঠে গেল। ট্রেনের জন্যে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ প্ল্যাটফর্মের ওপর সাইকেলের ঘন্টি শুনে সরে সরে দাঁড়াতে লাগল। ছেলেটা বোঁ করে পুরো প্ল্যাটফর্মটা একবার চক্কর মেরে আবার নেমে গেল। তখনি, পাশ দিয়ে যাবার সময় ছেলেটার পকেট থেকে টুক করে পড়ে গেল চিঠিটা।

কুচোমাছ দেখে মেঘলা খেপে লাল। বাজারে যা কাদা। কাটা পোনার দিকে যেন কাদার ভয়েই যাওয়া হল না। আসলে অবশ্য—। আলু পটল কুমড়ো ভেণ্ডিতেই পকেট ক্যাকাশে হয়ে গেল। অন্যদিন মাছটা আগেই নেওয়া হয়ে যায়। আজ কাদার জন্যেই সকাল থেকে সব উলটোপালটা হচ্ছে। কতদিন বলেছি অফিসটাইমে তুমি কুচোমাছ আনবে না। এখন আমি মাছ বাছব না ডাল সাঁতলাবো না পটল ভাজবো? তুমি তো ডুব মেরে এসেই বলবে—ভাত দাও। আর টাইম নেই। লোকাল পাবো না! তোমার আর কি।... মেঘলা গজগজ করছিল সমানে। বেশি বাছাবাছির দরকার কি। সবসুদ্ধু ভেজে দাও না। বলতে বলতে গামছা নিয়ে ঘাটের দিকে যেতে যেতে আকাশ দেখে ভরসা হয়েছিল, বলা যায়। গাড়ি ধরার আগে আর ঝরাবে না। এমন ভিজে হাওয়ায় একটুকরো মাছ না হলে ঠিক—

আকাশী নীল রঙের একটা ইনল্যাণ্ড লেটার। বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর থেকে পাঠিয়েছে মালতী চট্টোপাধ্যায়। কাকে পাঠিয়েছে? হলুদ ভিজে প্ল্যাটফর্মের ওপর নীল খামটা আস্তে আস্তে ভিজে যাচ্ছে। মালতী চট্টোপাধ্যায়

ছেলেটার কে হয় ? ছেলেটার বয়স আর সাইকেল চালানো দেখে তাকে বিবহিত মনে হয় না। বেশ তাগড়া চেহারা। মস্তান টস্তান হলে মানাতো। এখন উলটোদিকের প্ল্যাটফর্মে চক্কর দিচ্ছে। কাউকে খুঁজছে কি? চিঠিটা এক্ষুনি না তুললে ভিজে যাবে। বালুরঘাটের মালতীর বক্তব্য বৃষ্টির জলে ধুয়ে যাওয়া উচিত কি! ছেলেটাকে দেখা যাচ্ছে না আর।

কি বিশ্বাসদা, বাড়িতে আজকাল চিঠি পড়ার সময় হচ্ছে না নাকি? গাড়ি ঢুকছে যে!

অ্যাঁ? ও, বরুণ, তুমি আজ লোকালে কেন? তুমি তো—

সোমবারের বাজার। পরের গাড়িতে বড্ডো ভিড় হয়। চলুন—চলুন—

চিঠিটা আর হাতব্যাগে ঢোকানো হয় না। এক হাতে ব্যাগ আর এক হাতে দোমড়ানো চিঠি নিয়ে ঝাঁপ দিতে হয় দরজার ভিড়ে। গুঁতোগুঁতি হতে থাকে। রোজকার ব্যাপার। আগে নামতে দিন। আমার চশমাটা—। কোনো সিভিক সেন্স বলতে কিছু নেই। মিনিটখানেক কিছু বোঝার উপায় নেই কি হচ্ছে। একসময় দেখা যায় কামরার অনেক ভেতরে এসে গেছি। দৈবাৎ কেউ বসতে পেলে সবাই হৈ হৈ করে ওঠে। আজ একটা লটারির টিকিট কাটবেন দাদা! টাইম ভালো যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পাঁচরকম খাজুরি হতে থাকে। কেউ কেউ কিভাবে শুরু করবে ঠিক করতে না পেরে বলে—কি দিয়ে ভাত খেলে চক্কোত্তি! বিষ্টিটা ঠিক জুত হচ্ছে না যে জমিয়ে খিচুড়ি খাবো, কি বলো? অনেকে, যারা কাগজ কিনেছে তাদের দিকে তাক করে, তাল বুঝে—দাদা ভেতরেরটা একটু।

দুটো ধুতিপরা লোক পাশে দাঁড়িয়ে বিষয়সম্পত্তির গল্প জুড়েছে। কে এক বিজয়, বাড়িতে এসে, মাকে 'মাইমা' 'মাইমা' বলে, বোরো লাগান, বিঘের ছত্রিশ মন ফসল হবে, লোভ দেখিয়ে চাষের খরচা বাবদ এন্তার টাকা কি কায়দায় বের করে নিয়ে গেছে—তার গল্প। পাশ থেকে একজন বাগড়া দিল। কাল আপনাদের অনুপ জটলা কেমন হল দাদা? লোক হয়েছিল?

জালোটাকে স্বেচ্ছায় জটলা বলার মতন চেহারা নয়। কাল ফাংশন ছিল। কদিন ধরেই মাইকে সাইকেল রিক্সায় বলে বেড়াচ্ছে। তবু লোক ভালো হয় নি। জলাঘাটার ছেলেছোকরা দু এক জনকে বলতে শুনেছি ভেঙিয়ে—অনুপ জলাঘাটা। ম্যায় নেহি মাখখন খায়া—মাইকে প্রায়ই হয়। এক মাতাল তা শুনে বলে কি—মাক্খন খা না বাবা! খেয়ে ছুটি দে। রোজ বাড়ি ফেরার

সময়—ম্যাম নেহি মাকৃখন খায়া ! তুই মাখন খাস নি তো আমি কি করবো।

অফিসে পৌছবার আগে চিঠিটা পড়া যাবে না। হাতের মধ্যে দুমড়ে গেছে। সাবধানে খুলে দেখে নিয়েছি একবার। শেষ দিকের কিছু অক্ষর জলে জুবড়ে গেছে। তা থাক। চিঠিটা হাতব্যাগের সাইডে ঢুকিয়ে গোঁফের আড়ালে হেসে ফেলে নারেন বিশ্বাস। স্যুইট ঠাকুরপো—। স্যুইটটা আবার ইংরেজিতে লেখা। কি স্টার্টিং! এ চিঠি একটু রসিয়ে না পড়লে হয়।

রোজ় বেশ বিরক্ত লাগে অফিস যেতে। যেন মড়া পোড়াতে যাচ্ছি। আজ মনে হল—নিজের চেয়ারে গিয়ে না বসলে যেন শান্তি হচ্ছে না। মড়া পোড়ানো শেষ। শুধু চান করা বাকি।

গর্তের ভেতর থেকে পিলপিল করে পিঁপড়ে বেরোয় যেমন, সাবওয়ে থেকে মানুষ বেরোচ্ছে। রোজ হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে হেঁটেই যায় নারেন। আজ বাসে গেল। বস্তুত, হেঁটে যাবার একটা আলাদা দল আছে তার। সবাই জানে ভিড়ের ভয়ে নীরেন বিশ্বাস কিছুতেই বাসে ওঠার পাত্র নয়। লাল কালির ঢ্যারা—বাবা, প্রাণের ভয়ের বাড়া। বলেই বাসের দিকে ছুটল বিশ্বাস। সঙ্গীরা ঠোঁট ওলটালো। ব্যাপার কি!

নিশ্চিন্তি হবার যে কোনো উপায় নেই আজকাল, এখন বেঁচে থাকা মানে যে পায়ে পায়ে ঝামেলা—অফিসে ঢুকেই সেটা নতুন করে টের পেল নারেন।

সবে টেবিলটা মুছে চেয়ারের হাতলে হাত রেখেছে, ভেবেছে ধীরে স্থস্থে বসে একটু জিরিয়ে নিয়ে একটা সিগারেট···। বাদল এসে একরাশ ফাইল আর এক গ্লাস জল রেখে গেল, সেন সাহেব বললেন তাড়াতাড়ি চাই—বলে গেল, যেমনভাবে শাশুড়ি বলে থাকে ঃ ঝড়বৃষ্টি আসচে, কাপড়গুলো একটু তাড়াতাড়ি তুলে রাখলে ভালো হয় বৌমা। নীলিমা দত্ত এসে বলে গেল—আমার লোনটা আজ হবে তো। রোজই একবার করে সাতসকালে কথাটা বলে সে। যেন সে মনে কবিয়ে না দিলে আমি কাজটা কিছুতেই করব না। নারেন আজ খেপে গেল—আমি তো বলে দিয়েছি আপনাকে নীলিমাদি, যেদিন আপনি রিমাইণ্ডার দেবেন না—শুধু সেইদিন আমি আপনার···। চাকরিতে বেশিদিন হয়ে গেলে মেয়েরা একরকম হাসতে শেখে—চাকরি না করা মেয়েরা কোনোদিন সেরকম পারবে না। সেই হাসি নীলিমাদির মুখে। বললেন—সে তো কথার কথা ভাই বড়বাবু। মেয়ের বিয়ের তারিখ যে এসে গেল!

এরপর সেই পুরনো আলোচনাটা অবধারিত। চেয়ারে হেলান দিয়ে

নীরেন বলবে—মেয়ের বিয়েতে এতগুলো টাকা খরচা করবেন খামোকা! একটু ভেবে দেখুন। আর তো বছর চারেক বাদেই রিটায়ার করছেন—তখন নাহয় টাকাটা একসঙ্গে তুলতেন—। নীলিমাদি বলবেন—আমার মেয়ে ভাই কালো। মেয়েকে তো আর মুখ দেখে নিয়ে যাবে না জামাই। তখন নীরেন বলবে—বিয়ে তো আমরাও করেছি। স্ব-ইচ্ছায় মেয়ের বাবা যা দিয়েছে তার বেশি তো···। কথাটা সত্যি নয়। কথা হয়েছিল কুড়ি। শেষ অব্দি শ্বশুরমশাই গলবস্ত্র হয়ে পাঁচ হাজার ঠেকিয়েছিলেন। বাকিটা পরে একসময়···। নীরেন নিষ্ঠুর হতে পারে নি। তবে একতলায় ভাড়া বসিয়ে দোতলা তুলতে যখন প্রাণ যায় যায়, শস্তায় ছাত ঢালাইয়ের দাম হিশেবে বৃষ্টির রাতে ছাত চুঁইয়ে জল পড়লে ঘরে যখন মেঘলা একবার এটা ঢাকা দেয় একবার ওটা—মাঝরাতে ঘুম ভাঙার বিরক্তিতে নীরেন তখন না বলে পারে না: তোমার বাবা যদি···। মিস্তিরিরা ছাতের নর্দমাগুলো এমন ভাবে করেছে, লেভেলের অল্প উঁচু; ফলে বৃষ্টি হলেই জল জমে যায় ছাতে, বৃষ্টি হলেই নীরেনকে কোমর বেঁধে ছাত পরিষ্কারে নামতে হয়; আর প্রত্যেকবার—ছাত পরিষ্কার করার সময়, বৃষ্টি হলেই, নীরেনের মনে হবে—শালার শ্বশুর যদি বাকি পনেরো হাজার দিত! হাউস বিল্ডিং লোন যা দেয় তাতে একতলার বেশি হয় না। মেঘলার বুদ্ধিতে একতলায় ভাড়াটে বসিয়ে দোতলা তুলতে গিয়েই এইসব ঝামেলা।···অথচ বৃষ্টি এলে বিলাসিতা প্রিয় বাঙালির প্রাণে ফুর্তি জাগারই কথা।

নীলিমাদি বললেন—শুধু আপনার হাত থেকে বেরোলেই তো হল না। আরও চোদ্দ হাত ঘুরবে। আজকে ছেড়ে দিন না ভাই।

পাশের টেবিল থেকে প্রশান্ত কাগজ পড়তে পড়তে চেঁচাচ্ছে। স্বামী ও শাশুড়ি গ্রেফতার। বধূহত্যার অভিযোগে নদীয়া জেলার···

ওটা শুনিয়ে পড়ার মতন নতুন কিছু নয় প্রশান্ত।

নতুন খবরও আছে। প্রেমিকের সাহায্যে স্বামী খুন!

তাই নাকি। তাই নাকি। এটা পড়ে শোনা প্রশান্ত। দু একজন ঝিকমিকিয়ে উঠল।

প্রশান্ত পড়তে লাগল। সেদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে নীরেন বিশ্বাস নীলিমাকে বলল—ঠিক আছে, আমি দেখছি। আপনি সিটে যান। কাজ করুন।

আজ কিন্তু চাই ভাই। বলতে বলতে নীলিমা দত্ত চলে গেল।

টিফিনে একবার চিঠিটার কথা মনে পড়েছিল। কিন্তু ততক্ষণে কুড়িয়ে পাওয়া রসের চিঠি মেজাজ করে পড়ার মতন মন নেই। সকালে বৃষ্টিধোওয়া আবহাওয়ায় ট্রেন আসার আগে মফস্বল স্টেশনে মন বেশ রসস্থ ছিল। মনের সে অবস্থাকে বেশিক্ষণ ধরে রাখা আজকাল অসম্ভব।

গঙ্গা পেরিয়ে শহর কলকাতায় পা দিলেই শরীরে একরকম ছিলাটান সতর্কতা টের পায় নীরেন। যেন এক্ষুনি বিরাট কোনো লোকসান হয়ে যাবে।

অফিসে ঘণ্টাতিনেক কাজকর্ম করার পর মনে হতে থাকে—সবাই আমাকে দিয়ে যে যার নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে টুকটাক। আমার কাজ গুছিয়ে নেবার জন্যে যাকে দরকার সে যেন লুকিয়ে পড়েছে কোথাও! আড়াল থেকে বলছে—টুকি! নীরেন কিছুতেই তাকে ধরতে পারছে না।

বিকেলের দিকে বাইরের লোক আসে এন্তার। তাদের কথার জবাব দিতে দিতে সকালের কুড়িয়ে পাওয়া চিঠিটার কথা বেমালুম ভুলে গেল নীরেন।

ছুটির পর অফিস থেকে বেরিয়ে মিছিলে পড়ে গেল নীরেন বিশ্বাস। তাও যে সে মিছিল নয়। মেয়েদের মিছিল। পণপ্রথা নিবারণী সমিতি। একটা মেয়েকেও দেখতে ভালো নয়। মোটামতন মধ্যবয়স্কা চশমা পরা এক মহিলা চিৎকার করে বক্তৃতা দিচ্ছে। লম্বা লম্বা মিছিল এসে জমছে এসপ্ল্যানেড ইস্টে।

কোথা থেকে প্রশান্ত এসে বলল—কারবারটা দেখেছেন বড়বাবু। মেয়েরাও নেমে পড়েছে রাস্তায়!

তোমার তো এখনো চান্স আছে ভাই। বিনা পণে বিয়ে করে একটা একজাম্পল দেখাও! আমাদের তো আর সে উপায় নেই।

বিয়ে ফিয়ের কথা আর ভাবতে পারি না মশাই। ছোট বোনটা সবে পার্ট ওয়ান দিচ্ছে। ওকে বিদেয় না করে···। তাছাড়া ঘরের প্রব্লেমও আছে। আপনি তো জানেন সবই। শুধু শুধু কেন···।

তাহলে আর কী। গায়ে হাওয়া লাগিয়ে সন্ধের দিকে গঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়াও।—আমাদের আর উপায় কী নীরেনদা, আমাকেও তো বোনের বিয়ে দিতে হবে! কাগজে 'বদল চলিবে' বিজ্ঞাপন দেখে চিঠি লিখছি আজকাল। আপনি আবার গাবাবেন না মাইরি!

আমার কী দরকার। গঙ্গার ধারে যাবে তো চলো। আমি চাঁদপাল থেকে লঞ্চ ধরব।

মাঃ! আপনি যান বরং। আমি একটু দেখি।

দেখো বাবা, দেখো। একে মেয়েদের মিছিল, তার ওপর অবিবাহিত। দেখো।

না না, সবাই আনম্যারেড নয়, বিবাহিত কিছু আছে। তারা হল সাপোর্টার। বুঝলেন না?

আমার বুঝে দরকার নেই ভাই। আমি যা বোঝার বুঝেছি। এখন তুমি বোঝো। আমি এগোই।

প্রশান্ত অন্যদিকে তাকিয়ে উত্তর দিল—আচ্ছা। কাল দেখা হবে।

আকাশবাণীর পাশ দিয়ে লঞ্চঘাটের দিকে যেতে প্রায়ই কিছু প্রেমিক-প্রেমিকা দেখে নীরেন। এদের দেখে একধরনের মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয় তার। প্রাথমিকভাবে মনে হয়, এইভাবে কোনো মেয়ের সঙ্গে সন্ধের ঝোঁকে ঘুরে বেড়ানো হল না এ জীবনে। পরক্ষণেই মনে ভেসে ওঠে এইসব মেয়েদের বাবাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখচ্ছবি। মেয়ে পার করার চিন্তায় ভালো করে ঘুম নেই। চেনা অচেনা সবাইকেই হয়তো বলে বেড়াচ্ছেন—দাও না ভাই একটা ভালো দেখে ছেলে—দেনাপাওনা বিশেষ দিতে পারব না, আমার সঙ্গতি তো জানো! মেয়ে এদিকে···। ছেলেদের প্রেম করার সময় নিজের পছন্দ—বিয়ের সময় বাবা। মেয়েরা কি শস্তা হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। কেন হচ্ছে?

কাগজে বধূহত্যার খবর পেলেই প্রশান্ত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে কেন? অবিবাহিত বলে কি? নাকি, অজানা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিজেরই কোনো গোপন ভয় থেকে···। আজকাল শুরুও হয়েছে তেমনি। রোজই একটা না একটা···। কী যে হচ্ছে আজকাল।

আজ অবশ্য একটু নতুন খবর শোনালো প্রশান্ত। প্রেমিকের সাহায্যে স্বামী খুন। সেটা অবশ্য সভ্য মানুষের ইতিহাসে আদৌ নতুন কিছু নয়। বরং এই লার্জ স্কেলে সমানে বৌ খুনের ব্যাপারটাই গণ্ডগোলের। প্রায় যেন একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বৌ খুন করাটা কি স্ট্যাটাস সিম্বল্ হয়ে গেল!

খুন জিনিশটাই আসলে জলভাত হয়ে গেছে একদম। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরাল নীরেন, হাঁটতে হাঁটতে।

তারপর নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভাবতে লাগল—দুটো একটা খুন করেও বহাল তবিয়তে লোকসমাজে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যেই বোধহয় জীবনের আসল

মজাটা লুকিয়ে আছে। আদারওয়াইজ, এভরিথিং ইজ ভেরি, ভেরি, পানসে। নো চার্ম।

নীরেন ধুয়ে আনলেও মেঘলা টিফিন বাক্সটা রোজ একবার মাজে। মেয়েলি অভ্যেসে তখন একবার নীরেনের ব্যাগ হাঁটকায় মেঘলা। কিছু একটা পাবার যে প্রত্যাশা থাকে তা নয়। অভ্যেস। আজ, চিঠিটা পেয়ে গেল।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকে লেখা বালুরঘাটের মালতী চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি ওর ব্যাগে কেন? নীরেন ঘাটে গা ধুতে গেছে। এসে চা মুড়ি খেয়ে তাসের আড্ডায় যাবে। নিশ্চয়ই সন্ধেবেলা আর চিঠির খোঁজ পড়বে না। মেঘলা দ্রুত ব্লাউজে ঢুকিয়ে নিল চিঠিটা।

গা ধুয়ে এসে সন্ধের মুখে ঠাকুরঘরে ধূপ দিতে ঢুকবে নীরেন। তখন হবে না। জলখাবার খেয়ে তাসের আড্ডায় চলে যাক আগে। তখন এক ফাঁকে।

নীরেন বেরিয়ে যাবার পরেই একতলার ভাড়াটে গিন্নি বাচ্চা কোলে গল্প করতে এল। দেখুন না দিদি, ছেলেটা এমন পাজি হয়েছে না, কী বলবো—একটা কাজও সুস্থির হয়ে করতে দিচ্ছে না!

বাচ্চাকাচ্চা দেখলেই মেঘলার মাথা খারাপ হয়ে যায়। পাঁচবছরে একটাও হল না। নীচের বৌটা সেকথা জানে। সুযোগও নেয়। সন্ধে হলেই বাচ্চাটাকে গছিয়ে দিয়ে এটা সেটা বকবক করে পালাবে। মেঘলা তখন বাচ্চাটাকে ভোলাবার জন্যে নিজের সাত কাজ ফেলে রেখে—। শাশুড়ি রাগ করে। অ বৌমা, এখন পরের মেয়ে নিয়ে ন্যাকড়া করলে চলবে। কী কথা! ফ্যামিলিটাই অশিক্ষিত! গাঁইয়া। গ্রামের জলকাদা অন্ধকার কোনোদিন সহ্য হত না। অথচ ঠিক সেই গ্রামেই বিয়ে হল। পুকুরঘাটে গিয়ে বাসন মাজো। গরু পাট করো। প্রথম প্রথম যা কষ্ট হত! এখন সয়ে গেছে।

শাশুড়ি এখন ঠাকুরঘরে ঢুকেছে। এ বাড়ির সবাই খুব গোপালভক্ত। সোনার জল মাখানো একটা গোপাল আছে। পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠার জিনিশ। এ বাড়িতে মানুষের চে তার খাতির বেশি। আদিখ্যেতা দেখলে গা জ্বলে যায়।

নিজের বৌকে নিয়ে কোথাও যাবার নামে গা ওঠে না। রাতদিন গোপাল আর গোপাল। এতই যদি গোপালের শখ তাহলে বিয়ে করতে গেলি কেন! কদ্দিন বলেছি—ডাক্তারের কাছে চলো। বললেই বলে—ডাক্তার দিয়ে কী হবে? ছেলে তৈরি করে আনবে নাকি। আমাকে দিয়ে মন উঠছে না! কী কথা!

আমার সঙ্গী বলতে সরলা। কোন গাঁ থেকে সাতসকালে আসে। সারা-দিন গাধার মতন খাটে। গতরও তেমনি। একবারে রাতের খাবার খেয়ে ফিরে যায়। দাদাবাবুর নামে কোনো কথা বললেই ফোঁস করে ওঠে। কারণে অকারণে বাপের বাড়ি গেলে আমাকে নিয়ে আসতে ভুলে যায় কেন নীরেন? কারণ কি সরলা? সরলার সম্পর্কে ভুলেও যদি কিছু বলি—এই এতটুকু বয়েস থেকে আমাদের বাড়িতে মানুষ, তা জানো? আগে কাজ করত ওর মা। বাবা মারা যাবার এক হপ্তার মধ্যে সরলার মাও চলে গেল। ভাগ্যিস সরলা বড় হয়ে গেছে ততদিনে। নইলে আমাদের যে কী হত!

নীরেনের বাবা মারা যাওয়ার সঙ্গে সরলার মা মারা যাওয়ার কি সম্পর্ক! সামান্য কাজের লোকের ওপর নীরেনেরই বা এত নির্ভর করার কী আছে। সরলা যেন বৌয়ের বাড়া।

বছর তিনেক আগে ঠেলেঠুলে সরলার বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নীরেনের কি মন খারাপ। ছ মাস যেতে না যেতে সরলা ফিরে এল। বরের নাকি চরিত্র খারাপ। ধরে ধরে পেটায়। ন্যাকা।

চিঠিটা পড়বার একটা অদম্য কৌতূহল হচ্ছে। কিন্তু পড়া যায় কী করে? পড়া যায় কোথায়? ঘরের মধ্যে খুললে যে কোনো মুহূর্তে শাশুড়ির চোখে পড়ার ভয় আছে। রান্নাঘরে সরলা। সিঁড়িতে? উঁহু। তাও হয় না। বাচ্চাটা এমন পাজি, ওর সামনে একটুও অন্যমনস্ক হবার জো নেই! সঙ্গে সঙ্গে চেঁচামেচি। একমাত্র নিরাপদ জায়গা হল বাথরুম। মেঘলা ঠিক করল, সেইখানেই যাবে। গেলেই অবশ্য, এ বাড়ির নিয়ম অনুযায়ী, গা ধুতে হবে, কাপড় কাচতে হবে। তা হোক। আগে, বাচ্চাটার ব্যবস্থা করা দরকার।

নীচে গিয়ে বাচ্চাটাকে দিয়ে আসার সময় আবার আটকে গেল মেঘলা। দিদি, চা হয়ে গেছে, খেয়ে যান। বসলেই কথায় কথায় দেরি হবে বলে মিথ্যে করে মেঘলা বলল—না ভাই, ভাত বসিয়ে এসেছি।... আরে বসুন না দিদি, ভাত হয়ে গেলে সরলা নামিয়ে দেবে। বসুন না। একটু তো চা।

সামান্য স্নেহের গন্ধ পেলেই কী যে হয় শরীরে। বসতেই হল। মেয়েদের অনেক কথা থাকে। অবান্তর, অপ্রয়োজনীয়, টুকিটাকি কথা। অথচ তার মধ্যে দিয়েই কখন যেন জানা হয়ে যায় যা জানার। যা জানা হল, সে কথাগুলো উচ্চারণ করে না কেউ, তবু, হয়ে যায়।

সে কথা এ কথার পর, বৌটা হঠাৎ বলে কি, দাদা আজকাল লেডিজ

কামরায় ফিরছে শুনছি—গলা নামিয়ে, ফিসফিস করে জানায় সে ; আমার উনি দেখেছেন, পরপর তিনদিন, আমি ভাবলুম—ভিড়ের ভয়ে একদিন দুদিন হতে পারে, কিন্তু রোজ—ভাবলুম কি, ব্যাপারটা আপনার জানার দরকার, ভালোর জন্যেই বলা, কিছু আবার মনে করলেন না তো···

সখী থেকে মুহূর্তে বাড়িউলি হয়ে উঠল মেঘলা। উনি বলছিলেন, ইলেকট্রিকের বিল বেশি আসছে। মিটারটা আলাদা না করা পর্যন্ত, বোধহয় আপনাদের দশটাকা করে বেশি দিতে হবে। আপনি একটু আপনার কত্তাকে দেখা করতে বলবেন। আমি ভাই—

নীরেন লেডিস কামরায় ফেরে। ব্যাগে অন্য মেয়ের চিঠি থাকে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কি নীরেনের দেওয়া কোনো গোপন ঠিকানা ?

সুইট ঠাকুরপো,

আমাকে বাঁচাও। আমি আর পারছি না। তোমাদের ছেড়ে এখানে এসে পর্যন্ত সাংঘাতিক মনোকষ্টে আছি। রোজ সকালে রান্নাবাড়ি সেরে মাম্পি বাবাইকে স্কুলে দিয়ে আসি। তোমার দাদা রোজ খাবার সময় ঝামেলা করে। আমার রান্না নাকি মানুষের অখাদ্য। ইদানীং খুব ঠাকুরভক্তি বেড়েছে। সবসময় আমার ওপর মেজাজ। কিছুতেই অফিস যেতে চায় না। রোজ ঠেলে ঠেলে পাঠাতে হয়। আজকাল বলছে—দুপুরে আমি নাকি বাড়িতে লোক ঢোকাই। মাঝে মাঝেই মাম্পি বাবাইয়ের সামনেই অকথ্য গালি দেয়। লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে বলতে, তবু তোমার কাছে বলতে বাধা নেই—যখন তখন, আমি প্রতিবাদ করলেই, মারধোর করে। ওখানে তবু তোমরা ছিলে। এখানে, ওকে সামলাবার কেউ নেই। আমি নাকি মাম্পি বাবাইকে কুশিক্ষা দিচ্ছি। আমার দোষ ওরা আমাকে ভালোবাসে। তোমার দাদা আজকাল আমাকে দুচক্ষে দেখতে পারে-না। আমি কিছু বললেই—খুন করবো, গলা টিপে মেরে ফেলবো, বলে শাসায়। ইচ্ছে করে, যেদিকে দু চোখ যায় চলে যাই। শুধু মাম্পি বাবাইয়ের কথা ভেবে পারি না। আমি একদিন অনেক কষ্টে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেসলাম। ডাক্তার এই ওষুধগুলো লিখে দিয়েছে। তুমি ওষুধগুলো কিনে পাঠিয়ে দাও। পারলে, নিজে একবার এসো।··· প্রেসক্রিপশনটা জুবড়ে গেছে।··· ভালোবাসা নিও—ইতি, অভাগিনী মালতী বৌদি।

বাথরুমে আস্তে আস্তে বসে পড়ল মেঘলা, এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। হাত-পা কাঁপছে। এই চিঠি নীরেনের কাছে কেন ? প্রায় এই কথাগুলোই তো আমিও

লিখবো ভাবছি। অবশ্য ঠাকুরপোকে নয়, নিজের ভাইকে, নীরেনের কোনো ভাই নেই। একটা বোন ছিল, সে গলায় দড়ি দিয়েছে অনেকদিন হল। কেন, কেউ বলে নি। মালতীর সঙ্গে তফাৎ শুধু—আমার কোনো মাম্‌পি বাবাই নেই। মালতীর আছে।

না থাকার জন্যে দুঃখ হত এতদিন। আজ মনে হল, ভাগ্যিস্‌ নেই।

চিঠিটা জামায় ঢুকিয়ে গুম হয়ে বসেছিল মেঘলা। ভাবছিল, ভাইকে লিখবে —আমি যেভাবে বেঁচে আছি, সেভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে না থাকা ভালো। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, এরা আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারলে বাঁচে।…

শাশুড়ির গলা শোনা গেল। অ বৌমা, শরীর খারাপ হল নাকি। অবেলায় বাথরুমে বসলে, এদিকে… ।

দাঁতে দাঁত চেপে উঠে দাঁড়াল মেঘলা।

ট্র্যাজেডি এই, যে তাকে এখন হাসিখুশি মুখ করে থাকতে হবে। বৌ মানুষের মুখ গোমড়া থাকলে সংসারে নাকি, অকল্যাণ হয়!

অঞ্চল প্রধান কালী নস্করের এক নম্বর চামচা শিবু পাল। তাসের আড্ডা এই শিবুর বাড়িতে। জমিজমা ছাড়াও কেরাসিন তেলের ডিলার শিবু, একটা মুদিখানা, আর একটা মনোহারী দোকানও আছে। সেসব দেখে ছেলেরা। বড় ছেলের বিয়ে দেবার দু-মাস পরে শিবু পালের নিজের একটি কন্যাসন্তান হয়েছে। সন্তানেরা সবাই ছেলে বলে শিবুর আপসোস ছিল। শেষ বয়সে মেয়ে হতে সে উৎফুল্ল। পাড়াপড়শীর ঠাট্টা ইয়ার্কিতে কান দিচ্ছে না। কেউ বেশি কিছু বললে তাকে খাইয়ে দিচ্ছে উলটে।

নীরেনের পার্টনার অনন্ত চাটুজ্জে শাদাসিধে ইস্কুলমাস্টার। বাংলার টিচার বলে টোল খুলতে পারেন নি। প্রায়ই ভুল খেলার জন্যে নীরেনের কাছে বকুনি খান। আজ কিছুক্ষণ খেলার পর নীরেন বলে ফেলল—কি ব্যাপার শিবুদা, মেয়ের বাপ হয়ে কপাল খুলে গেছে দেখছি। এত ভাল হাত পাচ্ছেন কী করে? অন্যদিন শিবু পাল তাস ভালো পেলে নীরেন অনন্তকে ধমকাতো।

এখন আমার পাওয়ার টাইম। তা, তোমাকে বাপ হতে বারণ করেছে কোন শালা! আর কদ্দিন আঁটকুড়ো হয়ে থাকবি বাপ.।

নীরেন শুকিয়ে যেতে যেতে বলল—ভাবছি আর একটা বিয়ে করব। এই বৌটা…

নীরেন ভুল খেলছে দেখে শিবু পাল পটাস্ করে একটা তাস ফেলে মুখের কথাটা কেড়ে নিলেন : বাঁজা, তাই না ? নাচুনির আর কি দোষ ভাই, উঠোনটাই যে ব্যাঁকা !

কথা পালটাতে নীরেন বলল, কলকাতায় আজ যা একখানা মিছিল দেখলাম না, ফাসক্লাশ।

অনন্ত বলল—মিছিল আবার ফার্স্ট ক্লাশ কি করে হয় ?

এ মিছিল সে মিছিল নয় চাটুজ্জে। মেয়েদের মিছিল। শস্তায় বর চাই। পণের কড়ি গুণতে রাজি নয়। বুঝলে ?

অনন্ত বিপত্নীক। সুযোগ পেয়ে শিবু পাল বলল—নিখরচায় বিয়ে কম্বতে চায়, তা নয় হল, কিন্তু দোজবরে আপত্তি আছে কিনা জিগেস করেছেলে ? আমাদের অনন্তকে তালে—।

বলেই খ্যা খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগল শিবু পাল।

এগারোটার আগে তাসের আড্ডা ভাঙে না।

বাড়ি ফেরার সময় নীরেন খেয়াল করল, আজ টর্চ আনা হয় নি। বিরক্ত মনে বাইরে বেরোতেই অবশ্য বিরক্তিটা কেটে গেল। বাইরে মেঘ ফুঁড়ে মিহি চাঁদের আলো। আকাশে চাঁদটাকে ঠাহর হয় না।

মা শুয়ে পড়েছে। ঘুম অবশ্য খুব পাতলা। সরলা বাড়ি চলে গেছে। মেঘলা না উঠলে মা দরজা খুলে দেয়।

আজ অবশ্য একবার কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিল মেঘলা। জেগে আছে তাহলে।

ঘুমোও নি ?

মেঘলা কোনো উত্তর দিল না।

নীরেন হাত পা ধুয়ে খেতে বসলে, পাশে বসে হাত পাখার বাতাস করতে করতে মেঘলা শান্ত গলায় বলল—তুমি লেডিজ কামরায় ফেরো ?

ভাতের গ্রাসটা মুখের কাছে তুলেও নামিয়ে নিল নীরেন। ভোম্ মেরে বসে রইল একটু। তারপর নির্বিকারভাবে খেতে খেতে বলল—একতলার ওদের ইলেকট্রিকের বিলের কথা বলেছ ?

তোমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছি।

সব ভাত ভালো করে না খেয়েই নীরেন উঠে পড়ল।

শুলেই ঘুমিয়ে পড়ে মেঘলা। আজও পড়ল।

বারান্দায় পায়চারি করতে করতে সিগারেট খাচ্ছিল নীরেন। আসলে, সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল।

ঘরে, হালকা, সবুজ আলো। মেঘলার শখ। নইলে, এ বাড়িতে জন্মে কেউ নাইট ল্যাম্প ব্যবহার করে নি।

এই ঘরেই, নীরেনের একমাত্র বোন, গলায় শাড়ি পেঁচিয়ে পাখার নীচে ঝুলে পড়েছিল। আজ, মেঘলা ঝুলবে।

এবার আর লেখাপড়াওলা শহরের মেয়ে নয়। নগদ তিরিশ হাজার গুণে কোনো সদ্‌গোপের মেয়ে ঘরে তুলবে। বয়েস হবে—এই, আঠারো থেকে কুড়ি।

বেড়ালের মত বিছানায় ঢুকল নীরেন, মশারি তুলে।

ঘুমন্ত শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে, বুকের ওঠানামা দেখল একটু।

না। মায়া করলে চলবে না। একটু বাদে, বৃষ্টি এলেই ছাদ চুঁইয়ে জল পড়বে। এই ফুটো সংসার আর না।

মেঘলা কি স্বপ্ন দেখছে? আহা, দেখুক। ঠোঁটের কোণে যেন বাঁকা হাসি!

হাঁটু গেড়ে বসে, খালি হাতে মাছ ধরার মত করে—হাত দুটো মেঘলার গলার কাছে নামিয়ে আনছিল নীরেন, সতর্ক ও ধীর, ধ্রুব ভঙ্গিতে। যেন চেঁচাবার সুযোগ না পায়!

কণ্ঠনালী যখন আর ইঞ্চিখানেক মাত্র, নীরেন দেখল, মেঘলার জামার ফাঁক দিয়ে, শাদা স্তনের ওপর, উঁকি মারছে একটা আকাশী নীল রঙের খাম।

শিরদাঁড়ার ওপর দিয়ে একটা সাপ যেন নীচের দিকে নেমে গেল দ্রুত।

হাঁটু গেড়ে, প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে থাকতে থাকতে, নীরেন ঘামতে লাগল। মেঘলার ঘুমন্ত শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে, সেই আকাশী নীল খামটির মৃদু ওঠানামা দেখতে লাগল নীরেন।

ফল ভালো হবে না

আমি চলে এলাম। রিকশার ভাড়াটা দিয়ে দাও।

কেমন অপ্রকৃতিস্থ দেখাচ্ছে মিনুকে, উত্তেজিত তো বটেই। রোগাসোগা হারজিরজিরে গঙ্গাকে বেশ জবুথবু দেখাচ্ছে, যেরকম থাকা তার স্বভাব নয়। চিলের মত চিৎকার করে গঙ্গা, চিবিয়ে কিছু খেতে চায় না। গিলে গিলে খায়। ছেলেকে খাওয়ানো একটা ঝামেলার কাজ, অন্তত যে সব মায়েরা একা, তাদের কাছে তো বটেই। মিনুকে তো একা হাতেই সামলাতে হয় সব। কেউ কেউ এক্সপার্ট হয় এসব ব্যাপারে। অনেকে হয় না। মিনু তেমন এক্সপার্ট নয় কোনদিনই, সংসারের কাজ সামলাতে কেমন ল্যাজে গোবরে হয়ে যায়। চুঁচ-ড়োতে ওদের রেডিও কোয়ার্টারে, গিয়ে দেখেছি। দাড়ি কামাচ্ছিল গোলোক। মেঝের উপর বাবু হয়ে বসে, ছোট চৌকো আয়নাটা ষ্ট্যাণ্ড দিয়ে আটকানো। এই, ত্যাখো, কে এসেছে। গোলোক চেঁচালো, মুখে শাবান মাখা, ব্লেড পরাচ্ছিল রেজারে। মিনু এসে প্রথম কথাটাই বলল—এই যে মেদ্দা, রাজীব কি খারাপ? কী সুন্দর দেখতে রাজীবকে! বলো তুমি? জ্যোতি বসু কি বুড়ো! তোমার জামাই খালি বলে জ্যোতি বসু নাকি প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাবে। সত্যি সত্যি? মেদ্দা?

শাবান ভর্তি মুখ নিয়ে হাসে গোলোক। মেজদাকে বসতে বলো! ওসব কথা…।

ঘরদোর বেশ অগোছালো। কোন কাজই মিনু ঠিক গুছিয়ে করতে পারে না। হ্যারিকেনে তেল ঢালতে গেলে ঘরময় কেরাসিন ছড়ায়। বিছানার একপাশে গাঁট করা কাপড় চোপড়, তোষক বালিশ। কোয়ার্টারের রান্নাঘর বেশ বড় সড়, আর বড় সড় বলেই যেন বাসন কোসন চারিদিকে ছড়িয়ে রাখার

সুবিধে। তবু গোলোক বড় সুবোধ, অগোছালো, বোকা-বোকা বৌ নিয়ে সুখেই থাকতো। রাজ্য জয় করার আনন্দ নিয়ে বলতো—গাঙ্গু এ বি সি ডি শিখেছে, এক থেকে একশো পর্যন্ত গুনতেও পারে! তাহলে…

রিকশার ভাড়াটা দিয়ে এসে লক্ষ্য করি, সঙ্গে কোনো জিনিসপত্রও আনেনি মিনু। ভারী হয়ে যাওয়া শরীরটা সোফার ওপর ছেড়ে দিয়েছে। আটপৌরে ধরনের তাঁতের শাড়িটা পাট ভাঙা ইস্ত্রি করা নয়। নেহাৎ রঙটা ফর্সা বলে, মুখশ্রী সুন্দর বলে—বেমানান লাগছে না। গঙ্গা অথবা গাঙ্গু, গাড়ির চাকা ছাড়া যার পৃথিবীতে আর বিশেষ কিছু সমস্যা নেই—তাড়াতাড়িতে একটা তোয়ালে গেঞ্জি পরিয়ে দিয়েছে তাকে মিনু; প্যাণ্টটা টাইট, সরু উরুতে এঁটে আছে। ইতিমধ্যেই কোত্থেকে একটা কৌটোর ঢাকনা পেয়ে গেছে সে, বিছানার ধারে ধারে সেটা দিয়ে 'চাকা' চালাচ্ছে। গঙ্গা অথবা গাঙ্গু অথবা গঙ্গু কিংবা গুঙ্গা, —জিজ্ঞেস করলেই বলে: চাকা ঘুরছে! কিসের চাকা, কেন ঘুরছে, চাকা ঘুরলে কি হয়, সেসব কিছুই সে জানে না। না, তা নয়; চাকা ঘুরলে কি হয় তা সে জানে—চাকা ঘুরলে গাড়ি চলে। রোজ রাতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে তার বাবার কাছে চাকার গল্প শোনা চাই, চাকার গল্প মানে গাড়ির গল্প—কতরকম গাড়ি, কতরকম চাকা; সে শুধু বাবা জানে আর ছেলে জানে। বাপ ছেলের নিজস্ব জগতে যে চাকা ঘোরে…।

আমি বলে আসিনি কাউকে। আবার ঘোষণা করে মিনু একইরকম ভঙ্গিতে। কিছু জিগ্যেস করার আগেই। যেন নিজের ব্যবহারের অসঙ্গতির জবাব সে নিজেই দিয়ে দিচ্ছে। অবধারিত, প্রাসঙ্গিক, অনিবার্য, স্বাভাবিক প্রশ্নগুলোর উত্তর। অর্থাৎ, অনাকাঙ্খিত সেই ঘটনার কথা সে নিজেই বলবে; যার ফলশ্রুতি এই চলে আসা; ঢিমে তেতালা অগোছালো সংসারে তার হঠাৎ এই ছন্দপতনের মূল কারণ; এসব তারই প্রস্তুতি। বেশীক্ষণ চুপ করে থাকা তার স্বভাব নয়, কিংবা নিজের যন্ত্রণা নিজের মনের ভেতর চেপে রেখে গুমরে মরাও তার ধাতে সয় না। কিন্তু, যতক্ষণ না বলে, ততক্ষণ তো কিছু জিগ্যেস করাও যায় না। বিশেষতঃ, যেভাবে, সোফায় এলিয়ে, ফাঁকা ফাঁকা চোখে চেয়ে আছে…।

মিনু ছিল আসলে মিনতি, বিয়ের পর সে হয়ে গেছে মিনা। 'বোন' বলেই তাকে ডেকে এসেছি বরাবর, মিনু ব'লে তাকে মা-ই ডাকে। বাড়িতে বোন থাকলে যা হয়, এই বোন—জল দে, এই বোন—ওই কর, এই বোন—তাই কর, ব'লে তাকে ব্যতিব্যস্ত করাটাই ছিল দাদাদের প্রিয় কাজ, বিলাসিতা।

ক্লাশ এইটে পড়তে, গোলমালটা ধরা পড়ল প্রথম। নেতাজীনগর গার্লস হাইস্কুল থেকে ফেরার সময় কে বা কারা, শেষ অপরাহ্নে, কলোনীর মোড়ে, তার হাত ধরে টেনেছিল। অন্ততঃ, তারপর থেকে শুরু হওয়া, তার অবিরাম স্বগত ভাষণ থেকে আমরা সে রকমই জেনেছি। প্রথম দিকে, সারাদিন সারারাত, বকবক করতো সে। কখনো উত্তমকুমারের উদ্দেশ্যে, কোন ছবিতে কখন কত ভালো অভিনয় করেছেন তিনি, তুমি তুমি করে সেসব কথা সরাসরি উত্তম-কুমারকেই জানাতো সে; যেন গভীর ভাবে বিশ্বাস করতো—তার সব কথা উত্তমকুমার শুনতে পাচ্ছে! দুতিন দিন পরে একদিন সরাসরি সে আমাকে ধরেছিল—আচ্ছা মেন্দা, তুমি তো অনেক মেয়ের সঙ্গে মেশো, তোমার তো মেয়ে বন্ধু অনেক আছে, বাড়িতেই তো কতজন আসে—তুমি বলো তো, চেনা নেই, জানা নেই, হঠাৎ যাদের হাত ধরে টানা যায়, আমি কি তাদের মতন দেখতে?

ক্রমশঃ, শুকিয়ে যাচ্ছিল মিনু। ভালো করে খেত না; ঘুম তো ভুলেই দিয়েছিল একরকম, সারারাত বকবক করত। খোকন পাড়ারই ছেলে, খুব যে তেমন কিছু মস্তান তাও নয়; তবে দাদাগিরি যে আদৌ করে না তাও নয়। 'হেমামালিনী' বলার অপরাধে তাকে একদিন সোজা চড় মেরে বসল মিনতি। হেমামালিনী মিনুকে কমবেশী সবাই বলতো মুখের মিলের জন্যে যতটা না, গায়ের রঙ, চেহারা—সবকিছুর জন্যেই। মিনু তাতে অখুশি হয়নি কোনদিনই, যতদূর জানা যায়। বাড়িতেও আমরা সময়ে অসময়ে তাকে ওই নামে যে কম খেপিয়েছি তা নয়; 'হেমা মালিনী কি আমাদের রুটিগুলো সেঁকে দিতে পারবে? অবশ্য স্যুটিংয়ের চাপ যদি তেমন না থাকে আর কি।' এক্ষেত্রে, স্যুটিং মানে আড্ডা, বাড়িওলার মেয়ের সঙ্গে আনন্দলোক দেখা, ইত্যাদি। খোকন এমন কিছু খারাপ ভাবেও বলেনি কথাটা, বিশ্বাসদের বাড়ি থেকে ফেরার পথে, বাবুই-দের বাড়ির সামনে, ঘটনাটি ঘটে। হেমা মালিনী আজ এলোকেশী—এরকম কিছু বলে থাকবে খোকন। তাতেই—এদিকে শোনো একটু—বলেই সপাটে চড়টা মারে মিনতি—এবং সঙ্গে জুড়ে দেয়—তোমাকে আমি দাদা বলে ডাকি। অন্ততঃ বাবুই সেরকমই জানায়। খোকন যে কেন হজম করে গেল, আজও বুঝতে পারিনি। এমনিতে খোকন হজম করে যাওয়ার ছেলে নয়। বোধ হয় মিনতির সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কথা শোনা ছিল।

ডাক্তার লিথোসান দিয়েছিল। সঙ্গে লার্গাকটিল আর রিডাজিম। তাতে

বকবক করল ঠিকই, তবে স্কুলে আর গেল না মিনতি। টিভি'র পোকা হয়ে পড়ে রইল বাড়িতে। অধিকাংশ সময় ঘুমোতো। একদিন বললো—অনন্যা'য় উৎপল দত্ত'র 'ঝড়' বই দিয়েছে, উৎপল দত্ত তো হাঁসায়। ঝড় কি হাসির বই, মেজদা? তাকে সংক্ষেপে জানাই—না। বিপ্লবের বই। সে সঙ্গে সঙ্গে জানায়—ওহ, বিপ্লবের বই, তাহলে দেখবো না। 'তাহলে' শুনে জিগ্যেস করতেই হয়—কেন? নির্দ্বিধায় জবাব দেয় মিনু—ওসব বিপ্লবের বই আমার ভালো লাগে না। আমার ভালো লাগে প্রেমের বই। একটা গান তখন প্রায়শই গুনগুন করত মিনু—আশা ছিল, ভালোবাসা ছিল। আজ আশা নেই—। মাঝে মাঝে আমারই যে ওর গলাটা টিপে ধরার ইচ্ছে হত না তা নয়; তবে টিপে ধরতে হলে ওর আগে আরও অনেকেরই যে গলা টিপে ধরতে হয়। গানের যা অবস্থা—। ওর আর কি দোষ। নেতাজীনগর গার্লস হাইস্কুলে ক্লাশ এইট পর্যন্ত প'ড়ে তো আর শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে থাকা যায় না! তার জন্যে অন্য সোস'ইটি দিতে হয়।

'গঙ্গার দুধ খাবার টাইম হল।' মায়ের দিকে তাকিয়ে কথা বলে মিনতি। সোফায় একইরকমভাবে বসে আছে সে এখনও। তার ভাবগতিক দেখে মা পর্যন্ত তার বিশেষ কাছে ঘেঁষছে না। 'গোলোক ভাল আছে তো?' মিন মিন করে একবার জিগ্যেস করেছিল। 'তোমার জামাই খারাপ থাকতে যাবে কোন দুঃখে?' গাঁক গাঁক করে উঠেছিল মিনু। তারপর থেকে মা আর—।

বস্তুত, মিনুর ব্যাপারে, মায়ের একটা নির্দিষ্ট অপরাধবোধ আছে। তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা মা-ই করেছিল। ডানলপের কাছে বাড়ি ভাড়া নিয়ে যতটা সম্ভব ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল মিনুর। জামাই গোলোক সত্যিই বড় সুবোধ, মাংস পর্যন্ত খায় না। রেডিও অফিসে টেকনিসিয়ান। বিয়ের ফটোতে মিনতিকে রাজেন্দ্রানীর মত লাগছিল।

কয়েক মাস যেতে না যেতে শাশুড়ি এসে তুলকালাম করে গেল। জেনেশুনে পাগল মেয়েকে গছিয়ে দিয়েছেন? লজ্জা করে না? ইত্যাদি। গোলোক এসে সান্ত্বনা দিয়ে গেল। আমি থাকতে আপনার কোন চিন্তা নেই। আপনার মেয়ে একটু বেশী সরল, ভালোমানুষ। মাথা খারাপ ভালোমানুষদেরই হয়। কলকাতা থেকে ট্রান্সফার নিয়ে চুঁচড়োর রেডিও কোয়ার্টারে চলে গেল গোলোক। পারিবারিক চাপ থেকে বৌকে বাঁচাতেই। সেখানে বেশ ভালোই ছিল ওরা। হঠাৎ এমন কি হল যে—।

এখানে যতদিন এসেছে আগে, ঘুম ভাঙলেই এক গ্লাস জল নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াত মিনু রোজ সকালে। ঘুম থেকে উঠেই হয়তো বিছানা থেকে নামবার আগে বাবু হয়ে বসে আছি, জলটা নিয়ে এসে বলতো—জল খাও। যেন এখন জল খাওয়া ছাড়া আর কিছু করা যায় না। কোনদিনই ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসে জল খাই না। তবু জলটা খেয়েই মনে হল, ঠিক এইটাই যেন প্রয়োজন ছিল। ঠিক এইটাই যেন করে আসছি সারাজীবন।

টিভির পোকা হয়ে থাকা রোগটা এখনও যায়নি। শনি, রবিব'র সিনেমা দেখার জন্যে সারা সপ্তাহ হাঁ করে থাকে। নিজের বাড়িতে নেই তাতে কি। যেখানে আছে সেখানে গুংগাকে নিয়ে ড্যাং ড্যাং করে চলে যায়।

মিনুর স্কুলের বন্ধু গোপা এল। বি কে সি কলেজের ফার্স্ট ইয়ার। বিরাট দীঘির ধারে কলেজ। দোতলা থেকে দেখেছে রিকশায় মিনুকে আসতে।

সে-ও একাই কথা বলে গেল অনেকক্ষণ। মিনুর কোনো ভাবান্তর নেই। সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফিরে দেখি, গোপা আবার এসেছে, সঙ্গে তার দিদি। দিদির বিয়ে একটা হয়েছিল, কিসব গণ্ডগোলের জন্যে শ্বশুরবাড়ি যায় টায় না। এখানেই থাকে। বাচ্চাদের পড়ায়। আমার ছেলেকেও পড়ায়। স্ত্রী মারা যাবার আগে দুজনের খুব ভাব ছিল।

সুধাদি, আমার যদি এখন আর একটা বাচ্চা হয়ে যায়, আর সেটা যদি আমি তোমাকে দিয়ে দিই, তুমি তাকে মানুষ করে দেবে?

মিনতি গোপার দিদিকে বলছে।

সুধা জোর করে হাসল। মিষ্টি করে, হাসতে ইচ্ছে করছে না, হাসি আসছে না তাও, বোধহয় গুরুত্বটা হাল্কা করে দেবার জন্যেই। ওই ভাবেই বলল—হয়তো আমি সবচে হ্যাপী হয়ে যাবো সেরকম হলে। দিবি, একটা বাচ্চা? তোর কোনো খবর আছে নাকি?

এতেও কোনো ভাবান্তর হল না মিনুর। মায়ের কাছে সারাদিন ও নাকি কথাই বলেনি। গোপা আর সুধা অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করার পর এই একটা কথাই বলেছে শুধু।

গুংগা সারাদিন আমার ছেলের সঙ্গে দাপাদাপি করেছে। সন্ধে হতে না হতেই ঘুমিয়ে পড়ল। রাতের খাওয়া শেষ করে একটা ডায়েরি আর পেন্সিল এগিয়ে দিলাম মিনুকে।

খস খস করে কিছু একটা লিখেই গুংগার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল মিনু।

নিজের ঘরে এসে ডায়েরি খুলে দেখি মিনু লিখেছে—এঁকাবেঁকা গোটা গোটা অক্ষরে এলোমেলো লেখা—যে বাড়িতে টিভি দেখতে যাই তাদের ছেলেটা আমার সরলতার সুযোগে আমার···। আমাই জানে না। চুঁচড়োর রেডিও কোয়ার্টারে আমি আর ফিরবো না।··· প্রথমেই মনে হল, ব্যাপারটা অমূলক, কল্পনামাত্র, আতঙ্কের অযথা প্রতিক্রিয়া, অথবা নিতান্তই সম্ভাবনা থেকে জাত কোন মানসিক বিভ্রম নয় তো? প্রথম দিন থেকেই ডাক্তার বলে আসছে, এক ধরনের অমূলক ভয় ওকে উৎপীড়ন করে। একটা বিশেষ কোনো ভয়ের কথা ক্রমাগত ভাবতে থাকার ফলে ঘটনাটা সত্যি সত্যি ঘটে গেছে বলে মনে করতে থাকে এই ধরনের পেশেণ্টরা। সত্যি সত্যি ঘটে গেলে যা যা হতে পারতো— সে রকম সব প্রতিক্রিয়া ফুটে ওঠে তার ব্যবহারে।

এটাই তাহলে, সেরকম নয় তো? সে রকম হলে কি, এত তন্ময় স্তব্ধতা আসে মানুষের, আসতে পারে? প্রাণোচ্ছল, বোকাসোকা, কোনো চঞ্চল যুবতীর যাবতীয় ফুল্লতা হয়ে যেতে পারে অস্তমিত? অকারণে শুধু ভয় পেতে পেতে! না বোধহয়। বরং সে শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে উঠতে পারে ধীরে ধীরে, অথবা আপাত-অসংলগ্ন কোনো বদভ্যাস তৈরী হতে পারে তার অবদমিত কোনো বিকারের স্পৃহা থেকে। কিন্তু, এই শূন্যময়, শান্ত স্তব্ধতা? অন্তত, মিনুর মত মেয়ের!

বাবা, তুমি সিগার্ট কিনবে না?

ছেলের প্রশ্নে চমকে উঠতে হয়। আমি সিগারেট কিনবো কিনা তা দিয়ে তার কি দরকার? কেন বল্‌তো?

কেনো না। খাবে তো। খাবে না? বাপ্‌পা নাছোড়। আমাকে সিগারেট খেতে দেখলে ওর মা খুব রেগে যেত। সে কথা বাপ্‌পা জানেও না। মাকে সে চোখেই দেখেনি। বাপ্‌পাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু, আমার সিগারেট খাওয়া নিয়ে সে এত ব্যস্ত হচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই মতলব আছে কিছু। রবিবারের বিকেল। ঘুম থেকে উঠেই ঠাকুমাকে হুকুম করল—সাজিয়ে দাও। বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাবো। বাপ্‌পা কিছু একটা একবার বলে ফেললে সেটা না করার কোনো প্রশ্নই আসে না। মা মরা ছেলে। ঠাম্মা আর পিসিদের প্রশ্রয়ে দামাল হয়ে উঠছে দিনদিন। সুধা ওর নাম দিয়েছে আরণ্যক। নামটা প্রমাণ করছে প্রতিদিন। সুধা ছাড়া ওকে আর কেউ পড়তে বসাতে পারে না। নাম জিগ্যেস করলেই বড় বড় চোখ মেলে

গম্ভীরভাবে বলে—শিরি আম্মণ্যক চক্কোবত্তি।

আস্তাবলের মোড়ে ছোড়দার দোকানের সামনে দাঁড়িয়েই পড়ল বাপ্‌পা। সিগাট কেনো মা বাবা। আবার বলল।

ব্যাপারটা কি? কিনেই দেখা যাক। কিনে ধরিয়ে, দু-একটা টান দিয়ে, জিগ্যেস করি—হয়েছে? চল্‌।

তখনো দাঁড়িয়ে আছে বাপ্‌পা।

কি হলো?

তুমি সিগাট খাচ্ছো কেনো? আমি লজেন খাবো।

এতক্ষনে বোঝা গেল আমাকে বারবার সিগারেট কিনতে বলার প্রকৃত উদ্দেশ্য। দাঁত খারাপ হয়ে যাবার অজুহাতে ওকে কিছুতেই লজেন্স কিনে দেওয়া হয় না যে! ফেরার সময় দোতলার বারান্দায় সুধামাসীকে দেখেফেলেছে বাপ্‌পা। অর্থাৎ—

বাপ্‌পা আবার দাঁড়াল। সুধা-মার বাড়ি চলো। মাসীর বদলে সুধা-মা ডাকটা সুধাই শিখিয়েছে। সুধা-মা তো একটু পরেই তোমাকে পড়াতে আসবে।

আজ রবিবার না? টি ভি দেখবে তো। ঠিকই বলেছে বাপ্‌পা। সুতরাং যেতেই হল। প্রচুর খাওয়ায় ওরা বাপ্‌পাকে। দাদাদের কণ্ট্রাক্টরির পয়সা। শাড়ি ছেড়ে শালোয়ার কামিজ পরে এল সুধা। সিঁদুর-চিহ্ন খুব কম, ভালো করে না তাকালে নজরে পড়ে না। বাপ্‌পাকে ভেতরে নিয়ে গেছে গোপা। বাইরের ঘরে বসে সুধা বলল—কি করবেন তাহলে?

এরকম প্রশ্ন শুনলে চমকে উঠতেই হয়। কি ব্যাপারে?

মিনুকে…

ওহ্‌। দীর্ঘশ্বাস ফেলে চায়ে চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরাই। খাজনার গোড়ে জমি কিনেছে গোলোক। কোয়ার্টার ছেড়ে দেবে। বস্তুতঃ, পরের দিন সকালে, গোলোক এসে মিনুকে যে নিয়ে গেছে, সে কথা তো সুধা জানেই।

ছেলেটাকে কিছু…।

কি বলতে চায় সুধা? মিনুর ওপর যে অত্যাচার করেছে তাকে গিয়ে মারধর করার কথা? ছেলেটা কি একাই অপরাধী? গোলোকের নাইট ডিউটি থাকে প্রায়ই। মিনুও তো তার সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বকবক করত যখন তখন।

কি. হবে? উদাসীনভাবে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলি। গোলোক তো খাড়ি করে উঠে যাচ্ছে।

আপনার কোনো ই নেই। পায়ের ওপর পা তুলে হেলান দিয়ে বলে সুধা। ওড়না না থাকায় বুকের অবয়ব স্পষ্টতর হয়।

বিয়ের পর কেন স্বামীর ঘর না ক'রে বাপের বাড়িতে ফিরে এল সুধা, সে ব্যাপারে কাউকেই কিছু বলেনি সে। কানাঘুষোয় শোনা যায়, ছেলেটা সুবিধের নয় নাকি। আসল ব্যাপারটা কেউ জানে না। পরে শুনেছে, সে বাড়িতে নাকি অনেক মেম্বার, শ্বশুর অসুস্থ, সারাদিন রান্নাঘরেই কেটে যেত, শাশুড়ি দোষ ধরত নানারকম, সবসময়—এসব কারনেই চলে এসেছে সুধা। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। দাদাদের কণ্ট্রাকটরির কাঁচা পয়সার জোয়ারে সুধা বিলাসিতাপ্রিয়, মেজাজী। 'আবার বিয়ে করো'—কথাটা আলগাভাবে ছুঁড়ে দিতে, একবার মোক্ষম জবাব দিয়েছিল সুধা। 'আপনার মত ছেলে পাওয়া যাবে?' ইঙ্গিতটা এত স্পষ্ট, আর কথা বাড়াইনি কোনদিন। আমার যে অনেক ব্যাপারেই কোনো 'ই' নেই, সে অভিযোগ সুধার অনেকদিনের। সুধার সঙ্গে বিয়ের কথাও একবার হয়েছিল। বোনের বন্ধুর দিদি, এবং আর্থিক অবস্থা অনেক ভালো বলে বাতিল হয়ে গেছে। বড়লোকের আদুরে মেয়ে এনে লাভ নেই—মা বলেছিল।

আমরা কাশ্মীর যাচ্ছি। আপনি যাবেন?

সুধার প্রশ্ন। 'আপনি' বলল সুধা, 'আপনারা' নয়।

তোমার সঙ্গে আমি কোথাও যাবো না সুধা। উঠে দাঁড়াই ধীরে।

চোখ দুটো ছোট ছোট ক'রে ভুরু কুঁচকে তাকায় সুধা। কি বলতে চান?

'চলে এলাম' ব'লে মিনু যেদিন এল, তখন আমার যেরকম লেগেছিল—সেরকম মানসিক অবস্থার মধ্যে তোমার দাদাদের ফেলতে চাই না। নতুন করে, অন্ততঃ আমার কারণে···।

এবার উঠে দাঁড়াল সুধা।

আমার দাদারা তোমার মতো অপদার্থ নয়।

আপনি'র খোলস ভেঙে পড়েছে। সরাসরি তুমি বলেছ সুধা। মাঝে মাঝে বলে।

সারাজীবন ধরে তুমি শুধু উপেক্ষা করে আসছো। আমাকে উপেক্ষা করার ফল ভালো হবে না কিন্তু। সুধার রাগত চোখদুটি ছলছল করে উঠল।

এই ধরনের কথাবার্তা সন্তানদল দেওয়ালে লিখে রাখে। সাবধান, অডিট চলছে। বেদে আছে বিপ্লব। পরিনামে ফল ভালো হবে না! বেশ ঠাণ্ডা মাথায় কথাগুলো বলি।

সুধা স্থির চেয়ে থাকে। যেন আহত, বিধ্বস্ত, বাঘিনী। সামনেই শিকার রয়েছে। অথচ ঝাঁপ দেবার কোনো উপায় নেই।

বাবা, বাবা, দেখো, গোপামাসী কি দিয়েছে দেখো। বাপ্‌পার দুচোখে খুশির ঝলক। হাতে একটা খেলনা মোটর।

সুধা চকিতে স্বাভাবিক হয়ে গেল। ওটা রিমোট কণ্ট্রোল। দেখবে? ব'লে চালিয়ে দেখাল। অপারেশন সুইচটা গোপার কাছ থেকে নিল।

বাপ্‌পা—তোমার গাড়ি এবার কোনদিকে যাবে, ডানদিকে না বাঁদিকে?

ডানদিকে, ডানদিকে। আর্ত চিৎকার করে বাপ্‌পা। বাঁদিকে দেওয়াল! হাতের মুঠোর মধ্যে কণ্ট্রোলিং কি-তে চাপ দেয় সুধা। গাড়ি ডানদিকে ঘোরে।

খুশিতে উচ্ছল হয়ে ওঠে বাপ্‌পা। দেখছো বাবা, দেখছো?

আমি দেখতে থাকি।

দেখতে দেখতে, গিনতির চেতনার মধ্যেকার শূন্যময় শান্ত স্তব্ধতার আভাস পাই বলে মনে হয়। পেতে থাকি।

সূর্য হঠাৎই ওঠে

ওয়াটার বটল্‌টা দে তো।

রানা হাত বাড়িয়ে দিল। ডান হাতটা। অনামিকার হীরের আংটিটা অন্ধকারে জ্বলে উঠল যেন। ভোর হতে বেশ কিছুটা দেরি।

বোতল দিয়ে কী করবি? জল তো নেই! পলাশ এক কোণ থেকে উত্তর দিল। ঠোঁটে হাসি ঝুলে আছে কিনা বোঝা গেল না ভালো।

—শালা কি করিস? ওয়াটার বটল্‌টা তো ফুলের মালার মতন জড়িয়ে আছিস নিজের গলায় তখন থেকে, ভেতরে যে এক ফোঁটাও জল নেই বলবি তো! নাকি সব জল একাই খেলি টুক টুক করে। তোর যা স্বভাব!

বিপ্লবের কোনো বিকার হলো না। জিপের ঝাঁকুনি সামলাতে সামলাতে বলল—বেশ ঠাণ্ডা। জল খেয়ে লাভ নেই।

—তুই দিবি কিনা বল।

অধৈর্য্য শোনায় রানার গলা। আসলে সে ওয়াটার বটল্‌টা নিজের গলায় ঝোলাতে চেয়েছিল। যাত্রা শুরুর প্রাক্কালে জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার সময় নিজের হাতে বোতলটা তুলে নিয়েছে বিপ্লব। রানার এক হাতে বায়নাকুলার আর অন্য হাতে ক্যামেরার ব্যাগ ছিল। জলের বোতল রাখবার জায়গা ছিল না।

—বলছি যে জল নেই! এক কোণ থেকে আবার বলল পলাশ। পরভিন বলল, সারারাত না ঘুমোলে এরকমই হয়। এই ভোর রাতে জল নিয়ে শুদুমুদু কাড়াকাড়ি। টাইগার হিলে কি আজ প্রথম সূর্য উঠবে? তোর এত পিপাসা কিসের, রানা?

—আমার কাছে আছে। নেবেন?

প্রমা নিজের ওয়াটার বটল্‌টা এগিয়ে দিতে গেল রানার দিকে ; প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবাই—আমি খাবো।

মধুক্ষরা দেবী গায়ের সাদা শালটা সামলে ছেলেকে টানলেন—একটু পরে বাবা, একটু পরে, উনি আগে খেয়ে নিন।

অস্বস্তি একটু হলেও, রানা হাতটা বাড়াল। ওয়াটার বটল্‌ এগিয়ে দিল প্রমা। তার খোলা চুলে প্রশ্রয়ের হাওয়া। নীল কার্ডিগানে অযাচিত সান্ত্বনার শীতল দাহ।

পাহাড়ি পথে জিপ উঠছে কাঁপতে কাঁপতে এঁকে বেঁকে। বায়নাকুলারটা পলাশের হাতে দিল রানা। এমনিতে হাজারবার চাইলেও বায়নাকুলারটা ছুঁয়ে দেখার সুযোগও পায় না পলাশ। নিজের জিনিস অন্যের হাতে দেবার ব্যাপারে রানা একদম···। ক্যামেরার ব্যাগটা এখনও কোলের ওপরেই।

খুব সাবধানে ছিপিটা খুলল রানা। বিনতা এক দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। প্রমা বাবাইকে নিয়ে জানলার ফাঁক দিয়ে অন্ধকার পাহাড় দেখাচ্ছে। জানলা মানে ড্রাইভারের পাশের জায়গাটা। জিপের দু'ধারে ভাগাভাগি করে সামনা-সামনি বসে আছে ওরা ; রানা পলাশ বিপ্লব আর পরভিন বাঁদিকের সারিতে, ডানদিকের সারিতে প্রমা বিনতা বাবাই আর মধুক্ষরা দেবী ; কাল বিকেলেও যাঁরা ছিলেন অজানা অচেনা ; বাবাইয়ের বাবা বসেছেন ড্রাইভারের পাশে। সিগারেটের আগুন চাইতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা শুরু করে পরভিন, গতকাল সকালে, ম্যালে।

—আপনারা কবে যাচ্ছেন ?

—টাইগার হিল ? মিস্টার বোস কোনো ভূমিকা করেননি। ম্যালের রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে উদাসীনভাবে বলেছিলেন—ওয়েদার পারমিট করলে কালই যাবো।

আমতা আমতা করে পরভিন বলেছিল—গাড়িতে, না···মানে, ট্যাক্সিতে ?

—তোমরা যাবে ? সরাসরি সংক্ষিপ্ত হলেন মিস্টার বোস। ক'জন আছে ?

—চারজন।

—উঠেছো কোথায় ?

—হোটেল সানরাইজে।

—বাহ, তিনটের সময় আমাদের হোটেলে চলে এসো। টারানটিলা লজ, স্টেট ব্যাঙ্কের পাশে। জিপ দাঁড়িয়ে থাকবে।

—কত করে···বলবো না বলবো না করেও কথাটা না বলে থাকতে পারেনি

পরভিন।

—টাকা? সে পরে দেখা যাবে! সঙ্গে আমার তুই যেয়ে আর এক ছেলে যাবে। ছেলেটি ছোট সবার চেয়ে। তোমাদের অসুবিধে হবে না তো?

অসুবিধে! মরমে মরে যেতে যেতে পরভিন বলল—না না! না না!

জিপের ঝাঁকুনিতে জলটা গলায় ঢালতে বেশ অসুবিধেই হলো রানার। ফুলস্লিভ সোয়েটারটা ভিজল একটু। বাবাই বলল—ফেলে দিচ্ছ কেন কাকু?

বাঁ হাতে ঠোঁট মুছে রানা বলল, সরি!

হাত বাড়িয়ে বোতলটা নিতে নিতে প্রমা বলল—হয়েছে?

রানার বদলে উত্তর দিল অন্য তিনজন; পরভিন, বিপ্লব আর পলাশ। প্রায় সমস্বরে তারা বলে উঠল—হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক আছে। ঠিক আছে।

জিপটা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগল ওপরে। রানার মনে হলো গাড়িটাও বলে উঠল—ঠিক আছে। ঠিক আছে।

অল্প অন্ধকারে দেশলাই জ্বালার শব্দ হলো। সিগারেট ধরালেন মিস্টার বোস। নামটা গোপনে জেনে নিয়েছে পলাশ। অপরাজিত বোস।

খুক খুক করে একটু কাশলেন শ্রীমতী মধুক্ষরা দেবী। তাঁর মিহি অথচ সুরেলা স্বর হারিয়ে গেল জিপের আওয়াজে : আবার ধরালে।

এক জায়গায় গাড়িটা দাঁড় করিয়ে নির্বিকার ড্রাইভার উদাসীন অভ্যস্ত স্বরে বলল—ইধার সে পয়দল জানা হোগা। উ হ্যায় আপকা টাইগার হিল।

এসে গেছি। এসে গেছি। বলে হাততালি দিয়ে উঠল বাবাই।

শুধু মধুক্ষরা দেবী এমন নাক টানলেন দু'বার, যেন ফোঁস ফোঁস করছেন বলে মনে হলো। তারপর হাই তুললেন ধীরে সুস্থে…।

রানা দেখল, অন্ধকারের মধ্যে আরও অনেক লোক ঘোরাঘুরি করছে এদিক-ওদিক। স্পটে গিয়ে জায়গাটা তেমন পছন্দ হলো না রানার। বড় সড় কোনো বাড়ির ছাদের চাইতেও ছোট। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল, বাবাইকে বিস্কুট খাওয়াচ্ছে প্রমা।

গোল মতন জায়গাটার এক প্রান্তে একা দাঁড়িয়ে আকাশের মেজাজ দেখছিল পরভিন। রানা চুপচাপ তার পাশে গিয়ে বলল, বিস্কুট খাবি?

প্রচণ্ড বিরক্ত হলেও সেটা প্রকাশ করল না পরভিন। উদাসীন ভঙ্গিতে বলল—আমি রাবড়ি খাচ্ছি! বিস্কুট তুই খেগে যা।

ধুট্। বলে পরভিনের কাছ থেকে পালিয়ে এলো রানা।

ঠাণ্ডা লেগে যাবার ভয়ে বার বার পুলওভারের গলার কাছটা টেনে টেনে উঠিয়ে নিয়ে নিজের গোলগাল গর্দানটা ঢাকা দেবার চেষ্টা করছিল বিপ্লব। হঠাৎ কানের প্রায় পাশ থেকে কেউ যেন ফিসফিস করে বলল—মাফলার নেবেন? চমকে গিয়েও চমকালো না বিপ্লব, যেহেতু কণ্ঠস্বরটি মেয়েলি এবং মোলায়েম এবং মমতাময় তো বটেই। মাথা নিচু করে বিপ্লব বলল—এখন থাক। সূর্য কখন উঠবে?

বিনতা, নিজের মাফলারটা আরও আঁট করে নিজেরই গলায় জড়িয়ে নিয়ে বলল—রোজ যে সূর্য ওঠে, সেই সূর্য?

বিপ্লব সোজাসুজি তাকায় এবার বিনতার দিকে। সর্বস্ব লুঠ হয়ে যাবার পর মানুষ যেভাবে আর্তনাদ করে সেরকম চাপা গলায় বলে—না না, না না…।

—এত ভালো জায়গায় এসেও এত সিগারেট খাচ্ছো কেন? ফিস ফিস করে আত্মগত ভঙ্গিতে কথাগুলো বললেন মধুক্ষরা দেবী। স্ত্রীর অভিযোগের উত্তর দেওয়া অপরাজিত বসুর স্বভাব নয়।—সানরাইজ দেখতে এসেছো না সিগারেট খেতে এসেছো?

এবারও কোনো বিকার হলো না অপরাজিত বসুর। যথেষ্ট মনোযোগ না পেলে মেয়েরা যে কি ক্রুর ছোবল দিতে পারে তিনি জানেন।

সূর্য কখন উঠবে? আর ভাল্লাগছে না! স্বামীকে নিরুত্তর দেখে অন্যপথে গেলেন মধুক্ষরা দেবী।

না উঠতেও পারে। শান্ত ভঙ্গিতে বললেন মিস্টার বোস।

সে কি? খিল খিল করে হেসে উঠলেন মধুক্ষরা দেবী। হাসলে তাঁকে এই বয়সেও অপ্রতিরোধ্য মনে হয়। অনেকক্ষণ হেসে নিয়ে বললেন—না উঠে যাবে কোথায়?

মেঘের কি কুয়াশার আড়ালে থাকবে। অপরাজিত বোসও হাসছেন। তবে ভারী নিঃশব্দ, মোটা গোঁফের আড়ালে ঢাকা সেই হাসি ভারী নিঃসঙ্গ,রহস্যময়।

উঠবে তো বটে। মধুক্ষরা দেবীর হাসি স্তিমিত হয়ে আসে।

দেখতে তো পাবে না! মিস্টার বোস সিগারেট ধরালেন আর একটা।

মধুক্ষরা দেবী গম্ভীর হয়ে বললেন—আবার? লাস্ট উইণ্টারেও তোমার ব্রংকিয়াল ট্রাবলটা বেড়েছিল।

সেই জন্যেই তো খাচ্ছি, সামনের উইণ্টারে যাতে…।

কালো হয়ে গেল মধুক্ষরা দেবীর অনিন্দ্যসুন্দর শাদা মুখ। কাশতে কাশতে

যখন মিস্টার বোসের দম আটকে আসতো, তখন তিনি টেলিফোন ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা… ।

কখনো মহিলা সমিতি, কখনো বান্ধবীর দেওরকে দিয়ে সস্তায় কোনো জিনিস কেনানো, কখনো প্রমা আর বিনতার বিষয়ে নিজের মায়ের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা। কাশতে কাশতে, কাশতে কাশতে, মিস্টার বোস একসময় চিৎকার করে উঠতেন—স্টেরয়েড। স্টেরয়েড। প্রমা হয়তো ছুটে এসে বলতো—তোমার তো স্টেরয়েড নেওয়া বারণ বাপী। অসহায় কাটাছাগলের মতো ছটফট করতে করতে মিস্টার বোস বলতেন—আর পারছি না। …রিসিভারটা হাতে রেখেই হয়তো বলতেন মধুক্ষরা দেবী—চাইছে যখন, দে একটু। এত কষ্ট চোখে দেখাও পাপ!

পাপ? শ্বাস নিতে যার অস্বাচ্ছন্দ্য, তার শারীরিক অসহায়তার সাক্ষী হয়ে নিজের কর্তব্যকে অবহেলা করাটা তেমন কোনো অন্যায় নয়, কিন্তু…। আর যাই হোক, শরীরের কষ্ট তো কেউ ভাগ করে নিতে পারে না. মৌখিক সহানুভূতি জানিয়ে লাভ কি!

আর একবার, বিনতার খুব পছন্দের একটা কোবরা সিল্ক, অত্যন্ত কিলিং ধরনের দেখতে বলে, কিনে দিতে রাজি হননি মিস্টার বোস। দোকানের বাইরে এসে ফোঁস ফোঁস করতে করতে বলে উঠেছিলেন মধুক্ষরা দেবী—বাপ না পাপ!

সূয্যিমামা এখনও ঘুমোচ্ছে? প্রমার আঁচল ধরে বাবাইয়ের সরল প্রশ্ন। রানার ফ্ল্যাশ ঝলসে উঠল অল্প অন্ধকারে। কি হচ্ছে কি? প্রমার গলায় তেমন বিরক্তি নেই, যতটা আদর আছে, আশ্রয় আছে। রানা শুধু অস্ফুট বলল—যা হবে না…। প্রমা বলল—কিরকম? শকুন্তলার আঁচল ধরে হরিণশিশু? রানা হাসল। না না। তোমার কাছে আমার ভূমিকা! প্রমা—মারবো এক চড় —বলে বাবাইকে নিয়ে অন্য দিকে চলে গেল।

পরন্তিন ভাবছিল, একদিন আগেও যারা কেউ কাউকে চিনতো না, শুধু সূর্য ওঠা দেখতে এসে তারা কেমন অনেক দিনের চেনা জানা লোকের মতন নানা বিষয়ে সবাই সবায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। কেউ এসেছে হঠাৎ। কেউ পথে কত ঝামেলা পুইয়েছে। কেউ হয়তো অত্যন্ত নিকট কোনো প্রিয়জনকে সঙ্গে আনতে পেরে ওঠেনি শেষ পর্যন্ত। কেউ ভাবছে, এতদিন আসিনি কেন?

—আপনি কি করেন?

বিপ্লবের চকিত প্রশ্নে মিস্টার বোসের হাত থেকে খসে পড়ে গেল সিগারেটের

শেষ অংশটুকু। স্বামীস্ত্রীর কথাবার্তার মাঝখানে কখন যে বিপ্লব নিঃশব্দে তাঁদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, তাঁরা বুঝতেই পারেননি।

—কেন বলো তো? বলে মধুক্ষরা দেবী ঘুরে দাঁড়ালেন; যেন এই প্রথম নজর করলেন বিপ্লবকে। ছেলেটির পোশাক আশাক তো চোখমুখের মতই পরিষ্কার—কিন্তু কৌতূহলপ্রবণতা তো আধুনিকতার লক্ষণ নয়; তবে কি কলকাতার আশেপাশে কোথাও থাকে? সোদপুর? শেওড়াফুলি?

বিপ্লবকে কিছু বলতে না দিয়েই অপরাজিত বলটা নিয়ে নিলেন মারাদোনার মত। —শুধু কৈফিয়ৎ দিই ভাই, ঘরেও দিই, বাইরেও দিই, যে যা জিজ্ঞেস করে তাকে তার উত্তর দিই—উত্তর দিতে দিতে আমার জীবন…

অপরিচিত কারুর সঙ্গে সাধারণত মিস্টার বোস এত প্রগল্ভ হন না কখনো। মধুক্ষরার ভ্রূ কুঁচকে যাচ্ছিল। তার আগেই বিপ্লব বলল—তার মানে, পি আর-ও তো?

পেছন থেকে হো হো করে হাসির শব্দ শুনে সকলেই চমকে ফিরে তাকাল। প্রমার কপালের টিপটা দেখিয়ে বাবাই বলছে—ওই তো সূর্য উঠেছে। একটু ধাতস্থ হয়ে মধুক্ষরা দেবী বললেন—তুমি কি করো শুনি?

সুন্দরী মহিলা দেখলেই একটু রাগ হয় বিপ্লবের। তার ওপর অহংকারী হলে তো কথাই নেই। এমন চমৎকার সুযোগ নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। এই যোগ বিয়োগ করি আর কি! উদাসীনভাবে কথাগুলো সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্তের আলো আঁধারিতে ছেড়ে দিল বিপ্লব।

মধুক্ষরার মুখ কতটা ম্লান হলো বোঝা গেল না। তবে সামলে দিলেন মিস্টার বোস। ব্যাঙ্কে আছো? প্রবেশনারী নিশ্চয়ই? স্টেট ব্যাঙ্ক?

হঠাৎ এক ঝলক রক্তাভা একটা শৃঙ্গের মাথায় আছড়ে পড়ল, তারপর সঙ্গে সঙ্গে কমলারঙের আর একটা আভা আর একটা শৃঙ্গের ওপর, তারপর আর একটা, আরও একটা। একটার পর একটা রঙের আভা সাপের জিভের মত লক লক করে হিলহিলিয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল এক শৃঙ্গ থেকে আর এক শৃঙ্গে। তারপর ধীরে ধীরে কমলারঙের ঘূর্ণমান আগুনের পিণ্ডটা দেখা গেল পূর্ব আকাশের এক ধারে। আনন্দের শিহরণ ছড়িয়ে পড়ল সমবেত দর্শকদের গুঞ্জনে। বানা ক্যামেরাটা একবার এদিকে একবার ওদিকে সেট করতে করতে বিড়বিড় করে বলল—শালা মালটা কখন যে উঠে পড়ল, ভেবেছিলাম ঠিক ওঠার মোমেণ্টটা ধরবো…

এতক্ষণ চুপচাপ ধ্যানস্থ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল পরন্তিন। সে বলল—সূর্য হঠাৎই ওঠে না। কখন ওঠে কেউ বুঝতে পারে না। আর, যার ওঠে…

সবাই যখন একবার এদিক একবার ওদিক করে করে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রথম সূর্যের রঙের খেলা দেখছিল মুগ্ধ হয়ে আর কলরোল করছিল উচ্ছ্বাসের, বিপ্লব তখন স্থির চোখে শান্ত চেয়ে ছিল বিনতার অক্ষি গোলকের অভ্যন্তরে, যেখানে চোখের পাতাগুলো রবিরশ্মির মত বিস্তৃত হচ্ছিল, শাদা অংশের মাঝখানে কালো মনি দু'টো আস্তে আস্তে একটাই মাত্র গোলক হয়ে যাচ্ছিল—প্রতিফলিত দিবাকরের আলোয় যেখানে জ্বলে উঠছিল উজ্জীবনের আগুন।

যে আগুন, জন্ম জন্মান্তরেও হয়তো জ্বলে না, বহু মানুষের। আর যদি জ্বলে…।

মেয়ের অবস্থা দেখে মধুক্ষরা দেবী বিনতার দিকে এগোতে চাইছিলেন। বাঁ-হাত দিয়ে তাঁকে নিজের বুকের কাছে টেনে রাখলেন অপরাজিত বসু।

আলো ততক্ষণে বর্ণালির মায়া ছেড়ে আরও আলো হয়ে উঠেছে।